দিগ্ দিগন্ত

২০০০-২০০৫ এর ব্যতিক্রমী তিনপাতা
ক্যালেন্ডার সঙ্কলন

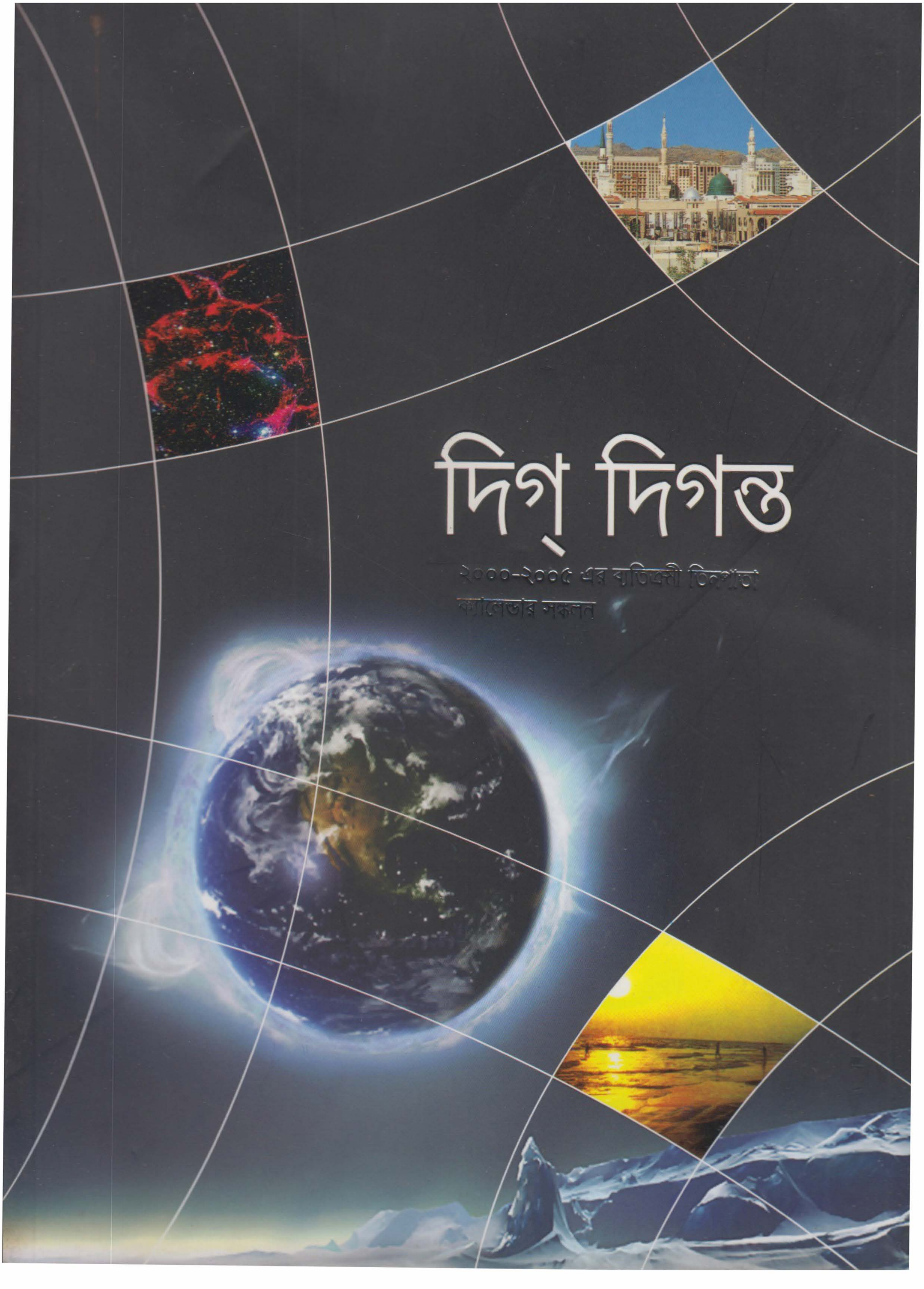

www.pathagar.org

দিগ দিগন্ত

প্রধান সম্পাদক
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক

সম্পাদক
মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসেন

নির্বাহি সম্পাদক
মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

সম্পাদনা সহযোগী
মু. আতাউর রহমান সরকার
মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
মোঃ সোহেল খান
মোঃ আতিকুর রহমান
মোঃ মনির উদ্দিন মনি
স.ম. আব্দুল্লাহ আল মামুন
মোঃ মাহমুদুর রহমান

প্রকাশনায়
কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১- এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৬৪৪০
www.shibir.org.bd

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০১১
মূল্য : ২০০ (দুইশত টাকা)

www.pathagar.org

সম্পাদকীয়

Verily! in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding.

-Al Imran:19

কুরআন ও বিজ্ঞান এক এবং অভিন্ন। তাই বিজ্ঞানময় কুরআনকে নিয়ে গবেষণা কর্মসূচি একজন মানুষকে তাঁর বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিকতাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের শ্লোগানও তাই

ছাত্ররা অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরুক
কুরআন ও বিজ্ঞানভিত্তিক দেশ গড়ুক
ছাত্ররা ফিরে আসুক জ্ঞান চর্চায়
জীবন চালাক কুরআন ও বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায়।

বাংলাদেশের ছাত্র অঙ্গনে ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার আদায় করার পাশাপাশি চাঁদাবাজি ও মাদকাসক্ত থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। সংগঠনটি এ সকল কার্যক্রমের সাথে সাথে ছাত্রসমাজ ও বিজ্ঞজনদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে এ জগতে বৈচিত্রতা আনয়নে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক আয়াত ও হাদিসের অনুবাদ সম্বলিত সংকলন, ইসলামী সাহিত্য, কুরআন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার গবেষণা কর্ম, সাময়িকী, স্টিকার, আকর্ষণীয় ভিউকার্ড, নামাজ-রোজার স্থায়ী ক্যালেন্ডার, বাংলা-ইংরেজি ডায়েরি, তথ্যসমৃদ্ধ দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার, Understanding sience series সহ বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল প্রকাশনা সামগ্রী প্রতি বছর প্রকাশ করে থাকে। ঘটনাবহুল বিংশ শতাব্দী, মুসলিম বিশ্বঃ অতীত-বর্তমান, পৃথিবীর বৈচিত্রময় প্রকৃতি, সীরাতে রাসূল (সা) এর মক্কী অধ্যায়, সীরাতে রাসূল (সা) এর মাদানী অধ্যায়, জিহাদ অধ্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতি, মহাবিশ্বের পরিণতি, বৈচিত্র্যময় তারকারাজি, তারকা গ্যালাক্সি এবং সূর্য, মহা বিস্ফোরণ, নিউট্রন তারকা, পালসার এবং কৃষ্ণ বিবর, আল-কুরআনে নবী ও রাসূলগণের পরিচয়, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিশ্বের ঐতিহাসিক মসজিদ, মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার, দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম স্থাপনা, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বিষয়ে পর্যায়ক্রমে ২০০০ সাল থেকে তিন পাতা ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়। উল্লেখিত ক্যালেন্ডারগুলোকে একত্রিক করে বই আকারে সম্পাদনা কার্যক্রমে আমরা সমাপ্ত করেছি। আশা করি ছাত্রসমাজ ও সুধীমহলে তথ্যে ভরপুর এই প্রকাশনা ব্যাপক সমাদৃত হবে ইনশাল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সর্বমহলে এ ক্যালেন্ডার সমাদৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে অবস্থান করে নিয়েছে। বিবিসির মূল্যায়নে বিশ্বে ব্যতিক্রমী হিসেবে এ ক্যালেন্ডার স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ক্যালেন্ডার বের করে থাকেন। তবে মসজিদ, দর্শনীয় স্থান এ ধরনের তথ্য দিয়ে ক্যালেন্ডার প্রকাশের ধারণা প্রথমে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির পেশ করে, যার অনুকরণ এখন অনেকেই করছেন। সুধীজন ও ছাত্রসমাজের চাহিদা মেটানোর লক্ষে প্রকাশিত এ "দিগ্‌দিগন্তের" সম্পাদনায় প্রথম থেকে যারা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে নিবিড় তত্ত্বাবধান করেছেন এবং যারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে কাজ সম্পন্ন করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

www.pathagar.org

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	
২০০০ সাল ঘটনাবহুল বিংশ শতাব্দী	১-১৯
২০০১ সাল সীরাতে রাসূল (সাঃ)	২০-৩৯
২০০২ সাল বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৪০-৫৬
২০০৩ সাল মহাবিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি ও আল কুরআন	৫৭-৮২
২০০৪ সাল আল কুরআনে নবী ও রাসূলগণ	৮৩-৯২
২০০৫ সাল ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিকাশ	৯৩-১০৬
একনজরে ২০০০-২০০৫ সালের ক্যালেন্ডার	১০৭-১৪৩
তথ্যকণিকা	১৪৪-১৪৮

www.pathagar.org

ঘটনাবহুল বিংশ শতাব্দী

স্বাগতম একবিংশ শতাব্দী- নতুন এক সভ্যতা বিনির্মাণের শতাব্দী। মহাবিশ্বের এ ক্ষুদ্র গ্রহবাসীরা একটি শতাব্দী, একটি মহাসময় অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এ শতাব্দী ছিল মুক্তির, ছিল বিদ্রোহের, ছিল সুখ-বিলাসিতার, ছিল বেদনা-ধ্বংসলীলা আর বিভৎসতার। বিপরীতমুখী ঘটনায় ভরপুর। এ শতাব্দীকে আমরা বিশ্ব ক্যানভাসে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মহাকাশের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাকিস্তান থেকে প্রেরিত। প্রথম মহাশূন্যচারী ইউরি গ্যাগরিন (১৯৬১)। ২০ জুলাই ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নীল আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও অলড্রিন সর্বপ্রথম চন্দ্র জয় করেন (মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১)। এছাড়া ভাইকিং-১ (১৯৭৬) নামে একটি মহাকাশযান বিভিন্ন গবেষণার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পাথ ফাইন্ডার, ক্যাসিনিসহ অনেক মহাকাশযান বিভিন্ন গবেষণার জন্য প্রেরণ করা হয়।

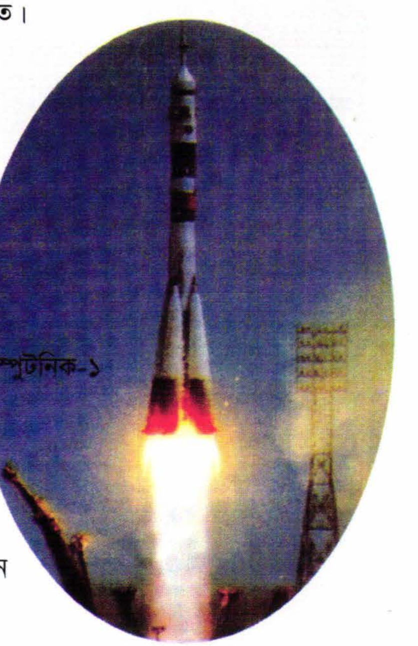

তথ্যপ্রযুক্তি ঃ বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯০৬ সালে রেডিও ব্রডকাস্টিং, ১৯৪২ সালে কম্পিউটার, ১৯৪৭ সালে ট্রানজিস্টর উদ্ভাবন তথ্যপ্রযুক্তিতে বিপ্লব সাধন করে। বর্তমানে স্যাটেলাইট ব্যবহার তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদানকে করেছে দ্রুত ও নির্ভুল। তাছাড়া ই-মেইল, ফ্যাক্স, মোবাইল ফোন ও সর্বোপরি ইন্টারনেটের ব্যবহার তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন।

১৯৪৫ সালের ৪ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় বিশ্বের সর্বপ্রথম এবং ৯ আগস্ট জাপানের নাগাসাকিতে দ্বিতীয়বারের মত পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপণ করে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বে এ পর্যন্ত ২০৬০টি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৬ জুলাই ১৯৪৫, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৭, ব্রিটেন ১৯৫২, ফ্রান্স ১৯৬২, চীন ১৯৬৮, ভারত ১৯৭৪ এবং পাকিস্তান ১৯৯৮ সালে প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়।

উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

OIC : ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদর দপ্তর জেদ্দা। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মোকাবেলা এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে জোরদার করার লক্ষ্যে গঠিত।

OPEC : ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদর দপ্তর ভিয়েনা। তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত।

NATO : ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদর দপ্তর ব্রাসেলস। পূর্বে এই সংস্থাটি ইউসি নামে পরিচিত ছিল। পারস্পরিক স্বার্থে ইউরোপিয় দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের সুলভ ও সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠার জন্যে গঠিত।

EU : ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদর দপ্তর ব্রাসেলস। পূর্বে এই সংস্থাটি ইইসি নামে পরিচিত ছিল। পারস্পারিক স্বার্থে ইউরোপীয় দেশসমূহে উৎপাদিত পণ্যের সুলভ ও সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠার জন্যে গঠিত।

SAARC : ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। সচিবালয় কাঠমান্ডু। দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গঠিত। নতুন সদস্যদেশ আফগানিস্থান পর্যবেক্ষক দেশ-চীন, জাপান।

কমনওয়েলথ : ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদর দপ্তর লন্ডন। সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহের একটি সংগঠন।

G-৮ : বিশ্বের শিল্পোন্নত ৭টি দেশ (জাপান, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ও ব্রিটেন) নিয়ে ১৯৮৫ সালে জি-৭ নামে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জি-৮ পরিণত হয়।

D-৮ : উন্নয়নশীল ৮টি দেশ (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া ও তুরস্ক) নিয়ে ১৯৯৭ সালে ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.org

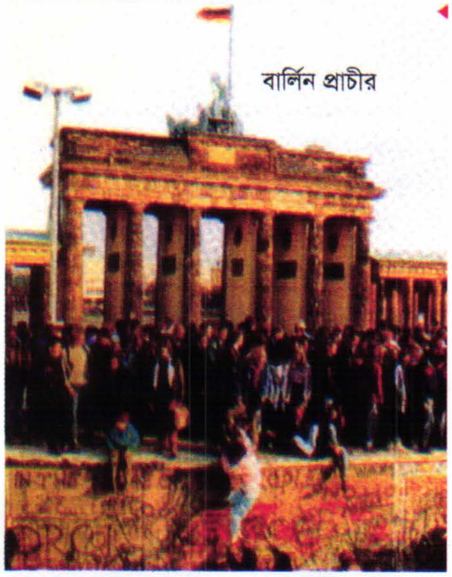

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির বিভক্তকারী এই ঐতিহাসিক প্রাচীরটি জার্মানির পুনঃএকত্রিকরণের সময় (৩ অক্টোবর, ১৯৯০) ভেঙে ফেলা হয়। বার্লিন বর্তমান জার্মানির রাজধানী।

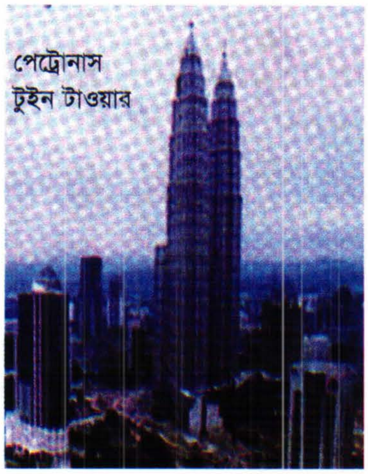

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারটি বিশ্বের সর্বোচ্চ উঁচু ভবন (৪৫০ মি.)। এটি ১৯৯৯ সালের ৩১ আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

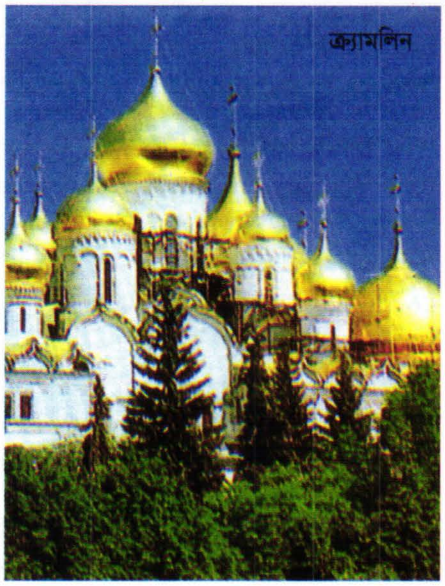

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট সরকারের হেড-কোয়ার্টার। বিশ্ব রাজনীতিতে এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মানব রচিত মতবাদ কমিউনিজমের উত্থান-পতন। ১৯১৭ সালে কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' এর ভিত্তিতে লেনিন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেন ১৯৯১ সালে গর্ভাচেভের 'গ্লাসনস্ট প্যারাস্ট্রাইকা' সংস্কারের মাধ্যমে এর পতন ঘটে।

শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমি ব্রিটেনের রাজধানী। যে সাম্রাজ্যের সূর্য এক সময় অস্ত যেত না কিন্তু বর্তমানে সেই প্রদীপ্ত সূর্য উদয়-অস্তগামী ক্ষয়িষ্ণু সূর্যে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের অধিকাংশ কলোনি স্বাধীন হয়ে যায়। কিছুদিন আগেও (১ জুলাই' ৯৭) হংকংকে চীনের নিকট হস্তান্তর করে। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক অঞ্চলের অর্থ সম্পদে গড়া এই লন্ডন শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.org

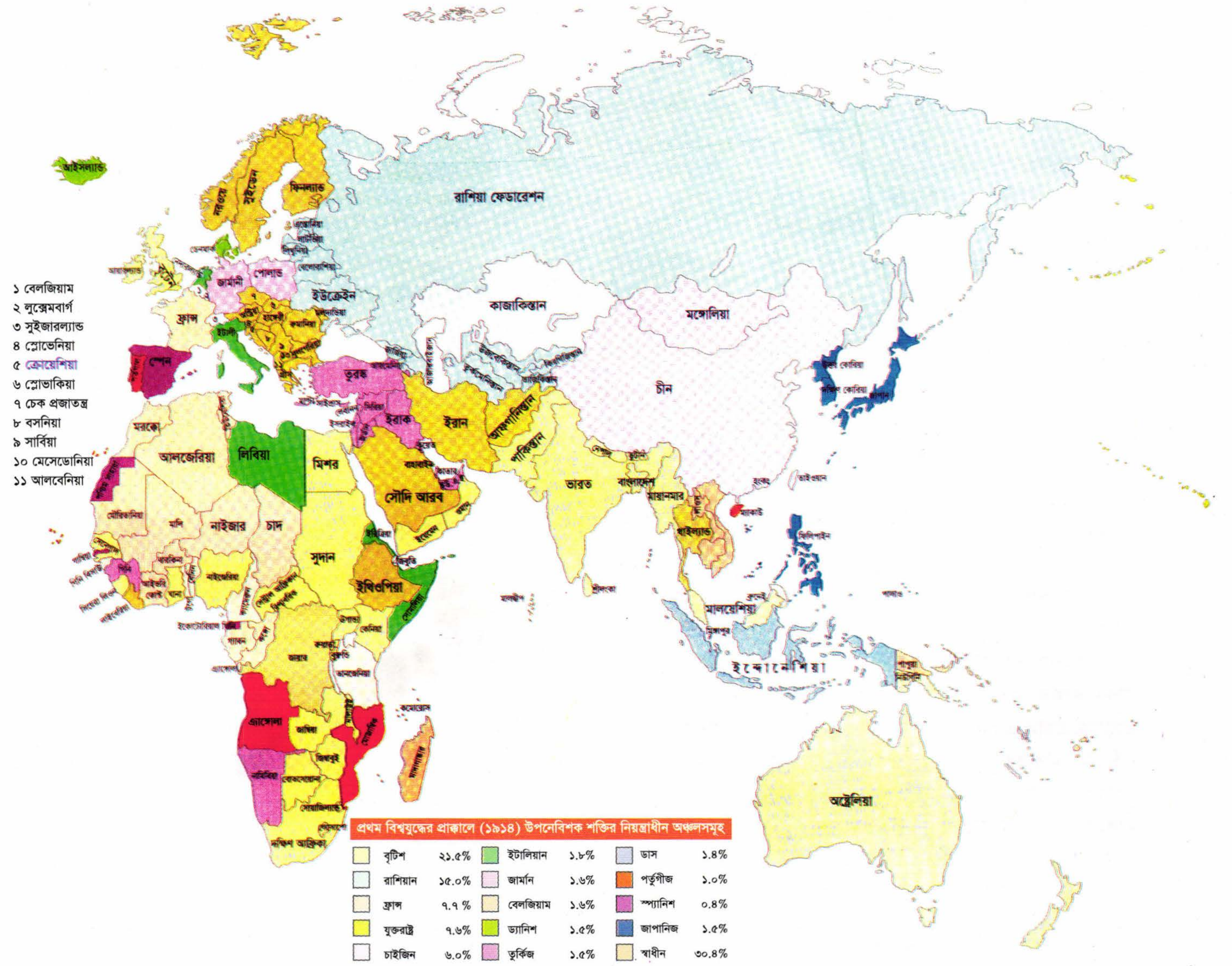

ইসরাইলের উত্থান

এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইসরাইলের উত্থান। ইঙ্গো-মার্কিন-রুশদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে এ রাষ্ট্রটি উড়ে এসে জুড়ে বসে। এরপর '৪৯, '৫৬, '৬৭, '৭৩ মোট ৪ বার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয় এবং ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্মিলিত শক্তির ইন্ধনে আরো আরব ভূমি দখল করে নেয়। বর্তমানে ইসরাইল 'শান্তির বিনিময়ে ভূমি' কৌশল অবলম্বন করে ক্রমেই মুসলিম স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্বের সর্বাধিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দেশ ভারতের জঙ্গিবাদী হিন্দুরা এই ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদটি রামের কল্পিত জন্মভূমি দাবি করে ভেঙে ফেলে। ফলে ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় দু'হাজার মুসলমান মারা যায়। সম্রাট বাবর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

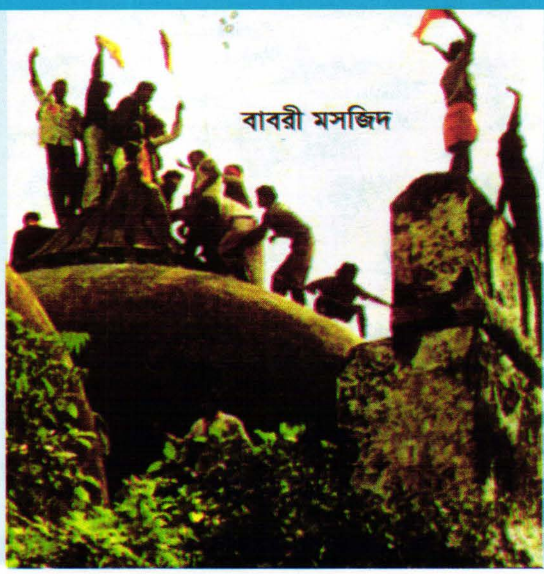

www.pathagar.org

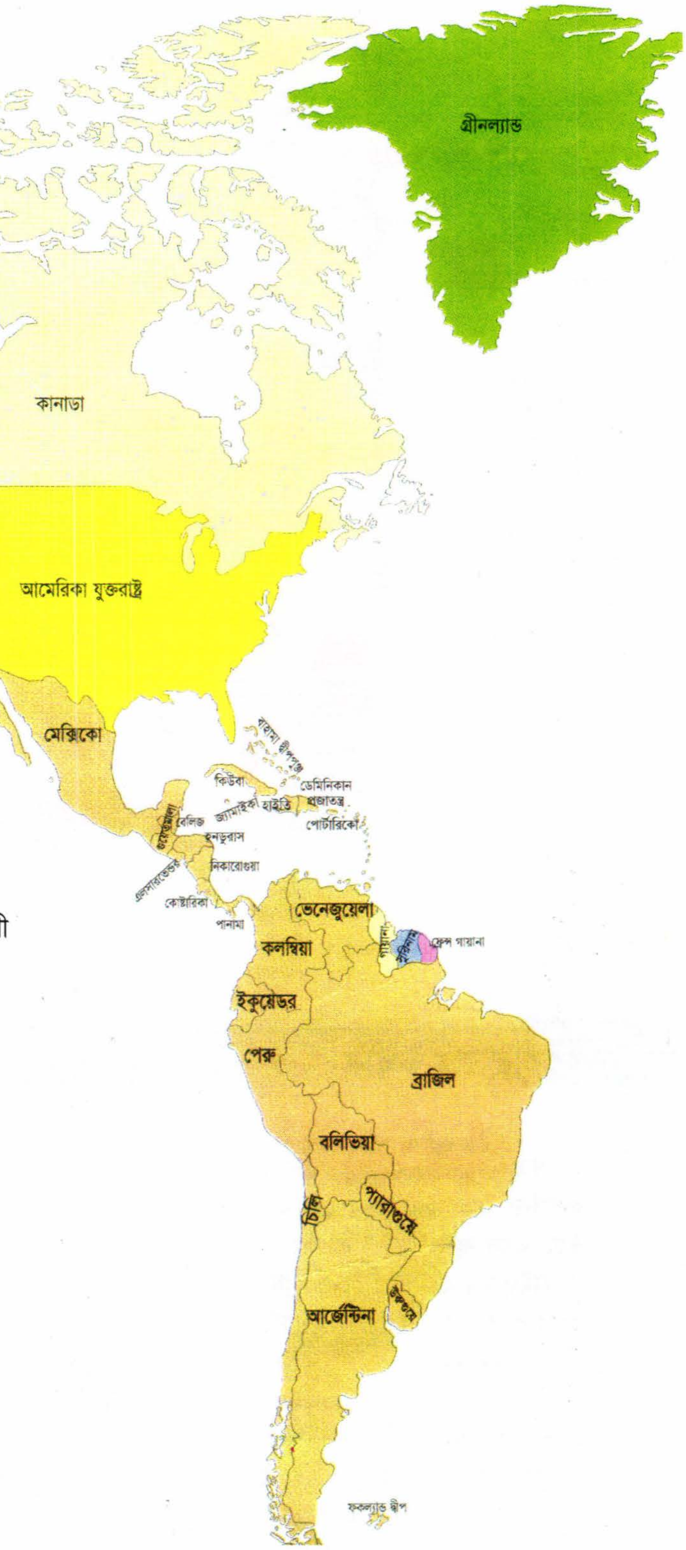

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভবন (১৮০০ সাল থেকে) যেখানে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নীল নকশা প্রণীত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস বর্বরতার ইতিহাস। স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে সংখ্যালঘুকরণ; আফ্রিকার মুসলিম প্রধান এলাকার ৩ কোটি ৮০ লক্ষ দাসকে হত্যা; মাত্র ২ মিনিটে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে জাপানের ২ লক্ষ লোককে বাষ্পীভূতকরণ; অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৫০ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে উদ্বাস্তুকরণ; কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ইরাক যুদ্ধে প্রায় ১ কোটি লোককে হত্যা; পানামা, লিবিয়া, ইরান, সুদান, আফগানিস্তানসহ বহুদেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস; অবরোধ অবরোধ খেলা; মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে আগ্রাসন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বরতা ও দ্বিমুখী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

www.pathagar.org

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র সান্নিধ্যে জোয়ার-ভাটার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি (৫৭৭০ বর্গ কি.মি., ভারতের অংশসমূহ প্রায় ১০,০০০ বর্গ কি.মি.)। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর এই বনভূমিকে ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ ঘোষণা করে।

পালাউ

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত প্রায় দু'শটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এশিয়া মহাদেশের এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি বিশ্বের অন্যতম স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ৪৭ বছর অতিক্রম করার পর ১৯৯৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসন

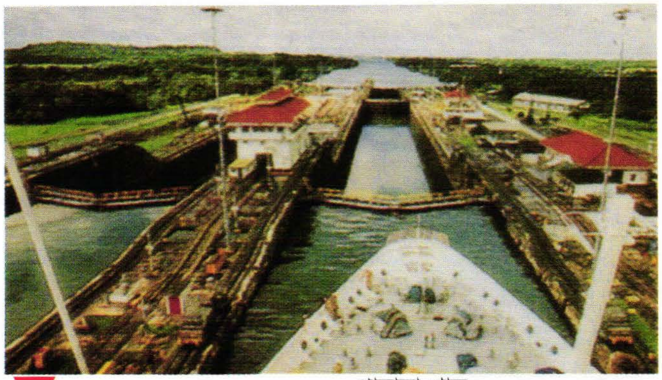

পানামা খাল

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর সংযোগকারী খাল। এই খালটি ৮২ কিলোমিটার লম্বা এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ১২ মিটার। প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ে, চল্লিশ হাজার ক্যারেবীয়ান শ্রমিকের প্রায় ১০ বছর সময়ের শ্রমে এটি তৈরি করা হয়- যা ১৯১৪ সালে প্রথম খোলা হয়। এছাড়া মিশরের সুয়েজ খাল (দৈর্ঘ্য ১৬২ কি.মি.) লোহিত ও ভূ-মধ্যসাগরকে এবং কিয়েল খাল বাল্টিক ও উত্তর সাগরকে সংযোগ করেছে।

শতাব্দীর শেষ অলিম্পিক-২০০০ এর ভেন্যু। এটি ২৪তম আসর। খেলাধুলার স্বর্ণযুগ ছিল এই শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই বিশ্বকাপ ফুটবল (১৯৩০), বিশ্বকাপ ক্রিকেট (১৯৭৫), বিশ্বকাপ হকি (১৯৭০)সহ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক গেমস্ (কমনওয়েলথ, এশিয়াড, সাফ ইত্যাদি) এবং ইভেন্টভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্ট (বিশ্ব দাবা, মুষ্টিযুদ্ধ খেতাবী লড়াই, স্কোয়াশ ইত্যাদি) শুরু হয়।

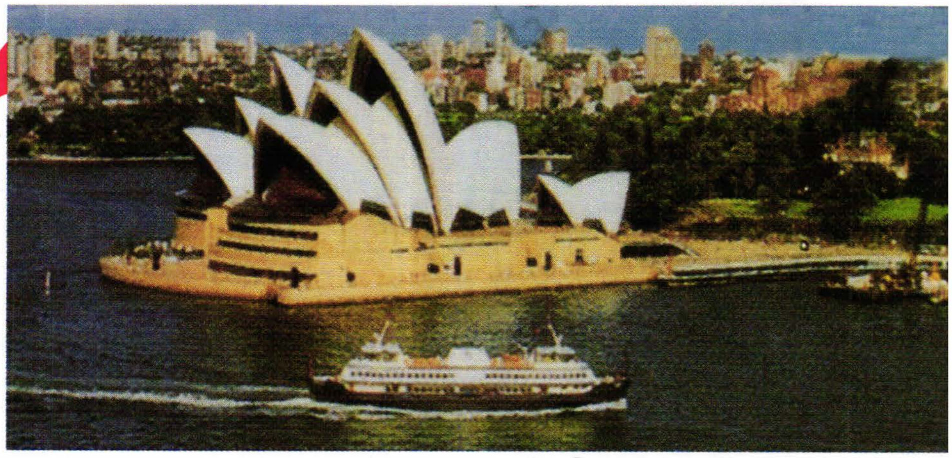

সিডনী

www.pathagar.org

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা আর্দ্র কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আল আন'আম:৫৯)

শতাব্দী প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব (মৃত্যু/জন্ম অনুযায়ী ক্রমধারা)

- উড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪) ঃ ১ম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) ঃ রুশ কমিউনিস্ট বিপ্লবের নায়ক
- কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩১) ঃ আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা
- টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) ঃ বিজ্ঞানী, যুক্তরাষ্ট্র
- আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ঃ সাহিত্যিক, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা
- রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বদাতা, জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবক
- এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক, জার্মান
- মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ঃ ভারতের স্থপতি
- মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৯) ঃ পাকিস্তানের স্থপতি
- শহীদ হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) ঃ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৮), মিশর
- আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) ঃ বিজ্ঞানী, জার্মান
- উইনস্টন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের নেতৃত্বদাতা
- বাদশা ফয়সাল (১৯০৬- ১৯৭৫) ঃ সৌদি বাদশা, অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা
- মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬) ঃ ১৯৪৯ সনে চীন কমিউনিস্ট বিপ্লবের নায়ক
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯) ঃ শতাব্দী সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা।
- আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী (১৯০০-১৯৮৯) ঃ ১৯৭৯ সালের ইরানী ইসলামী বিপ্লবের জনক
- নেলসন ম্যান্ডেলা (জ ১৯১৮) ঃ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা, দক্ষিণ আফ্রিকা
- সাদ্দাম হোসেন (জ ১৯৩৭-২০০৬)ঃ ইরাকের একনায়ক প্রেসিডেন্ট
- পেলে (জ ১৯৪০) ঃ কালজয়ী ফুটবলার, ব্রাজিল
- মোহাম্মদ আলী (জ ১৯৪২) ঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা, যুক্তরাষ্ট্র
- বিল গেটস (জ ১৯৪৬) ঃ কম্পিউটার বিপ্লবের অগ্রনায়ক, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধনী

চলমান স্বাধীনতা আন্দোলন

- ভারত-কাশ্মীর : ১৯৪৮ সাল থেকে
- রাশিয়া-চেচনিয়া : ১৯৯২ সাল থেকে
- রাশিয়া- দাগেস্তান: ১৯৯৯ সাল থেকে
- সার্বিয়া-কসোভো : ১৯৯২ সাল থেকে
- ফিলিপাইন-মিন্দানাও:১৯৬৭ সাল থেকে
- ব্রিটেন-আইরিশ : ১৯৬৯ সাল থেকে
- ইন্দোনেশিয়া-পূর্ব তিমুর: ১৯৭৫ সাল থেকে
- মায়ানমার-আরাকান: ১৯৪৫ সাল থেকে
- চীন-সিংকিয়াং : ১৯৪৯ সাল থেকে
- ভারত-সাতকন্যা রাজ্য: ভারত বিভক্তির (১৯৪৭) পর থেকে
- গ্রীস-তুর্কি সাইপ্রাস:১৯৭৫ সাল থেকে

উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ

- ১ম মহাযুদ্ধ ঃ ১৯১৪-১৮। অক্ষ শক্তি-জার্মানি, অস্ট্রিয়, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, তুরস্ক। মিত্র শক্তি- ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, রাশিয়া, ইটালি ও অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্র।
- ২য় মহাযুদ্ধ ঃ ১৯৩৯-৪৫। অক্ষ শক্তি - জার্মানি, ইতালি, জাপান। মিত্র শক্তি-ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড প্রভৃতি
- ভিয়েতনাম যুদ্ধ ঃ ১৯৪০-৭৫ (ভিয়েতনাম-ফ্রান্স-মার্কিন)
- ইরান-ইরাক যুদ্ধ ঃ ১৯৮০-৮৮
- পাকিস্তান–ভারত যুদ্ধসমূহ ঃ ১৯৪৮, ৬৫, ৭১
- আরব-ইসরাইল যুদ্ধসমূহ ঃ ১৯৪৯, ৫৬, ৬৭, ৭৩
- চীন-ভারত যুদ্ধসমূহ ঃ ১৯৬২, ৬৭, ৭৫
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঃ ১৯৭১ (পাকিস্তান-বাংলাদেশ)
- এঙ্গোলা-পর্তুগাল যুদ্ধ ঃ ১৯৬১
- মোজাম্বিক-পর্তুগাল যুদ্ধ ঃ ১৯৬৫-৭৪
- আফগানিস্তান-রাশিয়া যুদ্ধ ঃ ১৯৭৯-৮৮
- ফকল্যান্ড যুদ্ধ ঃ ১৯৮২ (ব্রিটেন-আর্জেন্টিনা)
- আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধ ঃ ১৯৮৮-৯৩
- ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া যুদ্ধ ঃ ১৯৬৩-৯৩
- উপসাগরীয় যুদ্ধ ঃ ১৯৯১ (ইরাক-কুয়েত)

www.pathagar.org

উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

- উড়োজাহাজ (১৯০৩) : অরভিল ও উইলবার রাইট
- ইনসুলিন (১৯২২) বেন্টিং
- টেলিভিশন (১৯২৬) : জন লোগি বেয়ার্ড
- রঙ্গিন টেলিভিশন (১৯২৮): জন লোগি বেয়ার্ড
- পেনিসিলিন (১৯২৮) : আলেকজান্ডার ফ্লেমিং
- লেজার রশ্মি (১৯৩৪) : চার্লস এইচ ইনস
- কলেরা জীবাণু (১৯৪০) : বরার্ট কচ
- বৈদ্যুতিক কম্পিউটার (১৯৪২) : ব্রেইন বেড
- ট্রান্সজিস্টর (১৯৪২) : উইলিয়াম ব্যাডফোর্ড শকলি ও সহযোগীদ্বয়
- এছাড়াও এ শতাব্দীর আরোও কিছু উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে - রেডিয়াম, যান্ত্রিক লিফট, রাডার, মোটর সাইকেল, সিলিকন চিপস, মাইক্রো প্রসেসর, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, ক্লোনিং ইত্যাদি

বিখ্যাত পুরস্কারসমূহ

- **নোবেল পুরস্কার** : ১৯০১ সাল থেকে শান্তি, সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন ও চিকিৎসা এবং ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিসহ মোট ৬টি বিষয়ে বিশ্বে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতিবছর এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
- **বাদশা ফয়সাল পুরস্কার (সৌদি আরব)** : ১৯৭৯ সাল থেকে ৫টি বিষয়ে দেয়া হয়।
- **ম্যাগস্যাসে পুরস্কার (ফিলিপাইন)** : এশিয়ার নোবেল নামে খ্যাত।
- **পুলিৎজার পুরস্কার (যুক্তরাষ্ট্র)** : ৩টি বিষয় - সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সঙ্গীত।
- **জুলিওকুরি পুরস্কার (ফ্রান্স)** : শান্তি।
- **অস্কার পুরস্কার (যুক্তরাষ্ট্র)** : চিত্রজগতের সর্বোচ্চ পুরস্কার।
- **আগাখান পুরস্কার** : মুসলিম বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পে অবদানের জন্য।
- **বুকার পুরস্কার (ব্রিটেন)** : সাহিত্য।

শতাব্দী পরিক্রমা

১৯০১-১০ : নোবেল পুরস্কারের সূচনা ('০১), বিমান আবিষ্কার ('০৩), রুশ-জাপান যুদ্ধ ('০৪), ঢাকায় মুসলিম লীগ এর প্রতিষ্ঠা ('০৬), বরার্ট পিয়েরে কর্তৃক উত্তর মেরু আবিষ্কার ('০৯)

১৯১১-২০ : পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ 'টাইটানিক' এর ডুবি ('১২), বলকান যুদ্ধ শুরু ('১২), দক্ষিণ মেরু জয় ('১২), ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (২৮ জুলাই '১৪), রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ('১৭), ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ('১৯), লীগ অব নেশন্‌স এর জন্ম ('২০)

১৯২১-৩০ : আলবার্ট আইনস্টাইনের নোবেলপ্রাপ্তি ('২১), বিবিসি প্রতিষ্ঠা ('২২), ইন্টারপোল গঠন ('২৩), মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন প্রতিষ্ঠা ('২৮), বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু ('৩০)

১৯৩১-৪০ : হিটলারের জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্তি ('৩৩), আল্লামা ইকবালের মৃত্যু (১৯৩৭), ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু (১ সেপ্টেম্বর '৩৯)

১৯৪১-৫০ : বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা ('৪১), জাপানের পার্লহারবার আক্রমণ ('৪১), ২য় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ('৪৫), জাতিসংঘ গঠন ('৪৫), পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ ('৪৭), কমনওয়েলথ গঠন ('৪৯), ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ ('৪৯)

১৯৫১-৬০ : তেনজিং ও হিলারির এভারেস্ট জয় ('৫৩), কেজিবি গঠন ('৫৪), ব্রিটিশ বাহিনীকে হটিয়ে মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ ('৫৬), সুদান-তিউনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ ('৫৬), মহাকাশ যাত্রার সূচনা (৫৭), ওপেক গঠন ('৬০)

১৯৬১-৭০ : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম ('৬১), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গঠন ('৬১), বার্লিন প্রাচীর তৈরি ('৬১), রাবেতা আলম আল ইসলামী গঠন ('৬২), পাক-ভারত যুদ্ধ ('৬৫), ৩য় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ ('৬৭), চন্দ্র বিজয় (২১ জুলাই '৬৯), ওআইসি গঠন ('৬৯)

১৯৭১-৮০ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় (১৬ ডিসেম্বর '৭১), প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অববসান ('৭৩), ৪র্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৭৩), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ('৭৫), বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠা ('৭৭), ইরানে ইসলামী বিপ্লব ('৭৯)

১৯৮১-৯০ : সার্ক গঠন ('৮৫), চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা ('৮৬), বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা ('৮৮), আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ইন্তেকাল ('৮৯), আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনীর অপসারণ ('৮৮), ইরাকের কুয়েত আগ্রাসন ('৯০)

১৯৯১-৯৯ : বাংলাদেশে প্রলয়ঙ্করি জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু ('৯১), উপসাগরীয় যুদ্ধ ('৯১), সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ('৯১), একক ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে ম্যাসট্রিচট চুক্তি সম্পাদন ('৯১), ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংস ('৯২), পিএলও-ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃত দান ('৯৩), নেলসন ম্যান্ডেলার ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩৪২ বছরের শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ('৯৪), বসনিয়ায় ডেটন চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ('৯৫), হংকংকে চীনের নিকট হস্তান্তর ('৯৭), মঙ্গল গ্রহে পাথফাইন্ডারের সফল অভিযান ('৯৮), তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্প ('৯৯)

এ শতকের সবচেয়ে বড় অবদান হলো জাতিসংঘ গঠন। পূর্বসূরী লীগ অব নেশনের ব্যর্থতা ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্য অবলোকন করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন ৫১টি দেশ জাতিসংঘ সনদ রচনা করে- যা ২৪ অক্টোবর কার্যকর হয়। তাই প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৮৮ (সর্বশেষ সদস্য নাউরু ও কিরবাতি)। জাতিসংঘের ১ম মহাসচিব ছিলেন ট্রিগ ভেলি (নরওয়ে) এবং বর্তমান মহাসচিব বান কি মুন (কোরিয়া)। যে মহান উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ গঠন হয়েছিল বর্তমানে পঞ্চশক্তির প্রভাবে তা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিশেষ করে জাতিসংঘ যেন একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘে কোন স্থায়ী মুসলিম সদস্য রাষ্ট্র না থাকায় মুসলিম স্বার্থের চরম ব্যাঘাত ঘটছে।

www.pathagar.org

মুসলিম বিশ্ব ঃ অতীত-বর্তমান

এক মহাবিস্ময় নিয়ে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব। তমসাচ্ছন্ন ঘুমন্ত বিশ্ববাসীকে প্রাণের ছোঁয়া দেয় ইসলাম। সৃষ্টি হয় নতুন এক সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। তারপর চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মুসলিম বিশ্ব পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে দীর্ঘকাল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জেগে ওঠে মুসলিম বিশ্ব। ধীরে ধীরে আদায় করে নিতে থাকে স্বাধীনতা, ফিরে পেতে থাকে তার হৃত গৌরব। আর বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট তো ঘোষণাই করছে– আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী।

www.pathagar.org

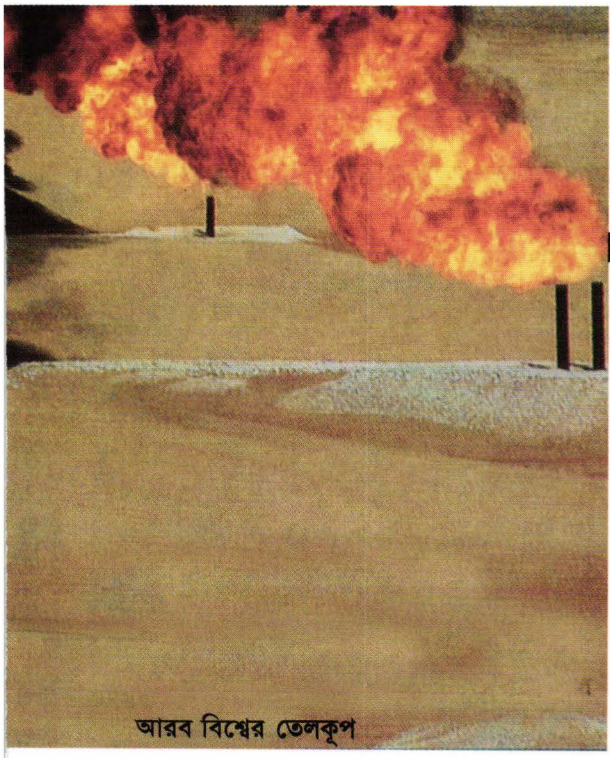

আরব বিশ্বের তেলকূপ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি তেল ক্ষেত্র। যে তেল আরব বিশ্বকে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করে। বিশ্বের সর্বাধিক তেল উত্তোলিত হয় এসব রাষ্ট্র থেকে।

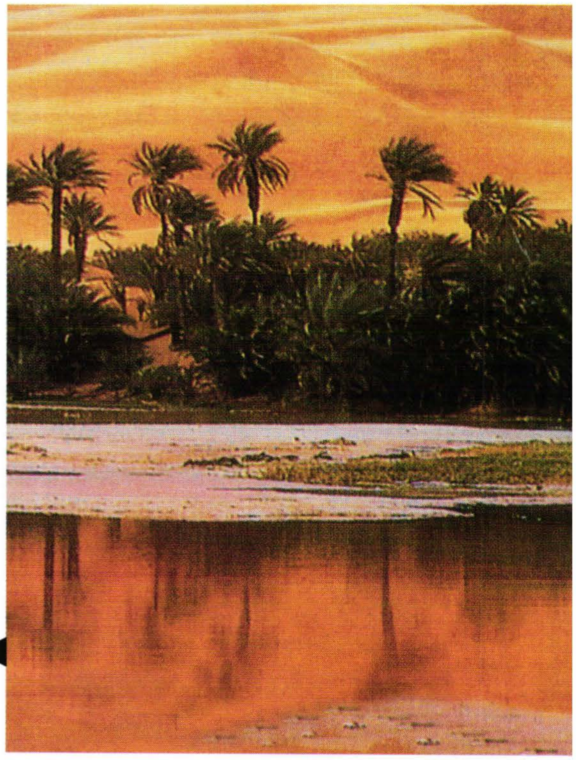

লিবিয়ার ফেজান মরুভূমির একটি মরুদ্যান-মরু প্রধান আরব বিশ্বের এক নৈসর্গিক দৃশ্য।

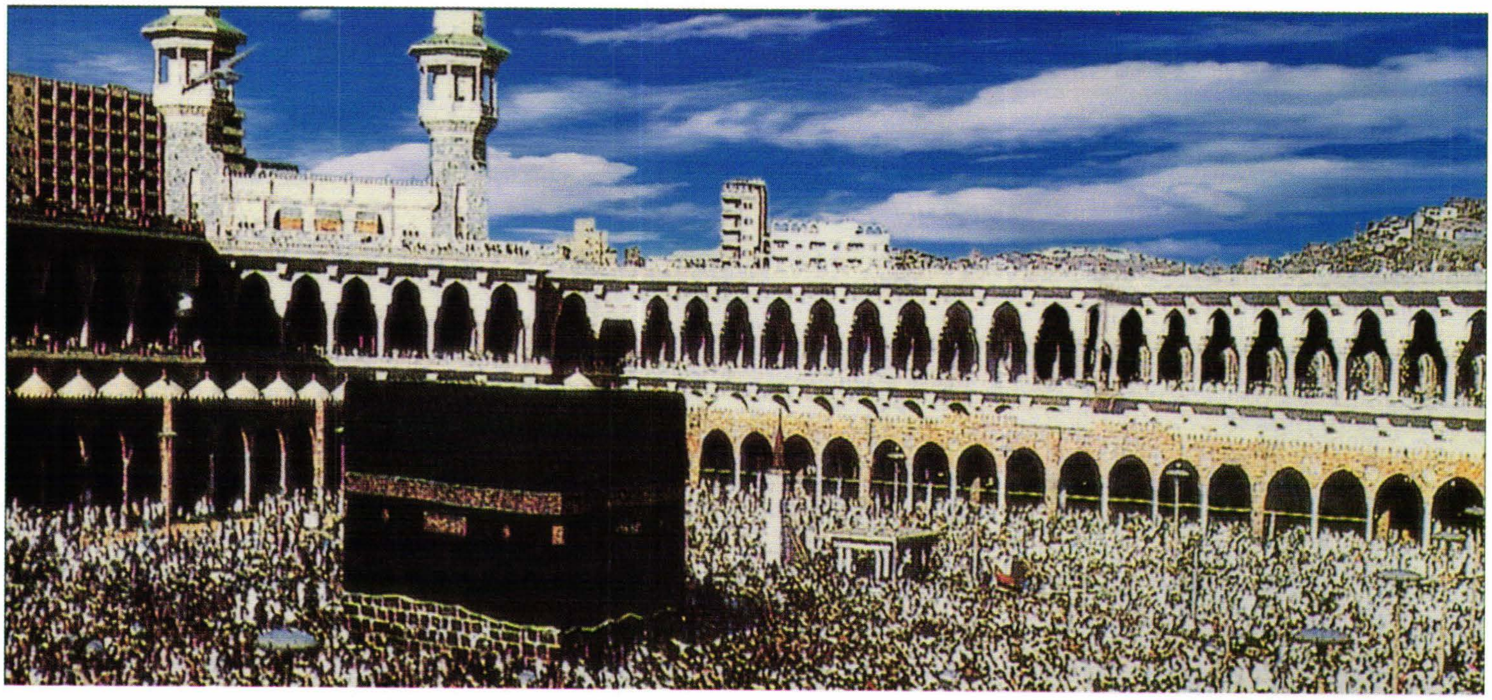

ইসলামের ঘটনাপ্রবাহ

৫৭০ খ্রি: হযরত মুহাম্মাদের (সা) জন্ম
৬১০ খ্রি: নবুওয়াত লাভ
৬২২ খ্রি: মদীনায় হিজরত
৬২৪ খ্রি: বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়
৬২৮ খ্রি: হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ইসলামের সম্প্রসারণ
৬৩০ খ্রি: মক্কা বিজয় ও আরব ভূখণ্ডে একক শক্তিতে

www.pathagar.org

৬৩২ খ্রি: বিদায়হজ এবং মুহাম্মাদের (সা) ইন্তেকাল, আবু বকরের (রা) খিলাফত লাভ

৬৩২-৩৪ খ্রি: রিদ্দার যুদ্ধ, ইয়ামামার যুদ্ধ, উমরের (রা) খিলাফত লাভ

৬৩৫-৪১ খ্রি: বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য বিজয়

৬৩৬ খ্রি: ইয়ারমুকের যুদ্ধ, সিরিয়া ও জর্ডান অধিকার

৬৩৭ খ্রি: জেরুজালেম অধিকার

৬৩৯-৪২ খ্রি: মিশর অভিযান ও বিজয়

৬৪৪ খ্রি: হযরত উমরের শাহাদাত ও হযরত উসমানের খিলাফত

৬৫১ খ্রি: কুরআন সঙ্কলন

৬৫২ খ্রি: গজনী, কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান বিজয়

৬৫৬ খ্রি: হযরত আলীর খিলাফত লাভ, উষ্ট্রের যুদ্ধ

৬৫৭ খ্রি: সিফফিনের যুদ্ধ

৬৬১ খ্রি: আলীর (রা) শাহাদাত, খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তি

৬৮০ খ্রি: কারবালার যুদ্ধ ও ইমাম হোসাইনের শাহাদাত

৬৯৬-৯৭ খ্রি: আরবি ভাষা ও লিপির সংস্কার

৭০৬-০৭ খ্রি: বলখ, ফারগানা, বুখারা, তাঞ্জিয়ার, মরক্কো, মিনকা, মেজর্কা, আইভিকা অধিকার

৭১০ খ্রি: সমরকন্দ বিজয়

৭১২ খ্রি: সিন্ধু, স্পেন, চীন সীমান্তের কাশগড় বিজয়

৭১৭ খ্রি: উমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষমতা লাভ

৭৩২ খ্রি: ফ্রান্সের টুর্সের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় এবং ইউরোপে ইসলামের সম্প্রসারণ রোধ

৭৫০ খ্রি: জাবের যুদ্ধে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ও আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠা

৭৫৪ খ্রি: আল মনসুরের ক্ষমতা লাভ

৭৬৭ খ্রি: ইমাম আবু হানিফার (রহ) ইন্তেকাল

৭৮৬ খ্রি: হারুন-অর-রশিদের সিংহাসনে আরোহণ

৮১৯ খ্রি: আল মামুনের শাসনভার গ্রহণ

৮২৩-২৫ খ্রি: সিসিলি, ক্রীটসহ কয়েকটি এলাকা বিজয়

৮৫৪ খ্রি: ইমাম শাফেয়ীর (রহ) ইন্তেকাল

৮৭০ খ্রি: ইমাম বুখারীর (রহ) মৃত্যু

১০০০-২৭ খ্রি: সুলতান মাহমুদের ১৭বার ভারত অভিযান

১০৯৭-৯৮ খ্রি: ১ম ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের জেরুজালেম দখল

১১০৩-১১ খ্রি: ইমাম গাজ্জালীর সংস্কার আন্দোলন

১১৮৯ খ্রি: ৩য় ক্রুসেড যুদ্ধে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক জেরুজালেম পুনঃদখল

১১৯২ খ্রি: তরাইনের ২য় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয়ে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

১২০৩-৪ খ্রি: বখতিয়ার খলজির বিহার ও বঙ্গ জয়

১২৫৮ খ্রি: হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস ও সর্বশেষ আব্বাসী খলীফা মুসতাসিম নিহত

১২৮৮ খ্রি: উসমান কর্তৃক তুর্কি খেলাফত প্রতিষ্ঠা

১৩০৯-১২ খ্রি: আলাউদ্দিন খিলজীর ভারতের দক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান

১৩১০ খ্রি: আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন

১৩২৭ খ্রি: প্রখ্যাত মুজাদ্দিদ ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যু

১৩৬৩-৭১ খ্রি: তুর্কি সুলতান ১ম মুরাদ কর্তৃক ইউরোপের সমগ্র বলকান অঞ্চল অধিকার

১৪৫৩ খ্রি: ২য় মুহাম্মদ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অধিকার

১৪৭৫ খ্রি: ক্রিমিয়া ও ইতালির চাবিওট্রান্টো দুর্গ দখল

১৪৯২ খ্রি: স্পেন থেকে নৃশংসভাবে মুসলিম উচ্ছেদ

১৫২১-৩৭ খ্রি: সুলতান সুলায়মান কর্তৃক বেলগ্রেড, রোডস, হাঙ্গেরি, ইতালির নেপলীয় ও ভেনিসীয় দ্বীপ দখল

১৫২৬ খ্রি: পানিপথের ১ম যুদ্ধে সম্রাট বাবরের বিজয় এবং মোঘল সাম্রাজ্যের সূচনা

১৬০৫-২৪ খ্রি: মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সংস্কার আন্দোলন ও দীন-এ এলাহীর মূলোৎপাটন

১৬৫৮ খ্রি: আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা লাভ

১৬৭২ খ্রি: পলাশীর যুদ্ধ প্রহসনে ইংরেজদের বিজয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়

১৮২৬ খ্রি: তুরস্কের জেনিসেরি বাহিনী ধ্বংস

১৮৩১ খ্রি: বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভির শাহাদাত বরণ

১৮৫৭ খ্রি: ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার বিদ্রোহ

১৮৭৩ খ্রি: মুসলিম রাষ্ট্র ইউনান চীনের দখল ও ১ কোটি মুসলিম হত্যা

১৯০৬ খ্রি: ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৯২৪ খ্রি: তুরস্ক খিলাফতের বিলুপ্তি

১৯৪৫-৯৯ খ্রি: ৫৫টি মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জন

১৯৬৭ খ্রি: ৩য় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৯৯৮ খ্রি: ১ম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ

www.pathagar.org

তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো, তিনি তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেনই, তা কাফেরদের নিকট যতই অপছন্দের হোক।

(সূরা আস্-ছফ : ৮)

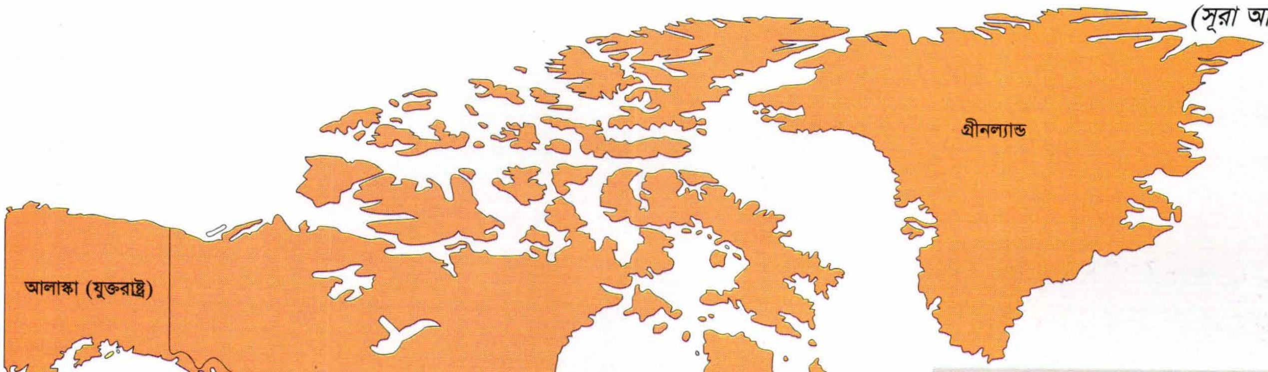
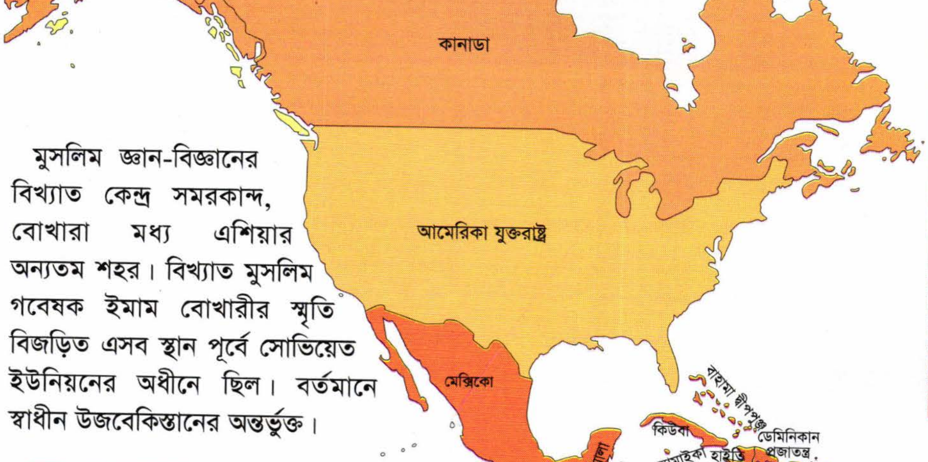
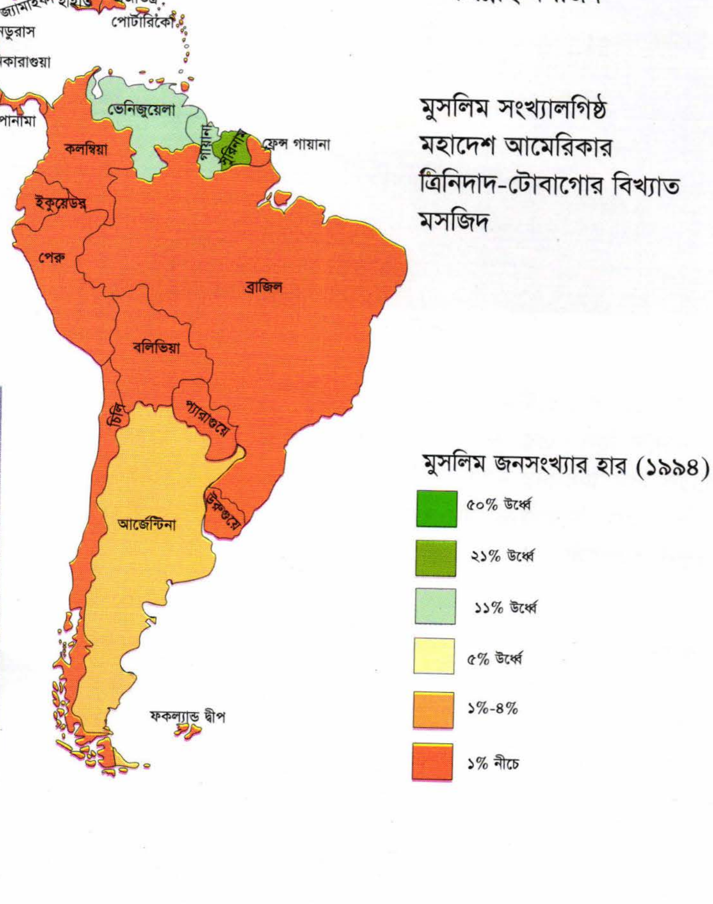

মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিখ্যাত কেন্দ্র সমরকান্দ, বোখারা মধ্য এশিয়ার অন্যতম শহর। বিখ্যাত মুসলিম গবেষক ইমাম বোখারীর স্মৃতি বিজড়িত এসব স্থান পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল। বর্তমানে স্বাধীন উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

জিন্নাহ মসজিদ

মুসলিম সংখ্যালগিষ্ঠ মহাদেশ আমেরিকার ত্রিনিদাদ-টোবাগোর বিখ্যাত মসজিদ

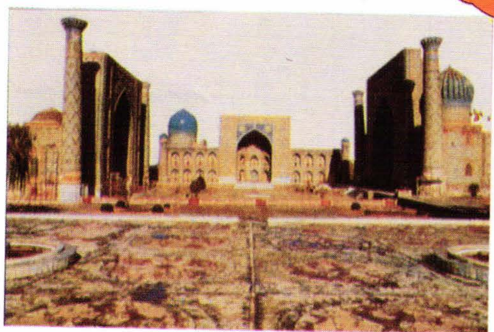

বোখারা

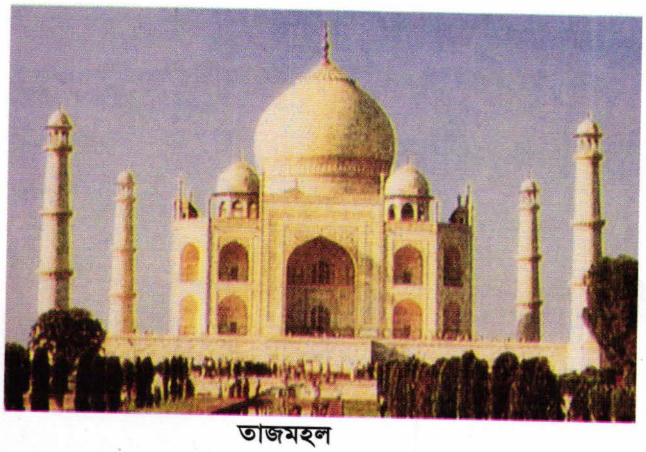

তাজমহল

www.pathagar.org

জেরুজালেম শহর তিনটি ধর্মের মানুষের কাছে পবিত্র ভূমি হিসেবে পরিচিত। মুসলিমরা মসজিদুল আকসার গম্বুজকে (Dome of rock), ইহুদিরা Western Wall কে পবিত্র মনে করে। ঈসার (আ) জন্মস্থানের কারণে খ্রিষ্টানদের নিকটও জেরুজালেম পবিত্র।

জিব্রাল্টার

ব্রিটেনের কর্তৃত্বাধীন এই ক্ষুদ্র কলোনীটি একসময় মুসলিম শাসনাধীন ছিল। এর পূর্ব নাম ছিল স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের নামানুসারে 'জাবল আত্ তারিক'। পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত হয়ে জিব্রাল্টার নাম ধারণ করে। পাশেই রয়েছে বিখ্যাত জিব্রাল্টার প্রণালী।

কাঠের ফ্রেমের ওপর কাদা মাটি দিয়ে তৈরি মসজিদ- মুসলমানদের এক অপূর্ব নির্মাণশৈলী। মসজিদটি মালিতে অবস্থিত। এ জাতীয় মসজিদ দেশটির প্রায় সকল শহরেই দেখা যায়। উল্লেখ্য যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব বণিকদের ভ্রমণের ফলে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

বসফরাস প্রণালী দ্বারা বিভক্ত ইস্তাম্বুল শহরটি দু'টি মহাদেশে (এশিয়া-ইউরোপ) অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র শহর। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামকে নতুন রাজধানী ঘোষণা করেন, নাম দেন নোভারোমা। পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপল নাম ধারণ করে। এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ গুরুত্বপূর্ণ শহরটি মুসলমানগণ ৬বার (৬৬৯, ৬৭৪-৭৫, ৭১৬-১৭, ৭৮২, ৮৩৪, ১৩৯৩-৯৯ খ্রি:) অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর তুর্কি সুলতান ২য় মুহাম্মদ ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জয় করেন। এ শহরটি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তুরস্কের রাজধানী ছিল। বর্তমানে এর নাম ইস্তাম্বুল।

বিশ্বখ্যাত এক স্থাপত্য নিদর্শন। বিখ্যাত তাপস খান জাহান আলী বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে এটি স্থাপন করেন। এত অধিক গম্বুজ বিশিষ্ট স্থাপত্যের অন্য কোন নজির বিশ্বে নেই। ষাট গম্বুজ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি।

www.pathagar.org

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন সমগ্র খ্রিষ্টান ইউরো অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন পশ্চিমে আন্দালুসিয়া থেকে পূর্বে খোরাসান ও গজনি পর্যন্ত এই বিশাল ভূ-খণ্ডে মুসলিম গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কার এবং গবেষণা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের আলো জ্বেলে রাখেন। তাঁদের সেই অবদানের কারণেই আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়েছে এত প্রসারিত। এত ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁদের অবদান উল্লেখ করা অসম্ভব। তবু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো−

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান অবিস্মরণীয়। আল-ফারগামী (মৃ ৮৭০) সর্ব প্রথম গণিতের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করেন। **বানু মুসা** ভাতৃত্রয় (৯ম শতাব্দী) ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা, পৃথিবী কক্ষের অপভূ ও অনুভূ নির্ণয়, **ছাবিত ইবনে কোরা** (৮২৬-৯০১) সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। **আল-বাত্তানি** (৮৫৮-৯২৯) জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে তালিকা প্রণয়ন করেন **জিজ-আল শামিল** নামে আজও তা পরিচিত, **আল-বেরুনী** (৯৭৩-১০৪৮) চন্দ্রের লম্বন, কোন স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা নির্ণয় ও দিগংশ স্থানাঙ্ক আবিষ্কার করেন।

গণিত ঃ গণিতের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় মুসলমানদের অবদান রয়েছে। বীজগণিতের অবদানের জন্য আল খাওয়ারিজমিকে (মৃ ৮৫০) বীজগণিতের জনক বলা হয়। তাঁর আবিস্কৃত এলগোরিদম ও লগারিদমকে ভিত্তি করেই কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়েছে। বীজ গণিত ও ত্রিকোণমিতির বিভিন্ন সূত্র ও সমস্যা সমাধানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান অগ্রগণ্য। গোলাকার ত্রিকোণমিতির সূত্রপাত, ত্রিকোণমিতিতে সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্টের ব্যবহার, বিভিন্ন কোসাইন সূত্র ইত্যাদি মুসলমান গণিতবিদদেরই অবদান।

পদার্থ বিজ্ঞান ঃ পদার্থ বিজ্ঞানে মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইবনে আল হাইয়ান (৯৬৫-১০৪৪)এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাকে অপটিকস এর জনক বলা হয়। আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮) পদার্থের তুল্য ওজন পরিমাপ করেন। তাছাড়া আল কিন্দি (মৃ ৮৭৩), বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় (৯ম খ্রী:), আল ফারাজী (৮৭২-৯৫০), আল-খাজেনি (১২শ শতাব্দী) ইবনে ইউনুস (মৃ ১০০৯), ইবনে মাস'উদ আল-সিরাজী (১২৩৬-১৩৩১) প্রমুখ পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদান রাখেন।

রসায়ন ঃ কেমিস্ট্রি (রসায়ন) শব্দটি আরবি আল-কেমিয়া থেকে উদ্ভুত। মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানকে (৭৬০-৮১৫) আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। আল রাজি (৮৪১-৯২৬) রসায়ন শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। বিখ্যাত মুসলিম রসায়নবিদরা হলেন− খালেদ বিন ইয়ামিন (মৃ ৭০৪), জুননুন মিসইরহ্ (মৃ ৮৬০), আব্বাস ইবনে ফিন্নাস (মৃ ৮৮৭), আল খাওয়ারিজমি (১০ম শতাব্দী), আল হাকীম (১১শ শতাব্দী), ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আবুল কাশেম আল ইরাকী (১৩শ শতাব্দী)।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংযোজন মানব সভ্যতার এক বিশেষ অবদান। ইবনে সিনা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে চিকিৎসকদের রাজপুত্র বলা হয়। তাঁর গ্রন্থ আল কানুন ফিত্তিব চিকিৎসাবিদ্যার টেক্সট বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আল বেরুনীর কিতাব-ই-সাইদানা ফার্মাকোলজির বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হলেন আলী বিন রাব্বান (জ ৮১০), আল-ইবাদি (৮০৯-৭৭), ইয়াহিয়া ইবনে শরাফী (মৃ ৯৩০), আল রাজী (৮৪১-৯২৬), সিনান বিন ছাবিত (মৃ ৯৪৩), আলী ইবনে আব্বাস (মৃ ৯৯৪), আবু মনসুর মুয়াফফা (১০ম শতাব্দী), আবুল কাশেম (৯৩৬-১০১৩)।

তাছাড়া জীববিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও ভূগোলের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম বিজ্ঞানীরা মৌলিক অবদান রাখেন। বিখ্যাত দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ ইবনে খালদুনই (মৃ ১৪০৬) সর্বপ্রথম সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি প্রবর্তন করেন। মূলতঃ এই সব মুসলিম মনীষীর অবদানেই বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন আজ এত সুসংহত ও উন্নত।

বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান

• এক কাবামুখী, অভিন্ন মৌলিক বিশ্বাসে বলিয়ান মুসলিম বিশ্ব পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভূ-খণ্ডে অবস্থান করছে।

• মরক্কো হতে ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়া, মোজাম্বিক হতে কাজাকিস্তান পর্যন্ত বিশাল লাগোয়া মুসলিম ভূ-ভাগ পৃথিবীর সবচেয়ে কৌশলগত এলাকা।

• বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশই (১৫০ কোটি) মুসলিম। আফ্রিকার প্রায় ৪০ কোটি, এশিয়ার প্রায় ১০০ কোটি, ইউরোপের প্রায় ৫ কোটি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় আড়াই কোটি, ওশেনিয়ার প্রায় ১০ লক্ষ লোক মুসলিম। এক বিশাল জনশক্তির অধিকারী মুসলিম বিশ্ব।

• বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলসীমার অধিকারী মুসলিম বিশ্ব। সুয়েজ খাল, জিব্রাল্টার, বসফোরাস, দারদানিস, বাবেল মান্দেব, হরমুজ, মালাক্কা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী মুসলিম বিশ্বের দখলে। কোন কারণে যদি এ পথগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অচল হয়ে যাবে।

• বিশ্বের ৩০% শিল্পের জন্য ব্যবহার্য কাঁচামালের যোগানদাতা মুসলিম বিশ্ব। ৮০% রাবার, ৬০% পেট্রোলিয়াম এবং সকলপ্রকার ভেষজ দ্রব্যের যোগানদাতা মুসলিম বিশ্ব। তাই মুসলিম বিশ্ব ছাড়া শিল্পোন্নয়ন অসম্ভব।

www.pathagar.org

পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি

সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীর বুকেই মানুষ গড়ে তুলেছে তার আবাসস্থল। এই পৃথিবীর প্রকৃতি যেমনি স্নেহ-মমতায় লালন করেছে এর অধিবাসীদের, তেমনি ধ্বংসও করেছে অকৃপণভাবে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যময়তার জন্যই প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন ও শাশ্বত।

মহাদেশের সঞ্চালন

প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগ একত্রে ছিল। যার নাম প্যানজিয়া (Pangaea)। এটি প্যানথালেসা (Panthalassa) নামক একটি বৃহৎ সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে প্লেটের সঞ্চালনের কারণে প্যানজিয়া ভূখণ্ডটি টেথিস (Tethys) সাগর দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে লরেসিয়া (Laurasia) এবং গান্ডোয়ানা (Gondwana) নামধারণ করে। তারপর ৬.৫ কোটি বছর আগে এ দুটি ভূখণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বর্তমানের সাতটি মহাদেশীয় ভূখণ্ডে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে আলফ্রেড ওয়েগনার এ তত্ত্বটি প্রদান করেন। পৃথিবীর এ মহাদেশীয় সঞ্চালন বর্তমানেও অব্যাহত।

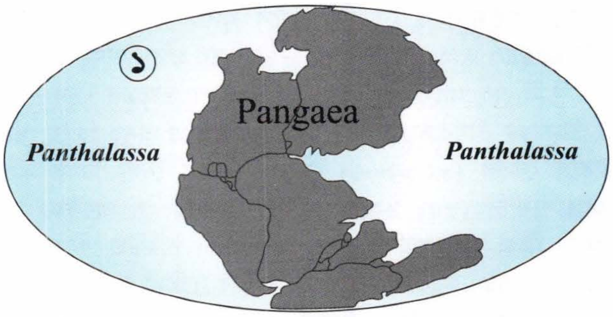

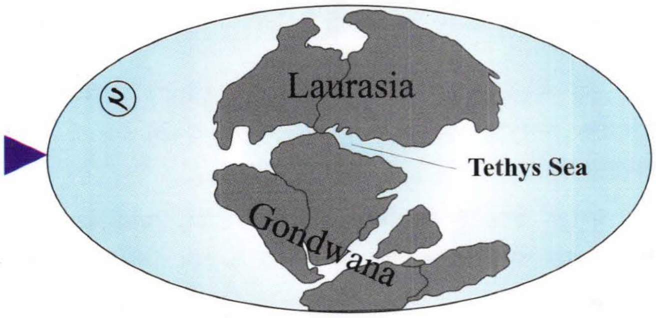

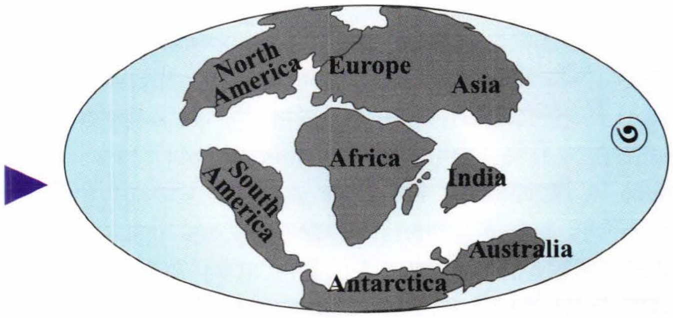

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

বাংলাদেশের কক্সবাজার বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী সমুদ্র সৈকতটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত। এর দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিলোমিটার। নৈসর্গিকতার দিক দিয়ে এটি বিশ্ব পর্যটকদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাছাড়াও বাংলাদেশের কুয়াকাটা পৃথিবীর এক বিরল সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকতের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া সৈকত, মিয়ামি সৈকত, ভারতের গোয়ার সৈকত অন্যতম।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

www.pathagar.org

সাহারা মরুভূমি

উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত এই মরুভূমিটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি। আয়তন প্রায় ৮৪,০০,০০০ বর্গ কি.মি.। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মরুভূমি– অ্যারাবিয়ান মরুভূমি (সিরিয়া ও সৌদি আরব) ১৩,০০,০০০ বর্গ কি.মি.; কালাহারি মরুভূমি (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৫,২০,০০০ বর্গ কি.মি; থর মরুভূমি (ভারত) ২,৬০,০০০ বর্গ কি.মি; গোবি মরুভূমি (মঙ্গোলিয়া-মধ্য এশিয়া) ১০,৪০,০০০ বর্গ কি.মি.।

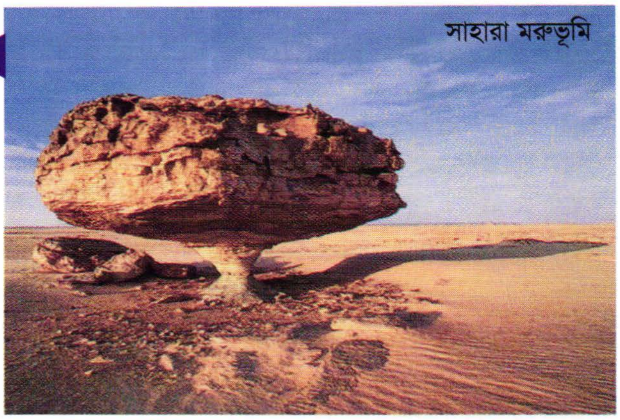
সাহারা মরুভূমি

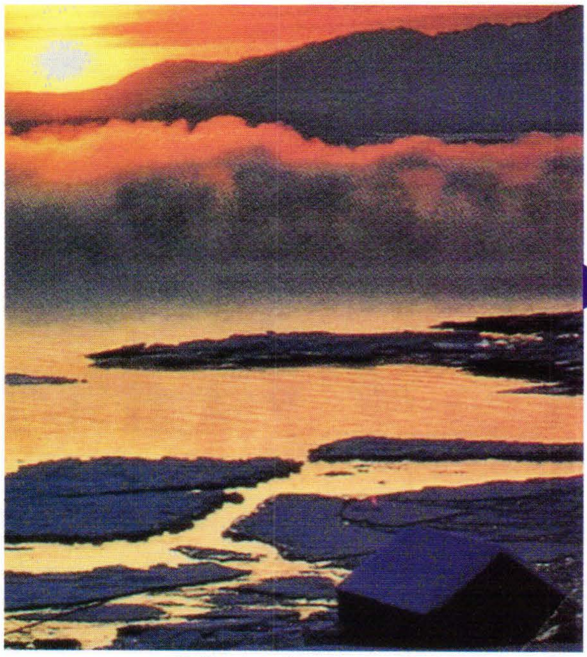
নিশীথ সূর্যের দেশ

নিশীথ সূর্যের দেশ

উত্তর নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশ আর্কটিক সার্কেলে অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মে সূর্য কখনও অস্ত যায় না, ২৪ ঘণ্টাই আলো দেয়। গভীর রাতেও পড়ন্ত বিকেলের ন্যায় আলো দেখা যায়। তাই এই দেশগুলোকে নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয়।

বৈকাল হ্রদ

বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর গভীরতম এবং স্বাদু পানির হ্রদ। এর গভীরতা প্রায় ৬৩৬৭ ফুট। পৃথিবীর প্রায় ২০% স্বাদু পানি সরবরাহ করে বৈকাল হ্রদ। এই হ্রদ সাইবেরিয়ার প্রায় ১২,১৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। একে সাইবেরিয়ার নীল চোখ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য বিখ্যাত হ্রদসমূহ হচ্ছে– কাস্পিয়ান হ্রদ/সাগর (কাজাকিস্তান) ৩৭২,০০০ বর্গ কি.মি; সুপিরিয়ার হৃদ (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা) ৮২,৪০৩ বর্গ কি.মি; ভিক্টোরিয়া (পূর্ব-মধ্য আফ্রিকা) ৬৯,৪৮৪ বর্গ কি.মি; আরল হ্রদ (কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তান) ৬৬,৪৫৯ বর্গ কি.মি.।

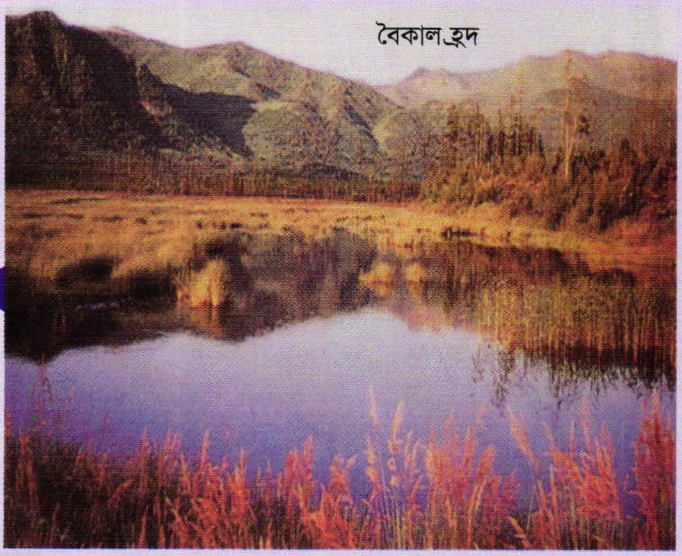
বৈকাল হ্রদ

www.pathagar.org

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

আফ্রিকার একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত। জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের সীমান্তে অবস্থিত এই জলপ্রপাতের ১২৮ কি. উঁচু থেকে পানি নিচে গড়িয়ে পড়ছে। যার প্রচণ্ড আওয়াজ ২৫ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। বিশ্বের আরও দু'টি বিখ্যাত জলপ্রপাত হচ্ছে- অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত (ভেনিজুয়েলা) ১০০০ মি. এবং নায়াগ্রা জলপ্রপাত (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা) ১৬৭ মি.।

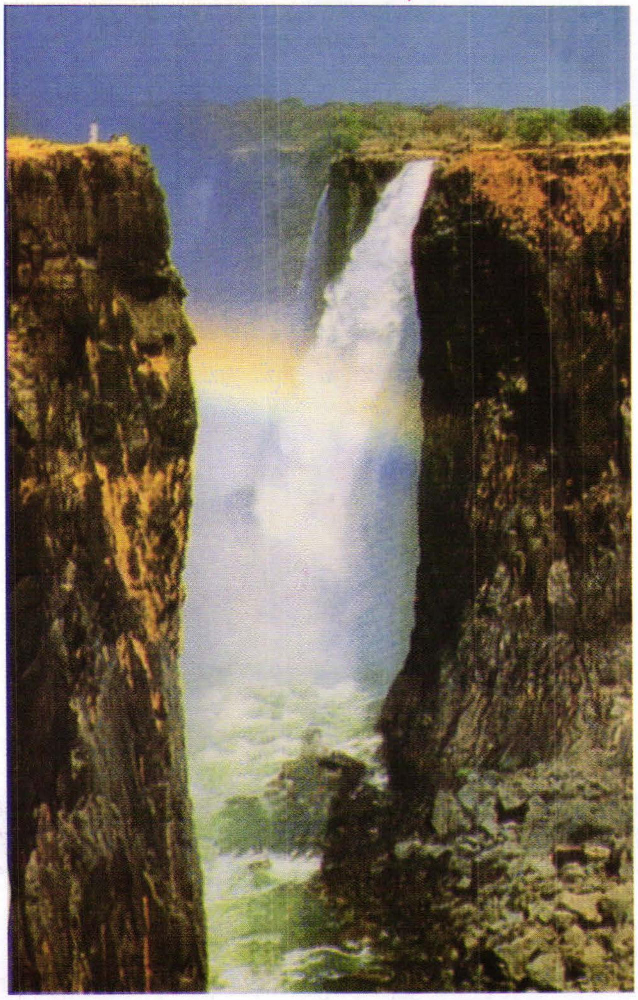

এন্টার্কটিকা

পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত বরফ ও তুষারাচ্ছন্ন মহাদেশ। ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এ্যামান্ডসেন দক্ষিণ মেরুর সর্ব দক্ষিণ বিন্দুতে পৌছান। ১৯১২ সালের ১৮ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন স্কট তার ৪ জন সঙ্গী নিয়ে এই বিন্দুতে পৌছাতে গিয়ে হারিয়ে যান। অতি শীতলতার কারণে এই মহাদেশ জনমানব শূন্য।

এন্টার্কটিকা

জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি

ফুজিয়ামা

ফুজিয়ামা জাপানে অবস্থিত কোণ (Cone) আকৃতির একটি বৃহৎ আগ্নেয়গিরি। এর সর্বশেষ অগ্নুৎপাত হয়েছিল ১৭০৭ সালে। পৃথিবীর আরো কয়েকটি প্রধান আগ্নেয়গিরি হচ্ছে- স্ট্রোম্বলি (লিপারী দ্বীপ), ভিসুভিয়াস (ইতালি), কোহিসুলতান (ইরান) ইত্যাদি। তবে প্রশান্ত-মহাসাগরে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক আগ্নেয়গিরি অবস্থিত বলে এই অঞ্চলকে আগ্নেয় বলয় বলা হয়।

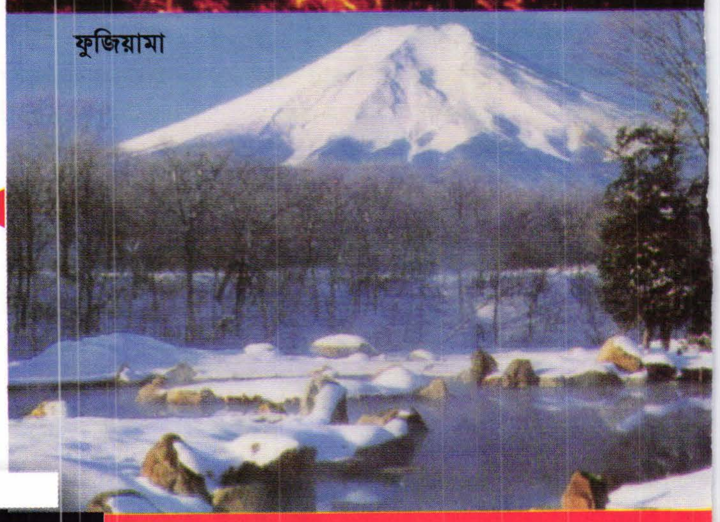

ফুজিয়ামা

www.pathagar.org

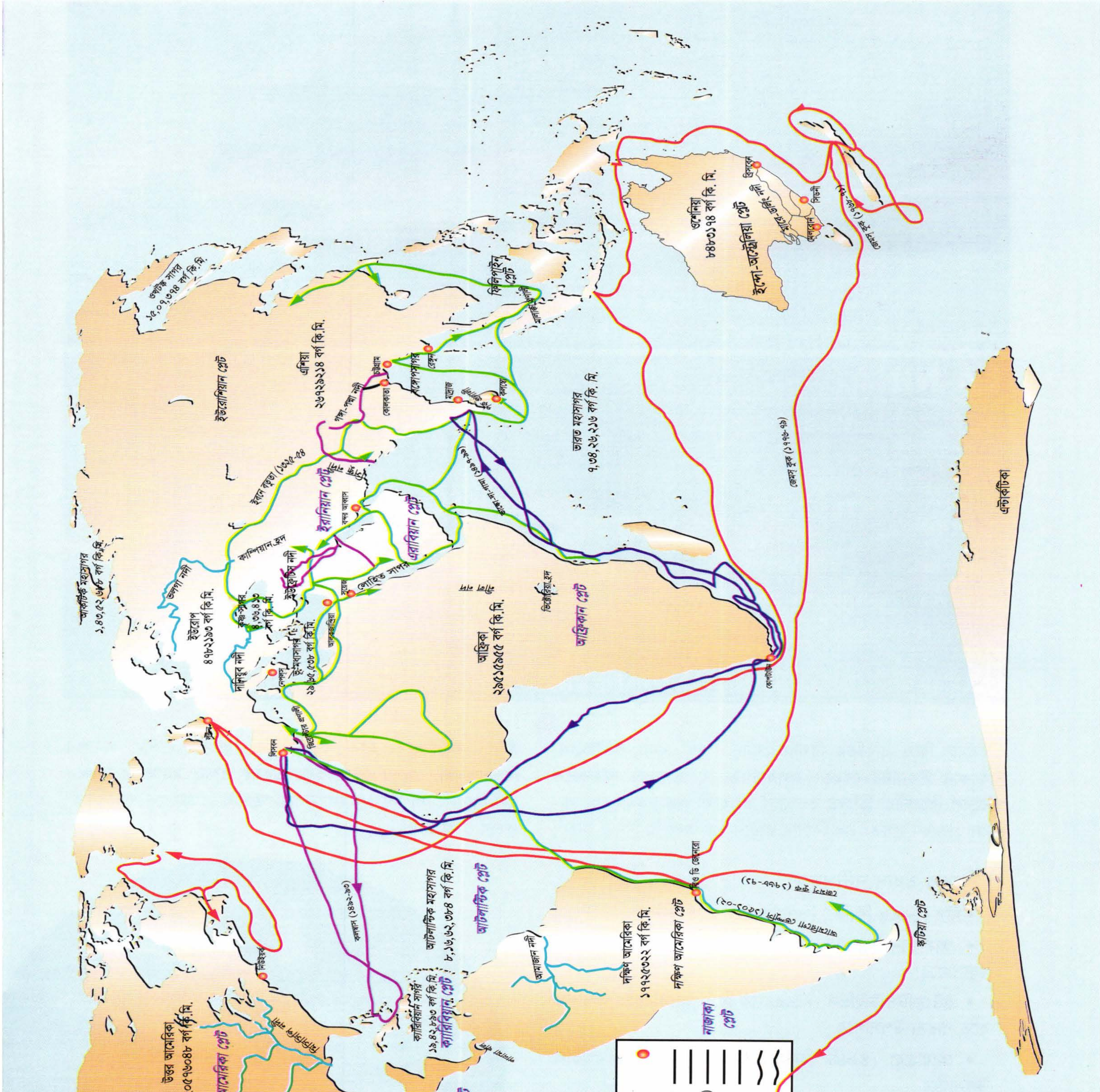

www.pathagar.org

বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ইত্যাদির পেছনে জলবায়ুগত যে প্রপঞ্চের ভূমিকাকে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন তা হলো এল-নিনো এবং লা-নিনার প্রভাব। মূলতঃ এল-নিনোর কারণে খরা এবং লা-নিনার কারণে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে এবং এদের প্রভাব পরস্পর বিপরীতমুখী। যেমন পেরু, ইকুয়েডরসহ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এল-নিনো দেখা দিলে বাংলাদেশসহ গোটা এ অঞ্চলে লা-নিনার প্রভাব দেখা দেয়।

বিশ্বের প্রধান নদীসমূহ

- নীল (৬৬৬৯ কি.মি.) ভিক্টোরিয়া হ্রদ হতে ভূ-মধ্যসাগরে
- আমাজান (৬২৭৫ কি.মি.) আন্দিজ পর্বত হতে আটলান্টিক মহাসাগরে
- ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস (৪৬৯৮ কি.মি.) আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি হতে পারস্য উপসাগরে
- হোয়াংহো (৪৬৬৮ কি.মি.) কুনলুন পর্বত হতে পেচিলি উপসাগরে
- মিসিসিপি (৩৭৭০ কি.মি.) মিনেসোটার হ্রদ হতে মেক্সিকো উপসাগরে
- দানিয়ুব (২৮৬০ কি.মি.) ব্ল্যাক ফরেস্ট হতে কৃষ্ণ সাগরে
- গঙ্গা-পদ্মা (২৫০৬ কি.মি.) হিমালয় হতে বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগরে

www.pathagar.org

মৃত সাগর : জর্ডান ও ইসরাইল সীমান্তে অবস্থিত এ বিস্ময়কর হ্রদটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নীচু জায়গা (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ মি নীচু)। অতি লবণাক্ততা (২৪০%) ঃ স্বাভাবিক লবণাক্ততা ৩০%) এবং প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও বিষাক্ত পদার্থের কারণে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না বিধায় একে মৃত সাগর বলে । পানির আপেক্ষিক ঘনত্ব এত বেশি যে হাত-পা বেধে ফেলে দিলেও কারো ডোবার সম্ভাবনা নেই। এ হ্রদে লবণ জমতে জমতে অনেক দৃশ্যমান পিলার সৃষ্টি হয়।

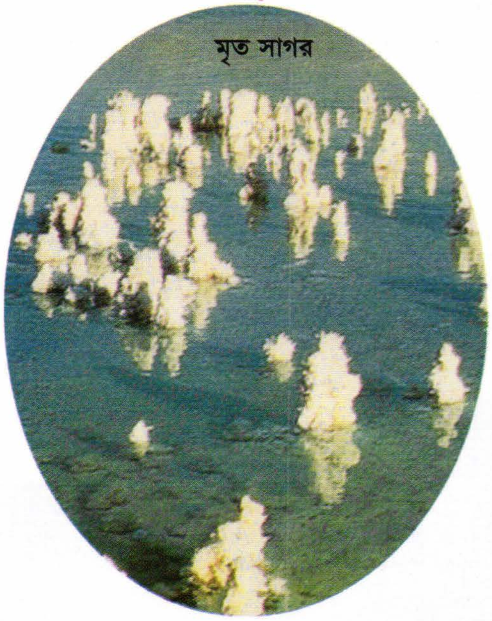

গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ ঃ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রবাল দ্বীপ । অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে উপকূলে অবস্থিত এই রীফটি ২৫০০ ক্ষুদ্র দ্বীপের সমন্বয়ে প্রায় ২ মিলিয়ন বছর আগে সৃষ্ট। বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের লাক্ষা দ্বীপ, ভারত মহাসাগরের প্যারাডাইস আইল্যান্ড ইত্যাদি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবাল দ্বীপ। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে প্যারাডাইস আইল্যান্ড বিশ্ব বিখ্যাত। প্রবাল নামক একধরণের সামুদ্রিক কীটের সঞ্চয়নের মাধ্যমে এই ধরনের দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

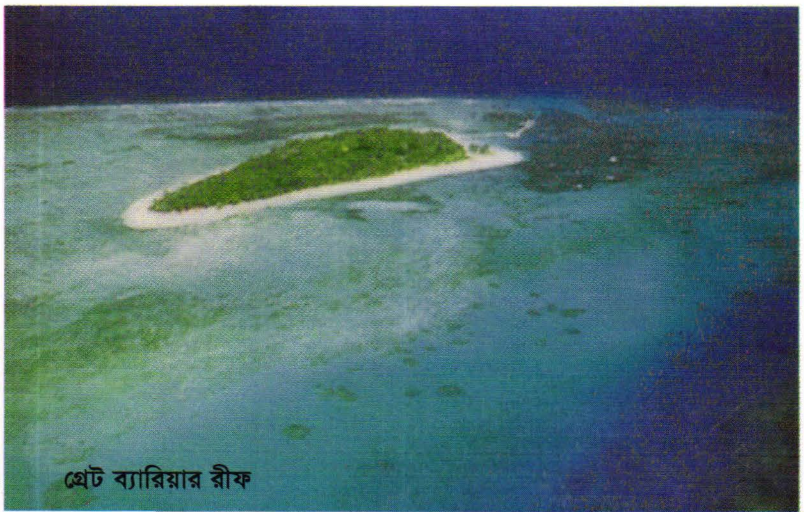

প্যারাডাইস আইল্যান্ড

হিমালয় : হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উঁচু পর্বতশ্রেণী। এটি ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট (উচ্চতা ৮৮৮৪ মিঃ) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। বিশ্বের আরো কয়েকটি প্রধান পর্বতশৃঙ্গ- গডউইন অস্টিন (ভারত ও পাকিস্তান-৮৬১১ মিঃ); কাঞ্চন জংঘা (ভারত ও নেপাল-৮৫৯৮ মিঃ); ম্যাককিনলি (আলাস্কা-৬১৯৮ মি); কোসিয়াসকো (অস্ট্রেলিয়া-২২২৮ মিঃ)

> নিশ্চয়ই আকাশ ও জমিন সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন।
> *সূরা আল ইমরান : ১৯০*

www.pathagar.org

সীরাতে রাসূল (সা) : মক্কা অধ্যায়

রাসূল (সা) এর জন্মস্থান ঃ এই সেই বাড়ি যেখানে মহানবী (সা) ৫ মে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। মসজিদুল হারাম থেকে আনুমানিক ৫০ মিটার দূরে সূক-আল-লাইন এলাকায় অবস্থিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের এ বাড়িটিতেই বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বমানবতার অগ্রদূত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম আগমন করেন। তাঁর জন্মে অত্যধিক খুশি হয়ে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নাম রাখেন 'মুহাম্মদ' বা প্রশংসিত। ইতোপূর্বে এ নাম আর কারো ছিল না।

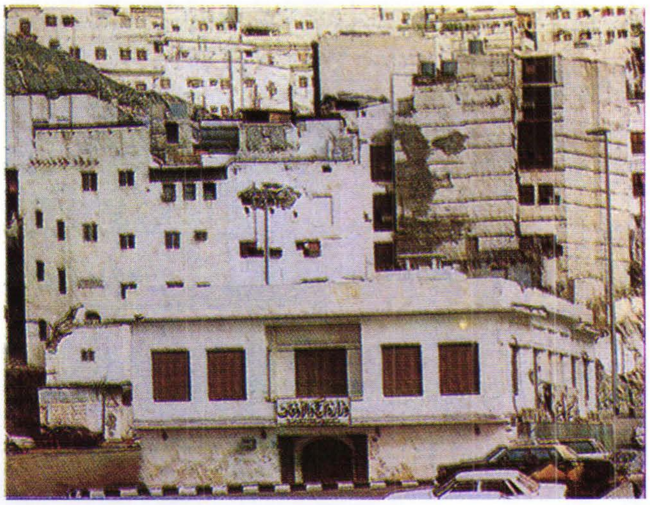

রাসূল (সা) এর জন্মস্থান

রাসূল (সা) এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে (৫৭০খ্রি:) কাবাঘর ধ্বংস করতে এসে আবরাহা ও তার বিশাল হস্তী বাহিনী এখানে ধ্বংস হয়। এ স্থানে পৌঁছার সাথে সাথে হাতিগুলো বসে যায়, কাবামুখী না হয়ে উল্টো দিকে ছুটতে থাকে। ঠিক সে সময় ক্ষুদ্রাকৃতির এক ঝাঁক আবাবিল নামক পাখি ছোট ছোট পাথর কণা নিক্ষেপ করে সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ভূষির ন্যায় করে ফেলে। ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে রাসুল (সা) এর জন্মের পূর্বাভাস হিসেবে মনে করেন। নইলে কাবার অধিকারী পৌত্তলিকদের নিকট আবরাহার খ্রিষ্টান বাহিনীর পরাজয় ঘটত না। আল্লাহ বলেন-'আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রভু হস্তী বাহিনীর সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?' *(-সূরা ফীল)*

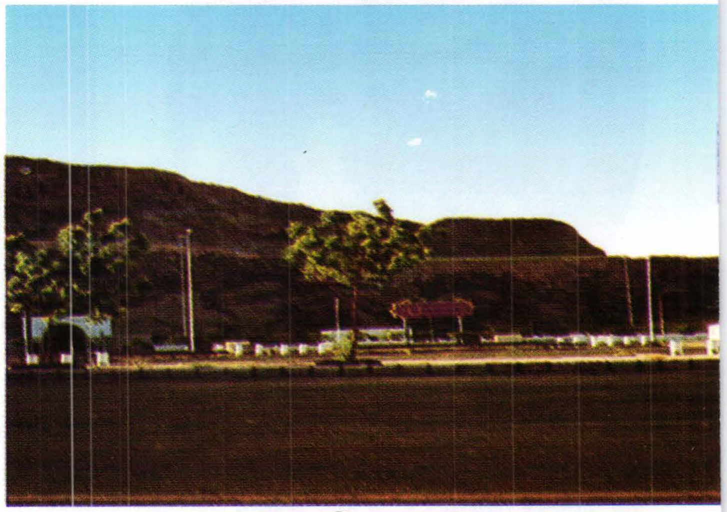

ওয়াদী আল মুহাসসর

জীবনপঞ্জি : নবুওয়াত পূর্ব সময় (৪০ বছর)

৫৭০ খ্রি: ৫ মে, ১২ রবিউল আউয়াল (ভিন্নমত ৫৭১ খ্রি: ২০ এপ্রিল, ৯ রবিউল আউয়াল) সোমবার সুবহে সাদেকের সময় মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্ম। ১৫ দিন পর দুধ পান, বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় লালন ও পরিশুদ্ধ ভাষা রপ্তের জন্য বনু সাদ গোত্রের হালিমা সাদিয়াকে প্রদান।

৫৭২ খ্রি:(২ বছর) : দুধপান শেষে মা আমিনার কাছে প্রত্যাবর্তন। বরকত লাভের আশায় হালিমার পুনরায় নেওয়ার আবেদন এবং মক্কায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে মায়ের সম্মতি।

৫৭৪ খ্রি: (৪ বছর) : ১ম বক্ষ বিদীর্ণ। হালিমা এতে ভীত হয়ে তাঁকে মায়ের কাছে দিয়ে আসেন।

৫৭৬ খ্রি: (৬ বছর) : মায়ের সাথে মদীনায় পিতার কবর জিয়ারত শেষে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মায়ের মৃত্যু। দাসী উম্মে আইমান মক্কায় নিয়ে এলে দাদা আবদুল মুত্তালিবের স্নেহে লালন-পালন।

৫৭৮ খ্রি: (৮ বছর) : দাদার মৃত্যু। চাচা আবু তালিবের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ, আমৃত্যু (রাসূলের ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত) ছায়ার মত আশ্রয় দান।

৫৮০ খ্রি: (১০ বছর) : ২য় বার বক্ষ বিদীর্ণ।

www.pathagar.org

৫৮২খ্রিঃ(১২ বছর) : ৪ বছর ধরে চাচার মেষ পালন। তারপর চাচার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে রওয়ানা। পথিমধ্যে বুসরা নামক স্থানে পাদ্রী বাহীরা কর্তৃক নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বাহীরার সতর্ক পরামর্শে ফিরে আসা। পরবর্তীতে ২০/২১ বছর বয়স পর্যন্ত চাচাদের সাথে ইয়ামান, সিরিয়া, বাহরাইন, জাআশা, জারাল প্রভৃতি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে একাধিকবার সফর।

৫৮৪খ্রিঃ(১৪ বছর) : তীর কুড়িয়ে ও আগুন নির্বাপণের মাধ্যমে ৪র্থ ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং মানবাধিকার ও সমাজসেবামূলক সংস্থা 'হিলফুল ফুযুল' গঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর কার্যক্রম নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

৫৯৪ খ্রিঃ(২৪ বছর) : মক্কার অভিজাত ধনাঢ্য মহিলা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের (রা) মালামাল নিয়ে সিরিয়া-ইয়ামানে দু'বার বাণিজ্য সফর ও অভাবিত লাভ অর্জন এবং খাদিজার ভৃত্য সফরসঙ্গী মাইসারা কর্তৃক বাণিজ্যিক কুশলতা ও সততার ভূয়সী প্রশংসা।

৫৯৫ খ্রিঃ(২৫ বছর) : বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে কিংবদন্তিপ্রতীম সতী সাধ্বী নারী ৪০ বছর বয়স্ক খাদিজার ৩য় এবং নবীজির ১ম বিয়ে।

৬০৫ খ্রিঃ(৩৫ বছর) : কাবা শরীফ সংস্কার কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপন বিবাদের অভূতপূর্ব মীমাংসার ফলে অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা এবং মক্কার অবিসংবাদিত মধ্যস্থতাকারীতে পরিণত। এ সময়ে বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতার কারণে কৈশোরে প্রদত্ত আল-আমীন, আস-সাদিক উপাধির বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ। ৫ বছরের চাচাত ভাই আলীকে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত।

৬০৭খ্রিঃ(৩৭ বছর) : ৩ বছরব্যাপী হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতা শুরু।

৬১০খ্রিঃ(৪০ বছর) : নবুওয়াত প্রাপ্তির অল্প কিছুদিন পূর্বে ৩য় বার বক্ষ বিদীর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবনের বিভিন্ন দিক

পিতামাতা : পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম (৫৪৫খৃ-৫৭০খ্রিঃ)। তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবাণীর জন্য পিতার মানতে নির্ধারিত হন এবং ১০০ উটের বিনিময়ে তা থেকে রক্ষা পান। এ জন্যে রাসূল (সা) নিজেকে ইবনুয যাবীহাইন বা দু'যবাইকৃতের সন্তান বলতেন। তিনি রাসূল (সা) জন্মের ৫ মাস পূর্বে মারা যান। মা ছিলেন আমিনা বিনতে ওয়াহাব (৫৪৮খ্রিঃ-৫৭৬)। পিতামাতা উভয়ে হযরত ইসমাইল (আ) এর অধস্তন বংশধর।

দুধপান ঃ জন্মের প্রথম সাতদিন নিজ মাতা আমেনার, তারপর আটদিন আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার, তারপর দু'বছর বনু সাদ গোত্রের হালিমার এবং একদিন বনু সাদ গোত্রের জনৈক মহিলার দুধপান।

দুধ ভাই-বোন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর যে সব দুধ ভাই-বোনের পরিচয় পাওয়া যায় তারা হলেন-১. মাছরুহ, সুয়াইবার ছেলে। ২. হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ঃ সুয়াইবার দুধপান। ৩. আবু সালমা ইবনে আব্দুল আছাদ মাখজুমি ঃ সুয়াইবার দুধ পান। ৪. আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ঃ বনুসাদ গোত্রের উক্ত জনৈক মহিলার দুধ পান। এবং হালিমার সন্তানগণ যথাক্রমে ৫. আব্দুল্লাহ। ৬. আনিসা। ৭. হুযাইফা। ৮. শায়মা।

সম্মানিত স্ত্রীগণ ঃ ১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) (৫৫৬-৬১৯খ্রিঃ), ২। সাওদা বিনতে যাম'আ (৫৭২-৬৪৩খ্রিঃ)। ৩. আয়েশা বিনতে আবি বকর (৬১৩-৬৭৬খৃ)। ৪. হাফসা বিনতে উমর (৬০৪-৬৬৫ খ্রিঃ)। ৫. জয়নব বিনতে খুযাইমা (৫৯৬-৬৬৫খৃ)। ৬. উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া **(৫৯৫-৬৭৭খ্রিঃ)** ৭. উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান (৫৯০-৬৬৪খ্রিঃ)। ৮. জয়নাব বিনতে জাহাশ (৫৮৫-৬৪০খ্রিঃ)। ৯. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (৬০৫-৬৭০খ্রিঃ)। ১০. রায়হানা বিনতে শামউন (৫৮৮-৬৩১খ্রিঃ)। ১১. মারিয়া কিবতিয়া (৫৯০-৬৩৭খ্রিঃ)। ১২. সাফিয়া বিনতে হুয়াই (৫৮৮-৬৭০খৃ)। ১৩. মাইমুনা বিনতে হারিস (৫৮৩-৬৭১খ্রিঃ)।

সন্তান-সন্ততি ঃ খাদিজা (রা) এর গর্ভে-১. কাশিম ২. আবদুল্লাহ ৩. জয়নব ৪. রুকাইয়া ৫. উম্মে কুলসুম ৬. ফাতিমা; মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে- ৭. ইব্রাহীম। একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া সকলেই রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় মারা যান।

রাসূল (সা) এর শারীরিক গঠন: মধ্যম আকৃতি। অত্যন্ত লাবণ্যময় চেহারা। মেদহীন শরীর। দুধে আলতা মেশানো রং। মধ্য সিঁথির কানের লতি পর্যন্ত ঢেউ খেলানো বাবরী চুল। অপেক্ষাকৃত বড় মস্তক, প্রশস্ত ললাট। কুচকুচে কালো মণির ও কিঞ্চিৎ রক্তিমাভ সাদা অংশের চোখ, বড় বড় পাতা। উন্নত নাসিকা। সামান্য ফাঁকা ফাঁকা রজতশুভ্র দাঁত। দীর্ঘ মাংসল স্কন্ধের মধ্যস্থলে কবুতরের ডিম সদৃশ ঈষৎ লাল রংয়ের 'মোহরে নবুয়াত'। ঘন লম্বা দাড়ি। লম্বাটে হাত ও অঙ্গুলি। ভরাট-প্রশস্ত তালু। উন্নত ও প্রশস্ত বক্ষ, বক্ষস্থল থেকে নাভী পর্যন্ত সরু চুলের রেখা। পশমে ভরা শরীর। মসৃণ-নরম চামড়ায় ঘামবিন্দু মুক্তোর মত চমকাত ও সুগন্ধ ছড়াতো। সুগঠিত উরু ও পদদ্বয়। সামান্য ঝুঁকে মাটির দিকে দৃষ্টিনত দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুপুরুষ রাসূল (সা) সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন-'তাঁর আগে বা পরে কখনো তাঁর মত এমন সুপুরুষ আর দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি।'

www.pathagar.org

হালিমার বাড়ির উঠান ও কূপ ঃ যেখানে রাসূল (সা) তাঁর শিশুকাল কাটিয়েছিলেন। উদার প্রকৃতির মাঝে বিচরণ করে তাঁর শিশু মনোভূমি গড়ে তুলেছিলেন। রাসূল (সা) বলেন- আমাকে আমার প্রভুই শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি উত্তম স্বভাব চরিত্রে শিক্ষা দেন।

হালিমার বাড়ির উঠান ও কূপ

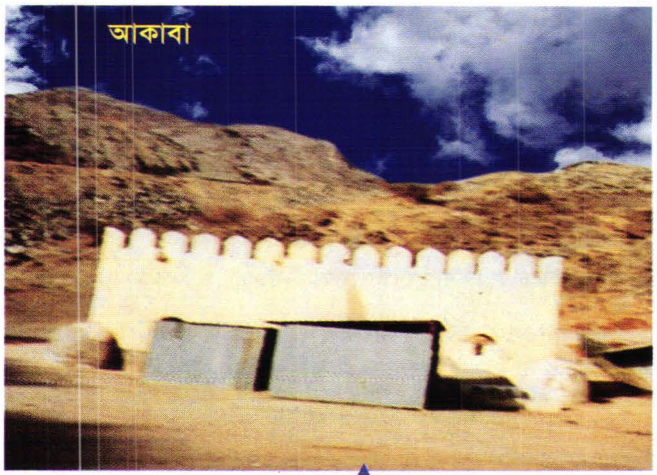

আকাবা ঃ এ স্থানে অনুষ্ঠিত তিন বছরের (৬২০খ্রি: ৬২১খ্রি: পরপর তিনটি বৈঠক এবং শপথ অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিতে রাসূল (সা) মদিনায় হিজরত করেন- যা ছিল ইসলামের সমগ্র বিজয়ের ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। ১ম বছর ৬ জন, ২য় বছর ১২ জন এবং ৩য় বছর ৭৫ জন ইয়াস্রেববাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। যারা সমস্ত বিপদ নির্যাতন মাথা পেতে নিয়ে রাসূল সা: ও ইসলামকে রক্ষার শপথ নেন।

পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ বায়তুল্লাহ বা কাবার দৃশ্য

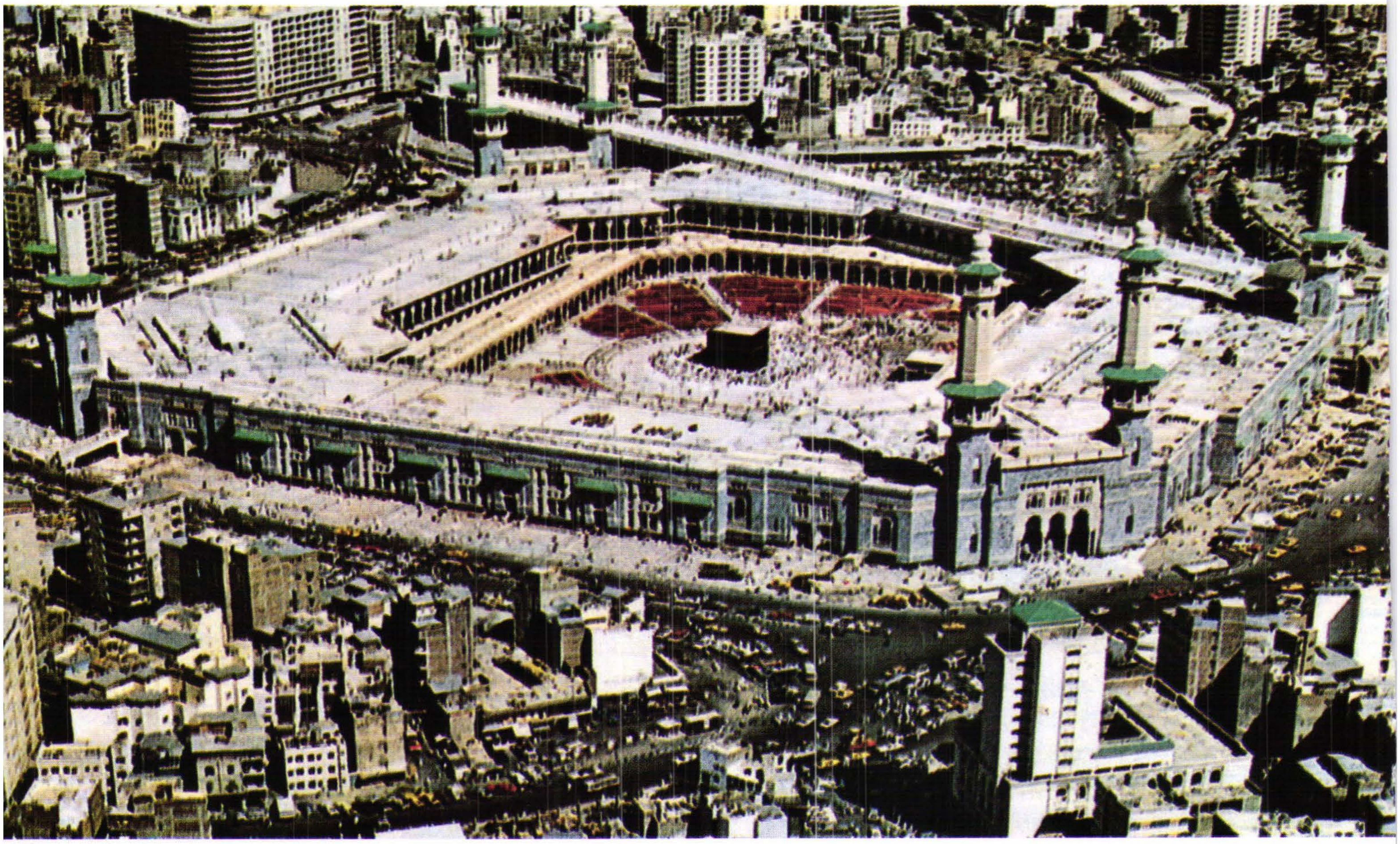

www.pathagar.org

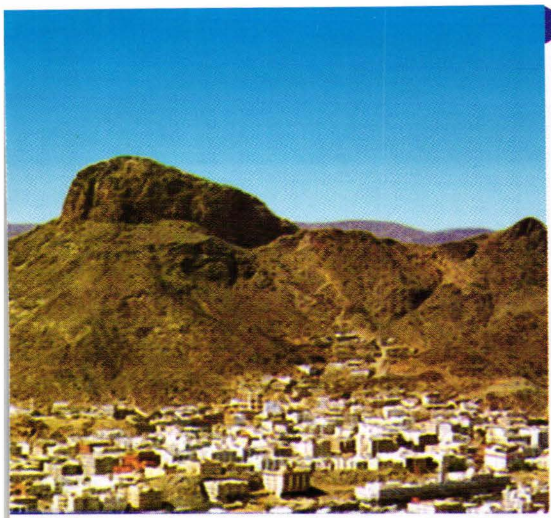

জাবালুন নূর (আলোকিত পাহাড়)

জাবালুন নূর : কাবা থেকে ৩ মাইল দূরে এক নির্জন স্থানে অবস্থিত এ পাহাড় ধারণ করেছে হেরা গুহার মত মহিমান্বিত এক গুহাকে । যেখানে অবতীর্ণ হয় রাসুল (সা) এর প্রতি প্রথম অহি, মানুষের আলোর দিশারী।

মসজিদুল আকসার ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ : মিরাজ গমনের পথে এখানেই বসে রাসূল (সা) ওজু করেছিলেন। মিরাজ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত'।

-বনী ইসরাইল ঃ ১

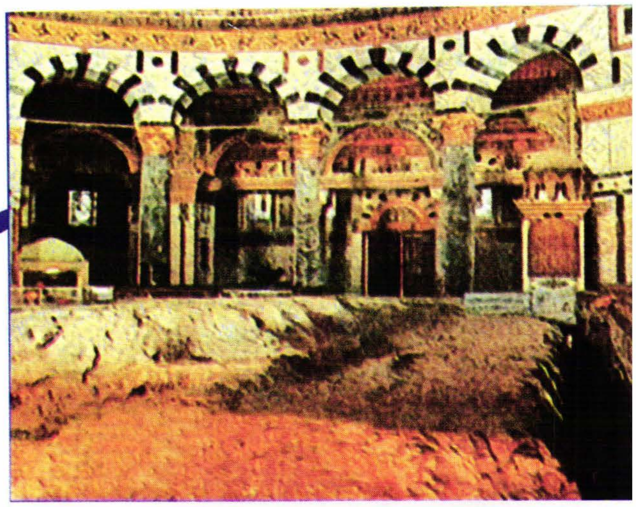

মসজিদুল আকসার ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ

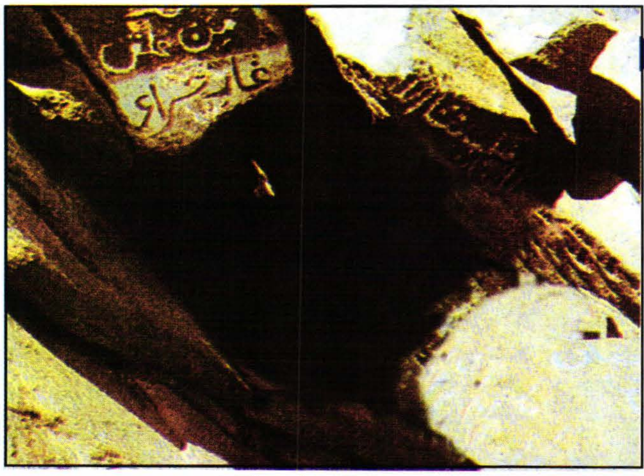

হেরা গুহা

হেরা গুহা : চার গজ দৈর্ঘ্য ও পৌনে দু'গজ প্রস্থের মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় এ গুহাতেই একদিন কুরআনের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হয়। সেদিন জিব্রাঈল (আ) আল্লাহর এ বাণী নিয়ে আসেন 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন...'। সমাজের শান্তি আনয়ন, সৃষ্টিরহস্য উৎঘাটন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছায় ৩ বছর ধরে এই গুহায় নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্ন থাকার পর তিনি যখন নবুয়াতের গুরু দায়িত্ব পেলেন, তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরলে খাদিজা (রা) তাকে সাহস যোগান এবং চাচাত ভাই সুপরিচিত ধর্মীয়পণ্ডিত ওরাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে তাওরাত-ইঞ্জিল কিতাব সূত্রে উদ্ধৃত নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

সাফা পাহাড় : একদিন যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মক্কার জনগণের উদ্দেশে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য আহ্বান জানান রাসূল (সা)। তখনই সহসা আল-আমীন, আস-সাদিক ও প্রিয়জন রাসূল (সা) কায়েমী স্বার্থবাদী কুরাইশদের চরম শত্রুতে পরিণত হন। তাঁর আপন চাচা পাপাত্মা আবু লাহাব প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে এই আহ্বানের জবাব দেন। তাই আল্লাহ ঘোষণা দেন 'ধ্বংস হলো আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে নিজেও।' এটি ছিল ইসলামের প্রথম এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল জনসভা। চিত্রে সাফা থেকে মারওয়ার ভূগর্ভস্থ রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

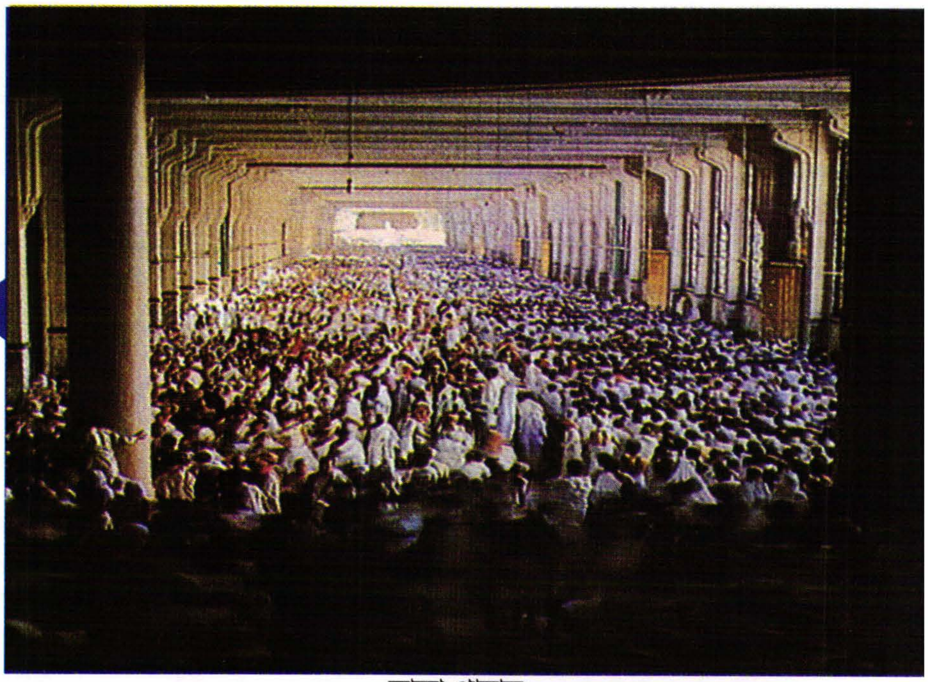

সাফা পাহাড়

www.pathagar.org

জান্নাতুল মা'আলা ঃ যেখানে শায়িত আছেন প্রিয় নবীর প্রথম সহধর্মিনি খাদিজাতুল কুবরা (রা)। যিনি শিশু ইসলাম ধর্মকে পরম মাতৃস্নেহে লালন করে ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ রাসুল (সা) ও ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দেন। যিনি রাসুলকে ইসলাম প্রচারে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস যোগাতেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসুল (সা) এর আর কোন সাহায্য ও সহায়তাকারী মক্কায় রইল না। তাই শোকে কাতর হয়ে রাসূল (সা) বলেছিলেন-'আমার পাঁজরের হাড়গুলো যেন ভেঙ্গে গেছে।' নবুয়তের ১০ম বছরের এ সঙ্কটময় সময়কে রাসূল (সা)'আমুল হুযন' বা শোক-দুঃখের বছর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কাবাঘর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত বিখ্যাত এ কবর স্থানে রাসুল (সা) ও খাদিজা (রা) দম্পতির চার সন্তানের কবর রয়েছে।

জান্নাতুল মা'আলা

তায়েফ ঃ মিনার চিহ্নিত এস্থানেই এক সময় রাসূল (সা) মারাত্মক আহত অবস্থায় আশ্রয় নেন। এ পাহাড় ও অপর একটি পাহাড়ের মধ্যখানে তায়েফ শহর অবস্থিত। রাসূল (সা) যখন তায়েফের রাস্তায় রাস্তায় কাফেরদের পাথরের আঘাতে জর্জরিত, রক্তে পদদ্বয় জবজবা; তখন কাফেরদের দৃষ্টি এড়িয়ে শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত পাহাড়টির পাদদেশের আঙুর বাগানে আশ্রয় নেন। এ সময় আদ্দাস নামক ঐ বাগান মালিকের কৃতদাস তার মজুরী থেকে আঙ্গুরের রস রাসুলকে পান করান। তখন জিব্রাইল (আ) রাসূলকে বলেন-'হে রাসূল আপনি বলুন, উভয় পাহাড়কে এক করে এ জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেই'। রাসূল (সা) তাদের ধ্বংসের পরিবর্তে হেদায়েতের জন্য যে ঐতিহাসিক মুনাজাত করেন তাতে আদ্দাস, যায়েদ (রা) ও জিব্রাইল (আ) আমিন আমিন বলেছিলেন।

সাওর পর্বত ঃ এই সেই সাওর পর্বতের গুহা, যে গুহা হিজরতের সময় প্রিয় রাসূল (সা) কে তিন দিন নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন-'আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেরেরা বহিষ্কা র করেছিল এবং যখন গুহার মধ্যে সে দু'জনের একজন ছিল...'। সূরা আত-তাওবা-৪০

রাসূল (সা) ২ রবিউল আউয়াল (১৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিঃ শনিবার মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে ৩ রাত এ গুহায় অবস্থান করেন। তারপর সোমবার লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে মদিনার দিকে গমন করেন।

হিজরতকালীন রাস্তা

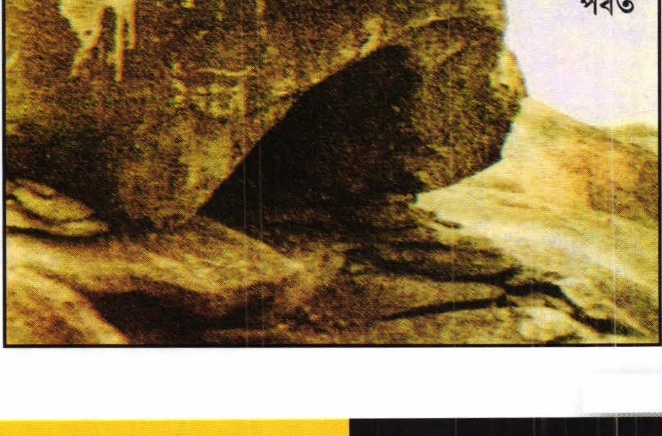
শাওর পর্বত

হিজরতকালীন রাস্তা ঃ হিজরতের সময় কাফেরদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে রাসূল (সা) কৌশলগত কারণে এ পথ ধরে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। শত চেষ্টা করেও এবং প্রলোভিত পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েও তারা রাসুলকে কোনভাবেই আটকাতে সক্ষম হয়নি।

www.pathagar.org

জীবনপঞ্জি ঃ মক্কার নবুয়্যাত কাল (১৩ বছর)

৬১০ খ্রি: ১৭ আগস্ট, ২১ রমজান সোমবার রাতে হেরা গুহায় প্রথম প্রত্যক্ষ অহি লাভ। তখন বয়স ছিল ৪০ বছর ৩ মাস ১২ দিন। ঠিক ৪০ বছর বয়স থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে নবুয়াতের নিদর্শন পাওয়া শুরু।

৬১০-৬১৩ খ্রি: গোপনে ইসলাম প্রচার, ৩ বছরে ৪০ থেকে ৫২ জনের ইসলাম গ্রহণ। সকাল-সন্ধ্যায় ২ বার নামাজের নির্দেশ।

৬১৩ খ্রি: ৩য় নবুওয়াতবর্ষ, জুন মাসে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ (১৫:৯৪)। প্রথমে নিকট আত্মীয়দের ২টি জমায়েতে দাওয়াত দান ও আবু তালেবের নিকট কুরাইশদের বিচার প্রার্থনা, ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত।

৬১৩ খ্রি: ৪র্থ নবুয়াতবর্ষ, সেপ্টেম্বর মাসের শেষে হজের মৌসুমে হাজীদের নিকট কুরাইশদের বিরুদ্ধ প্রচারণা ও তাদের বিমুখ করার চেষ্টা। হজ শেষে সম্মিলিত ও চতুর্মুখী প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত। প্রথমত : ঠাট্টা, বিদ্রুপ, উপহাস, গালাগালি; দ্বিতীয়ত : বিকৃত বর্ণনা, সন্দেহ সৃষ্টি, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালানো; তৃতীয়ত : কুরআনের বিপরীতে কাহিনী বর্ণনা ও যৌন প্রলোভন প্রদান, সবশেষে সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব।

৬১৪ খ্রি: জুলুম নির্যাতন শুরু। রজব মাসে আবিসিনিয়াতে ১৬ জন মুসলমানদের প্রথম হিজরত। তারপর ৮৩ জনের হিজরত।

৬১৫ খ্রি: ৫ম নবুয়তবর্ষ। আবু জেহেল কর্তৃক সাফা পাহাড়ে ধ্যানরত রাসূল (সা) এর মাথায় প্রস্তরাঘাত। এতে চাচা হামজা কাবায় প্রবেশ করে আবু জেহেল কে শাস্তি দান ও ইসলাম গ্রহণ।

৬১৫ খ্রি: বীর উমর (রা) এর ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ।

৬১৬-৬১৯ খ্রি: কুরাইশদের সামগ্রিক সামাজিক বয়কট।

৬১৯ খ্রি: বয়কট অবসানের কিছুদিন পর নবুওয়াতের ১০ম বর্ষে রজব মাসে চাচা আবু তালিব (৮০) ও রমজান মাসে হযরত খাদিজার (৬৫) ইন্তেকাল। শাওয়াল মাসে সাওদা বিনতে যামআকে বিয়ে। আবু যার গিফারীর ইসলাম গ্রহণ। যায়েদ (রা) কে নিয়ে মক্কার ৬০ মাইল দক্ষিণে তায়েফে ইসলাম প্রচারের জন্য গমন এবং নির্মম অত্যাচারের শিকার।

৬২০ খ্রি: ১১শ নবুওয়াত বর্ষের ২৭ রজব ৪র্থ বার বক্ষ বিদীর্ণ। মিরাজে গমন এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরযের বিধান।

৬২০খ্রি: ১১শ বর্ষে শাওয়াল মাসে আবু বকরের কন্যা আয়েশা (রা)-কে বিবাহ। হজ্জ মৌসুমে হাজীদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার। মদীনার খাজরাজ গোত্রের ৬ জনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

৬২১ খ্রি: হজ্জ মৌসুমে ১২ জন মদীনাবাসীর আকাবার ১ম শপথ।

৬২২খ্রি: আকাবার ২য় শপথ: ত্রয়োদশ নবুয়াত বর্ষে হজ্বের সময় মদীনার ৭৩জন পুরুষ ও ২জন মহিলা রাত্রে গোপনে আকাবায় ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের খেদমত করার শপথ এবং হিজরতের আহ্বান। মক্কার সক্ষম সকল মুসলমান দলে দলে মদীনায় গমন। শুধু আলী ও আবু বকর (রা) রাসুলল্লাহ (সা) এর সঙ্গে থেকে যান।

৬২২ খ্রি: ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার, মুহাম্মদ (সা) হিজরত করলে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় আবু জেহেল সকল গোত্রের একজন যুবক নিয়ে 'হত্যাকারী সংঘ' গঠন করে একত্রে তরবারির আঘাতে মহানবী (সা) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু মহানবী (সা) শুধুমাত্র মানুষের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে হযরত আলীকে রেখে সকলের অগোচরে আবু বকর (রা) কে সাথে নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

মক্কার উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

চারবার বক্ষ বিদীর্ণ ঃ মোট ৪ বার আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল ও মিকাইলকে পাঠিয়েছেন রাসূল (সা) এর বক্ষ বিদীর্ণ করার জন্য। তাঁরা রাসূল (সা) এর হৃদপিণ্ডের অপবিত্র অংশ ফেলে দিয়ে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে যথাস্থানে স্থাপন করতেন। যেমন - ১ম বার ঃ হালিমার কাছে অবস্থানকালে চারণ ভূমিতে ৪ বছর বয়সে সংঘঠিত হয়। তারা এক খণ্ড কাল জমাট রক্ত ফেলে দিয়ে বলেন-এটাই শয়তানী স্বভাব গ্রহণের ও সমস্ত পাপের উৎস। ২য় বার ঃ দশ বৎসর বয়সে মক্কার এক মরু মাঠে ফেরেশতাদ্বয় হৃদপিণ্ডের মধ্য হতে জমাট বাধা কিছু রক্ত ফেলে দিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার পদার্থগুলোর পরিবর্তে স্নেহ-ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য কোমল এক পদার্থ রেখে দেন। ৩য় বার ঃ নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বক্ষণে ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায়। এতে তিনি নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হন। ৪র্থ বার ঃ মিরাজের যাওয়ার প্রাক্কালে শেষ বারের মতো জমজম কূপের নিকট বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃদয় ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়।

www.pathagar.org

আবিসিনিয়ায় হিজরত : নবুয়াতের ৪র্থ বছরের মাঝামাঝি মুসলিমদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রাসূল (সা) হযরত উসমান (রা) এর নেতৃত্বে একদল মুসলিমকে ন্যায়পরায়ণ শাসক নাজ্জাশীর শাসনাধীন আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। ২য় পর্যায়ে আরও একদল মুসলিম হিজরত করে। তখন তাদের পিছু নেয় কাফেরদের একটি প্রতিনিধিদল এবং এরা মুসলমানদের ফেরত পাঠানোর জন্য নাজ্জাশীকে অনুরোধ করে। নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা) এর আবেগময়ী বক্তৃতা শুনে তাদের মক্কায় ফেরত না পাঠিয়ে বরং ইসলাম গ্রহণ করেন।

শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী : নবুয়াতের ৭ম বছরে মহানবী (সা) এর সাথে সম্পর্কিত বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে শিয়াবে আবু তালিব নামক স্থানে অবরুদ্ধ করা হয় এবং সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়। এর ফলে ৩ বছর ক্ষুধা দারিদ্র্য মারাত্মক আকার ধারণ করে। ক্ষুধার কষ্ট এত মারাত্মক ছিল যে ঘাস, লতাপাতাও কখনো কখনো খেতে হতো। কিন্তু তারপরও রাসূল (সা) তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতেন। ৩ বছর পর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ অবরোধের অবসান ঘটে।

মিরাজ : নবুওয়াতের একাদশ বছরের ২৭ রজব মহানবী (সা) সশরীরে বোরাক বাহনে করে মসজিদে হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে সেখানে সকল নবীদের নামাজে ইমামতি করেন। তারপর মহাকাশের সকল স্তরের সৃষ্টিরহস্য অবলোকন ও উল্লেখযোগ্য নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর মহাকাশের শেষ সীমা 'সিদরাতুল মুনতাহা'। সিদরাতুল মুনতাহা হতে রফরফে চড়ে আরশে আজিমের কাছে যান এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিময় করেন। যা নামাজে আজও পঠিত হয়। তিনি আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা লাভ এবং নৈতিক ও আদর্শিকভাবে গড়ে উঠার জন্য মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উপহার পান। এ সফরে জান্নাত-জাহান্নাম ও বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিসহ বহু অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করেন।

আকাবার শপথদ্বয় : মক্কার আকাবা নামক স্থানে সংঘঠিত শপথদ্বয় ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। যখন রাসূলের (সা) জীবনের চরম সঙ্কট চলছিল, চারদিকে শুধু বিরোধিতা। মক্কার কোথাও দাওয়াত কবুলের কোন স্থান নেই, তায়েফসহ বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত প্রত্যাখ্যান-এমন সময় ইয়াস্রেববাসীগণ ইসলামের দিকে এগিয়ে আসেন। এ স্থানে তাদের একদল (৬জন) নবুওয়াতের একাদশ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছর ১২ জনের অপর দল ইসলাম গ্রহণ করে বেশকিছু বিষয়ে শপথ নেন, এটি আকাবার ১ম শপথ। এয়োদশ বছরে ৭৫ জন একই স্থানে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা) কে হিজরতের আহ্বান জানান এবং সবধরনের বিপদ-নির্যাতন মাথায় পেতে নিয়ে রাসূল ও ইসলামকে রক্ষার শপথ নেন।

হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

সূরা আল কালাম : 4

www.pathagar.org

সীরাতে রাসূল (সাঃ) মদীনা অধ্যায়

জীবনপঞ্জি : মদীনার গৌরবময় সময়

৬২২ খ্রিঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ১ম হিজরী ৮ রবিউল আউয়াল-মহানবী (সা) কুবায় পৌছেন। প্রথম মসজিদ নির্মাণ। ৫ অক্টোবর ২৩ রবিউল আউয়াল-বানু সালিম গোত্রে সর্বপ্রথম জুমআর নামাজ আদায় করেন। তারপর মদিনায় আগমন: বিপুল সম্বর্ধনা।

৬২৩ খ্রিঃ এপ্রিল, ১ম হিজরী শাওয়াল-মসজিদে নববী নির্মাণ সম্পন্ন। সাত মাস আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এর বাসভবনে অবস্থান শুরু।

৬২৩ খ্রিঃ আগস্ট, ২য় হিজরী সফর- মদিনায় ২০০ মাইল দূরে আবওয়া নামক স্থানে বানু দুমরার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।

৬২৩ খ্রিঃ ডিসেম্বর, ২য় হিজরী জামাদিউস সানি-মদিনার ৯০ মাইল দূরে বানু মুদলিজের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।

৬২৪ খ্রিঃ জানুয়ারী, ২য় হিজরী রজব-বিখ্যাত মদিনার সনদ রচনা এবং সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের সম্মতি ও স্বাক্ষর।

৬২৪ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী, ২য় হিজরী শাবান-মসজিদুল আকসার পরিবর্তে ক্বাবার দিকে কিবলার পরিবর্তন। নামাজের আজানের প্রবর্তন।

৬২৪ খ্রিঃ ১৩ই মার্চ, ২য় হিজরী ১৭ রমজান-ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে কুরাইশদের চরমভাবে পরাজয়বরণ।

৬২৪ খ্রিঃ ২৬ এপ্রিল, ২য় হিজরী জিলক্বদ-ইহুদি গোত্র বানু কাইনুকাকে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ১৫ দিন অবরোধ, শেষে বহিষ্কার।

৬২৫ খ্রিঃ ২৩ মার্চ, ৩য় হিজরী ৭ শাওয়াল-উহুদ যুদ্ধ।

৬২৫ খ্রিঃ ২৩ মার্চ, ৩য় হিজরী ৮শাওয়াল-যুদ্ধ **ফিরতা** কুরাইশ বাহিনীর পুনঃআক্রমণ রোধ করতে মুসলিম বাহিনির হামরাউল আছাদ পর্যন্ত অগ্রসর, এতে ভীত হয়ে রওয়া থেকে কাফেরদের পলায়ন।

৬২৫ খ্রিঃ আগস্ট, ৪ঠা হিজরী রবিউল আউয়াল -রাসূল (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র ও সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে মদিনা থেকে খাইবারে বহিষ্কার।

৬২৬ খ্রিঃ জানুয়ারী, ৪ হিজরী শাবান-আবু সুফিয়ানের পূর্বের চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী বদর প্রান্তে মহানবী (সা) মোকাবেলার জন্য পৌছালেও, মক্কা থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবু সুফিয়ানের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পালায়ন।

৬২৬ খ্রিঃ জুলাই, ৫ হিজরী রবিউল আউয়াল- সিরিয়ার

নিকটবর্তী দুমাতুল জন্দালে ১০০০ সাহাবি নিয়ে গমন, খবর পেয়ে শত্রুদের পলায়ন।

৬২৭ খ্রিঃ মার্চ ৫ হিজরী ২য় শাবান-মদিনার ২০০ মাইল দূরে রাসূল (সা) মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান, ইফকের ঘটনা। পর্দার বিধান অবতীর্ণ।

৬২৭ খ্রিঃ মার্চ ৫ হিজরী শাওয়াল-খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ। ইহুদি, কুরাইশ ও বেদুইন ত্রিশক্তির সম্মিলিত বাহিনীর মাসব্যাপী মদিনা অবরোধ। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে তাদের পলায়ন।

৬২৭ খ্রিঃ এপ্রিল, ৫ হিজরী জিলকদ্ব-খন্দক যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে ইহুদি গোত্র বানু কায়নুকার ২৫ দিন অবরোধের পর আত্মসমর্পণ, পুরুষ যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান।

৬২৭ খ্রিঃ ৬ হিজরী-খৃষ্টানদের সাথে সন্ধি।

৬২৮ খ্রিঃ মার্চ, ৬ হিজরী শাওয়াল- ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি। যাকে কুরআন স্পষ্ট বিজয় বলা হয়। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ।

৬২৮ খ্রিঃ মে, ৭ হিজরী মহররম-খাইবার অভিযান ও বিজয়।

৬২৯ খ্রিঃ মার্চ, ৭ হিজরী শাওয়াল-২০০ সাহাবী নিয়ে উমরা হজ্ব পালন।

৬২৯ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর, ৮ হিজরী জমাদিউল আউয়াল- মুতার যুদ্ধে লক্ষাধিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩ হাজার মুসলমানদের ৩ দিন যুদ্ধের পর বিজয়। যুদ্ধে বীরত্বের কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ উপাধি প্রদান।

৬৩০ খ্রিঃ ১৫ জানুয়ারী, ৮ হিজরী ২১ রমজান-দশ হাজার সাহাবী নিয়ে ১০ রমজানে মক্কাভিযানে যাত্রা এবং রক্তপাতহীনভাবে ২১ রমজানে মক্কা বিজয়। এটি ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা।

৬৩০ খ্রিঃ ২৭ জানুয়ারী, ৮ হিজরী ৬ শাওয়াল-হুনাইনের যুদ্ধের বিজয়।

৬৩০ খ্রিঃ মার্চ, ৮ যিল-ক্বদ-তায়েফ বিজয়। শত্রুদের ইসলাম গ্রহণ।

৬৩০ খ্রিঃ নভেম্বর, ৯ হিজরী রজব- ৪০ হাজার সাহাবী নিয়ে তাবুক অভিযান। রোমান সম্রাট লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়েও ফিরে যায়।

৬৩০-৬৩১ খ্রিঃ ৯হিজরী- প্রতিনিধি প্রেরণের বছর। ওমান, হাজরামাউত, নাজরান, মাহবার, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধি মদীনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬৩২ খ্রিঃ ৩ ফেব্রুয়ারী, ১০ হিজরী ২৫ যিলক্বদ- ১,১৪,০০০ সাহাবীসহ মক্কায় হজ্জে গমন এবং ৯ যিলহজ্জ/৮ মার্চ আরাফাতে বিদায় হজের ভাষণ।

৬৩২ খ্রিঃ ২৮ মে, ১১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার-দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণে মহানবী (সা) এর ইন্তেকাল এবং আয়েশা (রা) ঘরে যেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন সেখানেই সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.org

মসজিদু নববী : রাসূলুল্লাহ (সা) এর সবচেয়ে প্রিয় স্থান, সর্বশেষ বিশ্রামস্থল, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান কার্যালয় হলো এই মহান মসজিদ। ইবাদতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মাত্র তিনটি স্থান ভ্রমণ বৈধ, তম্মধ্যে একটি হলো এই মসজিদ। মদীনায় পৌছেই মহানবী (সা) এ মসজিদ তৈরী করেন। তাঁর ক্বাসওয়া নামক উটের মাধ্যমে নির্ধারিত এ স্থানটি নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল নামক দু ইয়াতীম বালকের পতিত জমি। তারা এ জমি দান করতে চাইলেও রাসুলুল্লাহ (সা) দশ দিনার মূল্যে তা ক্রয় করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন। পাথর ও চুন দিয়ে গাঁথা তিন হাত গভীর ভিত্তির ওপরে খেজুর গাছের খুঁটি ও কাঁচা ইটের দেয়াল এবং মাটির প্রলেপ দেয়া খেজুর পাতার ছাদ দিয়ে মসজিদটি নির্মিত। এখানে বসেই রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর প্রথম তিন খলিফা বিশ্ব শাসন করতেন। ১ম হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে এ মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। রাসুল (সা) ৭ম হিজরীতে মসজিদটিকে ২৪৭৫ বর্গমিটার এবং হজরত উমর, উসমান (রা), আঃ মালিকসহ অন্যরা মোট ৯ বার সম্প্রসারণ করেন। সর্বশেষে বাদশা ফাহাদ ৮২ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেন।

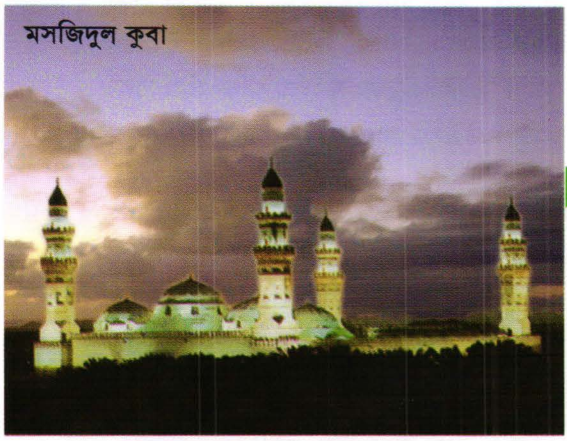

মসজিদুল কুবা : রাসুল (সা) এর আগমন সংবাদে মদীনাবাসীর আনন্দের সীমা নেই। প্রতিদিন ভোরে দলে দলে নারী-পুরুষরা ৩ মাইল দূরে কুবা পল্লীর হাররা নামক স্থানে জড়ো হতো এবং হতাশ হয়ে ফিরে যেত। যথারীতি একদিন সবাই ফিরে গেলে এক ইহুদী দুর্গ প্রাচীরে উঠে বহুদূরে ধূলি উড়তে দেখে চিৎকার দিয়ে মহনবী (সা) এর আগমনবার্তা জানায়। সাথে সাথে চতুর্দিকে মুহুর্মুহু আনন্দ শ্লোগানে ভরে ওঠে। মহনবী (সা) আমর বিন আওফের গোত্রপতি কুলসুম বিন হাদামের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৪ দিন অবস্থানকালে তিনি কুলসুম (রা) এর দেয়া জমিতে মসজিদুল কুবা তৈরি করেন-যা ছিল মুসলিমদের প্রথম মসজিদ।

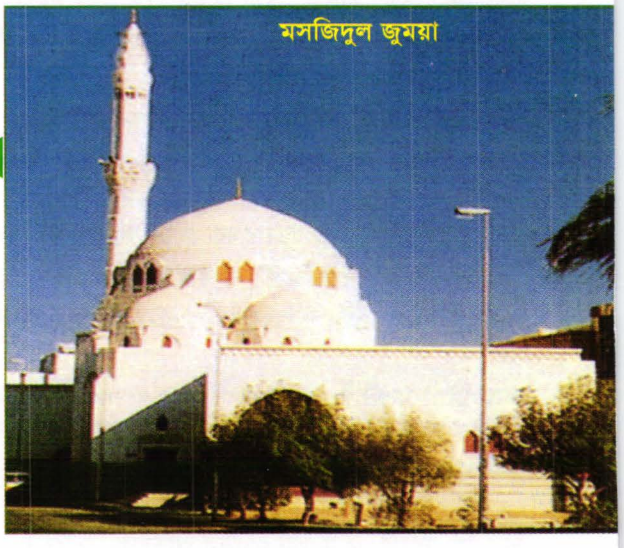

মসজিদুল জুময়া ঃ কুবা থেকে মদীনার পথে যখন জুময়ার নামাজের সময় হয়, তখন মহানবী (সা) বনী সায়ম বিন আউফ গোত্রের এক উন্মুক্ত ময়দানে ১০০ জন মুসল্লি নিয়ে প্রথম জুময়ার নামাজ পড়েন। পরবর্তীতে এ স্থানটি একটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়। এটি মসজিদে কুবা থেকে ৯০০ মিঃ দূরে অবস্থিত।

সানিয়াতুল বিদা ঃ হিজরতের সময় কুবা হতে মদীনায় প্রবেশ পথে যেখানে দাঁড়িয়ে মদীনার সর্বস্তরের জনগণ মহানবী (সা) কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তারা গাইতে থকেন 'তালায়াল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদা..' যে গানে তাদের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঝরে পড়ে। দুঃখভারাক্রান্ত নবীহৃদয় সহসা যেন আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সর্বাধিক গীত এ বিখ্যাত গানের কলি 'সানিয়াতুল বিদা' থেকে স্থানটির নামকরণ করা হয়। এটি মদীনার প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত।

www.pathagar.org

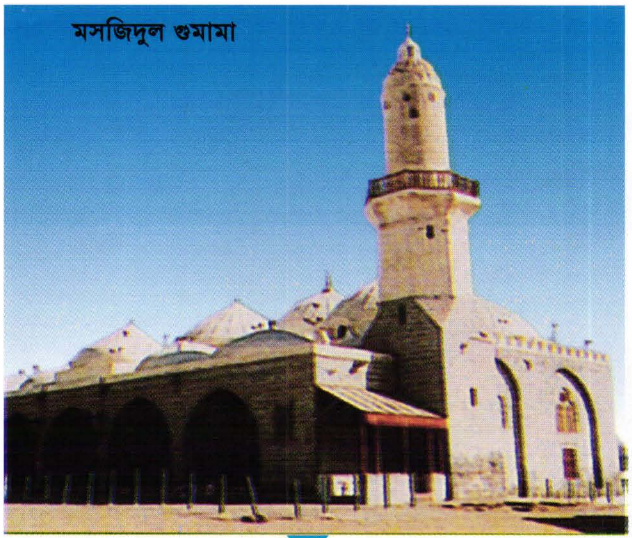

মসজিদুল গুমামা : রাসূল (সা) মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী ময়দানের বিভিন্ন স্থানে ইস্তিকা, দুই ঈদের নামাজ পড়তেন। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের ইস্তিকা, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাজের স্থান'। পরবর্তীতে সেখানে কয়েকটি মসজিদ তৈরি হয়। মসজিদে গুমামা তন্মধ্যে প্রধান।

কাব বিন আশরাফের ভগ্ন প্রাসাদ : ইসলামের চরম দুশমন ইহুদি নেতা কাব বিন আশরাফ মদীনার সনদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিভিন্ন ধরনের উস্কানীমূলক কাজ করত, মুসলিম নারীদের নিয়ে কুৎসা রচনা করত। বার বার সতর্ক করার পরও প্রতিনিয়ত ইসলাম, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলত, উস্কানিমূলক কবিতা লিখত, তথ্য সন্ত্রাস চালাতো। এভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা চরমভবে লঙ্ঘিত হতে থকে। বদর যুদ্ধের পর কুরাইশদের মনোবল চাঙ্গা করতে সে মক্কায় যায় এবং শেষ পর্যন্ত উহুদ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তাই রাসূল (সা) তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন এবং ৩য় হিজরির প্রথম দিকে তা কার্যকর হয়।

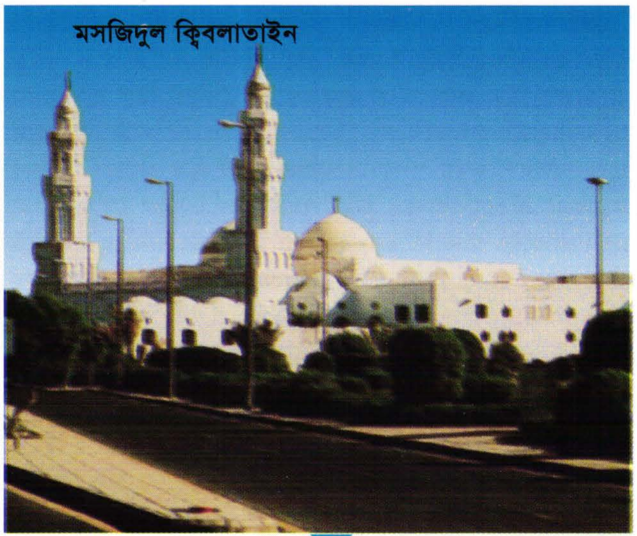

মসজিদুল ক্বিবলাতাইন : ২য় হিজরির শাবান মাসে রাসূল (সা) বনী সালামা গোত্রের এ মসজিদে জোহর মতান্তরে আসর নামাজের ৩য় রাকাতে অবস্থানকালে ক্বিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাজিল হয়। তখন রাসূল (সা) বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মসজিদুল হারামের দিকে (উত্তর থেকে দক্ষিণে) ক্বিবলা পরিবর্তন করেন। এজন্য মসজিদটিকে দুই কেবলার মসজিদ বা মসজিদুল ক্বিবলাতাইন বলে।

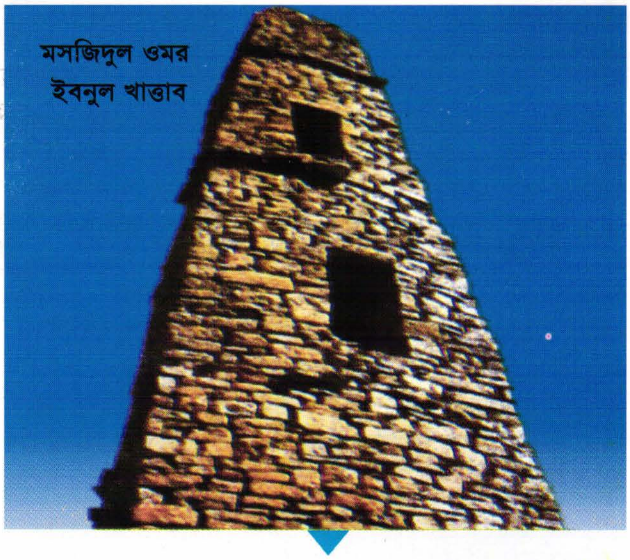

মসজিদুল ওমর ইবনুল খাত্তাব ঃ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা দামাতুল জান্দাল-যেখানে বেদুইন গোত্রগুলো মুসলিম কাফেলার ওপর প্রায়ই লুট-তারাজ করতো। তাই রাসূল (সা) এদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ৫ হিজরি রবিউল আউয়াল মাসে ১০০০ সাহাবী নিয়ে অভিযানে বের হন। রাসূল (সা) এর আগমনের সংবাদ শুনে এরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে হজরত উমর (রা) এখানে একটি চমৎকার মসজিদ তৈরি করেন, যার কাঠামো এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে এটি সৌদি আরবের আল-জওফ প্রদেশের অন্তর্গত।

www.pathagar.org

জোরানার কূপ : মসজিদে জোরানার পার্শ্ববর্তী একটি কূপ। হুনায়নের যুদ্ধের সময় কাফেলা চরম পানির সঙ্কটে পড়ে। কিন্তু এ কূপের পানি লবণাক্ত হওয়ায় পানের উপযুক্ত ছিল না। তখন মহানবী (সা) এক কুলি পানি নিক্ষেপ করলে এর পানি মিষ্টি হয়ে যায়। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কূপের পানি মিষ্ট আছে। মদীনার কয়েকটি ঐতিহাসিক কূপ হচ্ছে-**বুধাই কূপ:** এ কূপ থেকে রাসূল (সা) খাবারের পানি নিতেন; **হা কূপ:** মসজিদে নববীর সন্নিকটে এ কূপের পানিও রাসূল (সা) ব্যবহার করতেন; **আল বশ্‌শাহ কূপ; খাতাম কূপ:** হজরত উসমানের খেলাফতকালে তিনি মহানবীর (সা) আংটি যে কূপে হারিয়ে ফেলেন।

জোরানার কূপ

আরাফাহ ময়দান ঃ এই সেই মক্কার ঐতিহাসিক প্রান্তর যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা) বিদায় হজের ভাষণ দেন। আশেপাশের পাহাড়, মাঠ, প্রান্তর, উপত্যকা উপচে পড়া লক্ষাধিক মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বক্তব্য পেশ করেন। দশম হিজরির ৯ জিলহজের এ ভাষণে তিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করে নারী, কৃতদাস, শ্রমিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়সহ সকল দুর্বল শ্রেণীকে অধিকার রক্ষা এবং সবধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ নির্মূলের আহ্বান জানান। এর পরপরই রিসালাতকে পূর্ণতা দান করে মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন- 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম'। *সূরা আল মায়িদা : ৩*

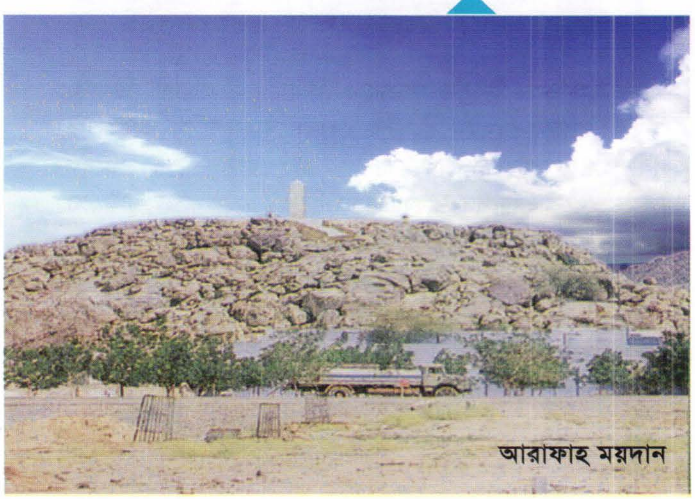
আরাফাহ ময়দান

মসজিদুল যুল হুলায়ফা

মসজিদুল যুল হুলায়ফা : যে স্থান থেকে হজ বা ওমরাকারীগণ ইহরাম বাঁধেন তাকে মিকাত বলে। এরকমের মিকাতের সংখ্যা ৭টি। মদীনাবাসী এবং এ পথে আগমনকারীদের জন্য মিকাত হলো যুল হুলায়ফা। এটি মসজিদে নববী হতে ১৪ কিমি পশ্চিমে একটি উপত্যকা। নবী করীম (সা) এখানে এসে গাছের ছায়ায় নেমে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে ইহরাম বাঁধতেন। পরে এখানে মসজিদুল শাজারা বা মসজিদুল যুল হুলায়ফা নামে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়।

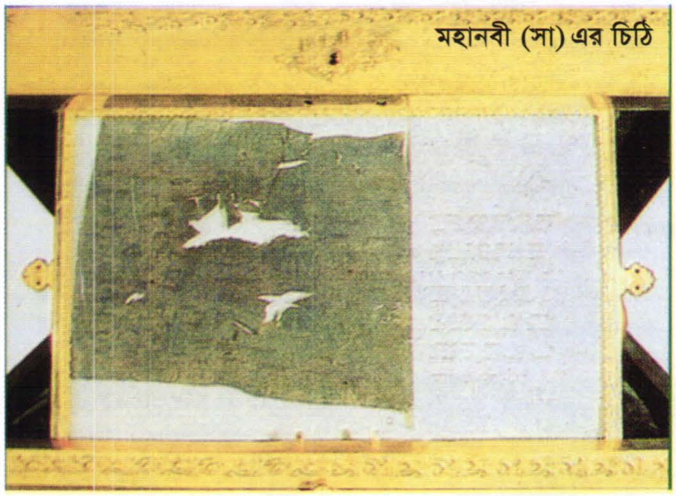
মহানবী (সা) এর চিঠি

মহানবী (সা) এর চিঠি : এটি মিশরের শাসনকর্তা মুক্তাকিসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাতলা চামড়ার ওপর লেখা একটি চিঠি। হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল (সা) বিভিন্ন দেশের শাসন কর্তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মোট ২০০ থেকে ২৫০টির মতো চিঠি লেখেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাসকগণ হলেন- ১) রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস (২) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ (৩) আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী (৪) মিশরের মুকাওকিস (৫) ইয়ামামার হাওদা বিন আলী ও সুনামা (৬) বোলকার হারিস গাস্‌সানী (৭) ওমানের জীফার ও আবদুল্লাহ (৮) ইনের মুনযির ইব্‌ন সাওয়ার (৯) ইয়ামেনের হারিছ বিন আবদে কিলাব।

www.pathagar.org

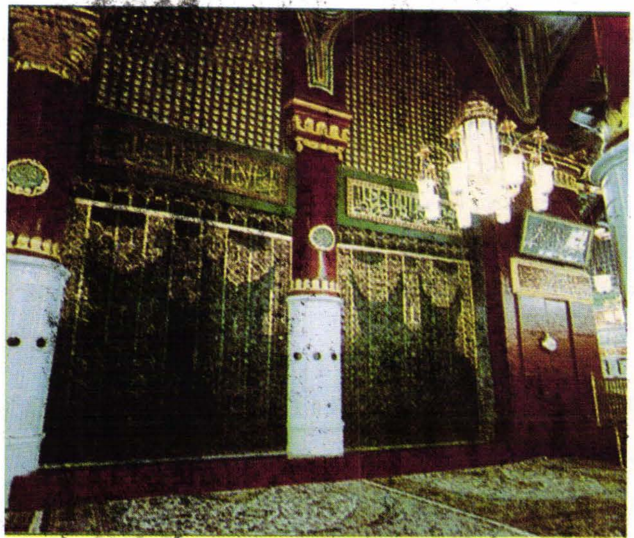

রওজা মুবারক

রওজা মুবারক : এখানে শায়িত আছেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার পরিপূর্ণ রূপ হজরত মুহাম্মদ (সা)। মৃত্যুকালেও তার সর্বশেষ বাণী ছিল 'সালাত, 'সালাত; তোমাদের অধিনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান'। তারপর তিনি 'হে আল্লাহ, হে আমার পরম বন্ধু' বলতে বলতে হজরত আয়েশা (রা) এর কামরায় ইন্তেকাল করেন। এ কামরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় কেউ ইমাম হননি, দশ জন করে সাহাবী হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে নামাজ পড়েন। এ রওজার পাশেই শায়িত আছেন হজরত আবু বকর ও উমর (রা)। ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দে সুড়ঙ্গ পথে রাসূলুল্লাহর লাশ অপহরণের খ্রিষ্টানদের অপচেষ্টা সুলতান নূরউদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে নস্যাৎ করেন। তখন তিনি রওজার চারপাশে পানির স্তর পর্যন্ত গভীর করে ধাতুর ঢালাইকৃত মজবুত দেয়াল তৈরি করেন এবং সমগ্র মদীনায় নিরাপত্তামূলক প্রাচীর নির্মাণ করেন।

জান্নাতুল বাকী : মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এ কবরস্থানে শায়িত আছেন রাসূলের (সা) প্রাণপ্রতীম দুহিতা ফাতেমা, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়া, জায়নাব, আয়েশা (রা) সহ পবিত্র সহধর্মিনীগণ, ইমাম হাসান, দুধ মা হালিমা, ৩য় খলিফা উসমানসহ প্রায় দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রা), ইমাম মালেক, জয়নুল আবেদীন, জাফর সাদিকের মত রাসূলের (সা) যুগশ্রেষ্ঠ অনুসারীগণ।

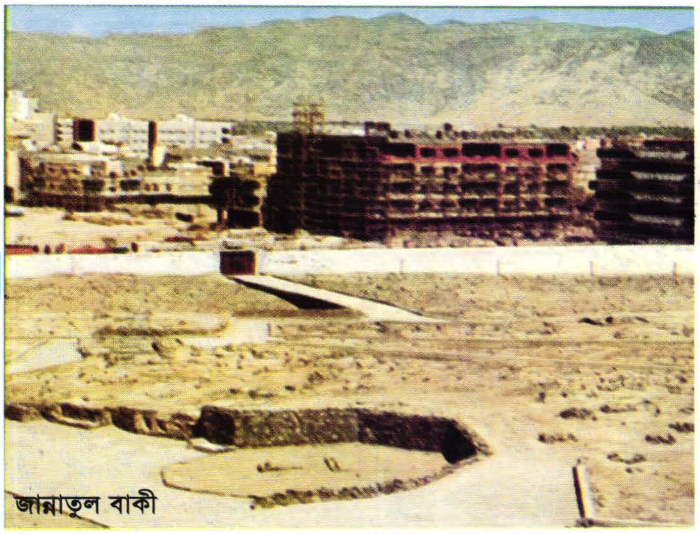

জান্নাতুল বাকী

রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের বুনিয়াদ-মদীনা সনদ ঃ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে রচিত এ সনদ পৃথিবীর ১ম লিখিত সংবিধান। এটি দু'অংশে বিভক্ত। ১ম অংশে ২৩টি ধারা- মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্যের বর্ণনা। ২য় অংশে ২৪টি ধারা- মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য মদীনাবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে স্পষ্ট বিধান বর্ণনা। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা হয়। এ সনদকে আধুনিক গবেষকগণ 'The first written constitution in the world' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সীমানা ঃ মহানবী (সা) এর ওফাতকালে সিরিয়া সীমান্ত থেকে এডেন এবং জেদ্দা থেকে ইরান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র আরব মসলিম দেশে পরিণত হয়।

প্রদেশ ও প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ ঃ ১। মদিনা: রাসূল (সা) স্বয়ং, ২। মক্কা: ইত্তাব ইব্‌ন উসাউদ, ৩। নাজরান: ক) আমর ইব্‌নে হাজাম খ) আলী ইব্‌নে আবি তালিব গ) আবু সুফিয়ান, ৪। ইয়েমেন: বায়ান ইব্‌নে সামান, ৫। হাজরা মাউত: যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ, ৬। আম্মান: আমর ইব্‌নুল আস, ৭। বাহারাইন: আলী ইব্‌ন হাজরাম, ৮। তাইমা: ইয়াজিদ, ৯। জুন্দে আজানাদ: মুয়াজ ইব্‌ন জাবাল (রা)। এদের ওয়ালী বলা হতো। এছাড়াও ২২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল, যার প্রধানকে আমির বলা হতো।

প্রশাসন ব্যবস্থা : প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাসূল (সা) যে সব কাজ নিজে আঞ্জাম দিতেন- (১) প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ (২) মুয়াযযিন নির্বাচন (৩) ইমাম নির্ধারণ (৪) যাকাত আদায়কারী নিয়োগ (৫) যিযিয়া আদায়কারী নিয়োগ (৬) ভিন্ন ধর্মের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর (৭) মুসলমানদের মধ্যে জমি বণ্টন (৮) সেনাপতি নিয়োগ (৯) মামলা মোকদ্দমা ফায়সালা করা (১০) গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা (১৩) নও মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা (১৪) ফতোয়া দান (১৫) অপরাধীর শাস্তি বিধান জারী (১৬) রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান (১৭) কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ও উন্নয়ন (১৮) গভর্নর ও ওয়ালি নিয়োগ।

www.pathagar.org

বিভাগ সমূহ : (১) রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ (২) সীলমোহর বিভাগ (৩) অহি লিখন বিভাগ (৪) পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ (৫) অভ্যর্থনা বিভাগ (৬) দাওয়াত ও শিক্ষা বিভাগ (৭) জাতি ও গোত্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বিভাগ (৮) প্রতিরক্ষা বিভাগ (৯) নিরাপত্তা বিভাগ (১০) জল্লাদ বিভাগ (১১) বিচার বিভাগ (১২) হিসাব সংরক্ষণ ও অর্থ বিভাগ (১৩) যাকাত ও সাদকাহ বিভাগ (১৪) জনস্বাস্থ্য বিভাগ (১৫) শিক্ষা বিভাগ (১৬) পরিসংখ্যান বিভাগ (১৭) কৃষি ও বন বিভাগ (১৮) নগর প্রশাসন বিভাগ (১৯) স্থানীয় সরকার বিভাগ।

মদীনার ভারপ্রাপ্ত আমীরগণ : রাসূল (সা) অনেক সময় মদীনার বাইরে বিভিন্ন অভিযান বা সফরের কারণে অবস্থান করতেন, তখন মদীনায় একজনকে দায়িত্বশীল নিয়োগ করে যেতেন। আমরা যাঁদের পরিচয় পেয়েছি- ১। সা'দ ইবনে উবাইদা: গাজওয়ায়ে আবওয়া (২য় হি) ২। সা'দ ইবনে মায়াজ: গাজওয়ায়ে বুয়াত (২য় হি) যায়েদ ইবনে হারিসা: গাজওয়ায়ে সাফওয়ান (২য় হি), বনি মুস্তালিক-২বার ৪। আবু সালমা আল মাখযুমি: যিল উশাইরা (২য় হি) ৫। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম: বদর (২য় হি), উহুদ (৩য় হি), হামরাউল আসাদ (৩য় হি), হুদাইবিয়া (৬ষ্ঠ হি), যিকারাদ-৫বার ৬। আবু লুবাবা: বদর বানু কাইনুকা, সার্ভিক (২য় হি)-৪বার ৭। উসমান: যি আমর ৮। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা: ২য় বদর ৯। ছাক ইবনে আরাফাতা গিফারী: খায়বর যুদ্ধ (৭ম হি) ১০। আবু রাহাম গিফারী: মক্কা বিজয় ১২। মুহাম্মদ ইবনে মুসাইলামা (রা): তাবুক।

অহি ও অহি লেখকবৃন্দ ঃ রাসূল (সা) এর কাছে অসংখ্যবার জিব্রাইল (আ) ওহি নিয়ে আগমন করেন। ২৩ বছরে ১১৪ সূরায় মোট ৬৬৬৬টি আয়াত নাজিল হয়। দু'ধরনের অহি নিয়ে আসতেন। প্রথমত সরাসরি আল্লাহর বাণী যা কুরআন হিসাবে নাজিল হয়েছে। দ্বিতীয়ত: যার ভাব ছিল আল্লাহর কিন্তু বক্তব্য এবং কাজ ছিল রাসূলের (সা)।

অহি লেখকবৃন্দ ঃ (১) যায়েদ বিন সাবিদ (২) আবু বকর (৩) ওমর (৪) উসমান (৫) আলী (৬) আমের বিন কাহিরা (৭) আমর ইব্নুল আ (৮) উবাই বিন কাব (৯) আবদুল্লাহ বিন আকরাম (১০) ছাবিদ বিন কায়েস (১১) হানযালা বিন রবী আজাদী (১২) মুগীরা বিন সোবা (১৩) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (১৪) খালিদ বিন ওয়ালীদ (১৫) খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (১৬) যুবায়ের (১৭) মুয়াবিয়া (রা)। বিভিন্ন সময় প্রায় ৪০ জন সাহাবী অহি লিপিবদ্ধ করেন।

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। *সূরা আম্বিয়া : ১০৭*

www.pathagar.org

সীরাতে রাসূল (সা): জিহাদ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (সা) এর অভিযান ও যুদ্ধসমূহ

যে সব অভিযানে রাসূল (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেন (যুদ্ধ হোক বা না হোক) তাকে গাযওয়া বলে এবং যে সব অভিযানে (যুদ্ধ হোক বা না হোক) তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি, বরং অন্য কোন সাহাবীর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন তাকে ছারিয়া বলে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর গাযওয়াসমূহ

সাল	মুজাহিদ	স্থান/গোত্র
২ হি, সফর	৬০	আবওয়া
" রবি-আউ	২০০	বুওয়াত
" রবি-আউ	২০০	সাফওয়ান
" রবি-সানি	১৫০-২০০	আল উশায়রাহ
" রমজান	৩১৩	বদর/কুরাইস
" শাওয়াল	-	কায়নুকা/ইহুদি
" জিলহজ	২০০-৪০০	সাকীব/কুরাইশ
৩ হি,মহররম	২০০	কুদর/গাতফান
" রবি-আউ	৪৫০	যু আমর, মুহারিব
" জমা-আউ	৩০০	বুহরান/সুলায়মান
" শাওয়াল	৭০০	উহুদ/কুরাইশ
" শাওয়াল	৬২৩/৯০০	হামরাউল আসাদ
৪ হি,রবি-আউ	১০০০	বনী নাযীর/ইহুদি
" জিলক্বদ	১৫০০	২য় বদর/কুরাইশ
৫ হি, সফর	৪০০-৮০০	জাতুররিকা/আম্মার
" রবি-আউ	১০০০	দুমাতুল জান্দাল
" শাবান	-	মুরায়সী/মুস্তালিক
" জিলক্বদ	৩০০০	খন্দক/মিত্র বাহিনী
" জিলহজ	৩০০০	কুরায়যাহ/ইহুদি
৬ হি, রবি-আউ	২০০	উসফান/লিহয়ান
" রবি-সানি	৫০০	যু-কারাদ/গাতফান
" জিলক্বদ	১৪০০	হুদাইবিয়া/কুরাইশ
৭ হি, মহররম	১৪০০	খাইবার/ইহুদি
" শাওয়াল	২০০০	উমরাতুল কাযা
৮ হি, রমজান	১০০০০	মক্কা জয়/কুরাইশ
" শাওয়াল	১২০০০	হুনায়ন/হাওয়াযিন
" শাওয়াল	১২০০০	তায়েফ/সাকীফ
৯ হি, রজব	৩০০০০	তাবুক/রোমান-মিত্র

বৃহৎ যুদ্ধসমূহ

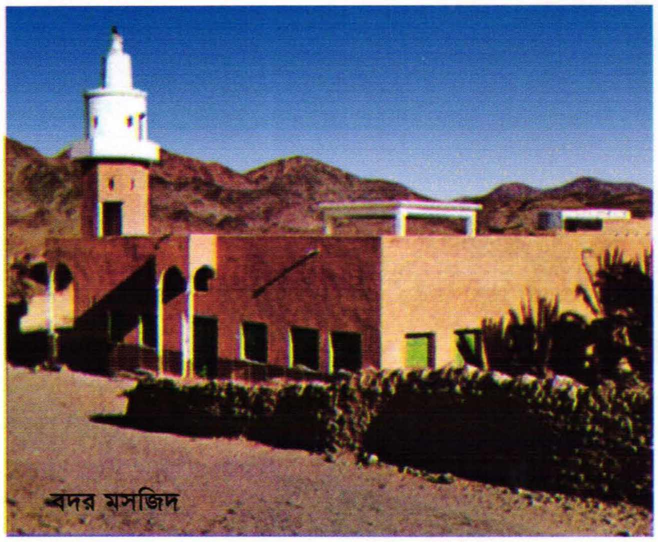

বদর মসজিদ

বদর শহীদদের স্মৃতিসৌধ : আনসারদের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ইবনে মা'আয (রা)। মুজাহিদের নেতৃত্বে ছিলেন আলী (রা)। ফলাফল: কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়। আবু জেহেল, উতবা, শাইবা, উমাইয়াসহ তাদের ৭০ জন নিহত, ৭০ জন বন্দী হয়। ১৪ জন মুসলিম শহীদ হন (৬ মুহাজির, ৮ আনসার)।

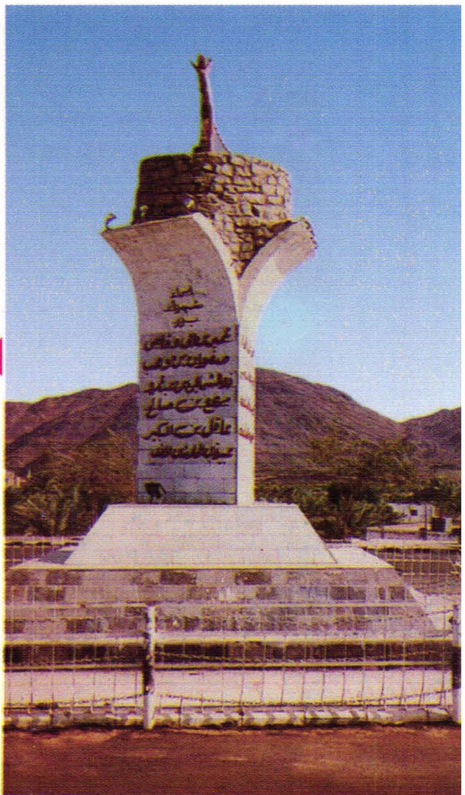

নাম লিপিবদ্ধ বদর শহীদদের স্মৃতিসৌধ। বদর কূপকে ঘিরে এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। এ কূপের নামানুসারে স্থানটির নাম বদর। স্মৃতিসৌধের শীর্ষে কূপটির মুখ দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.org

বদর

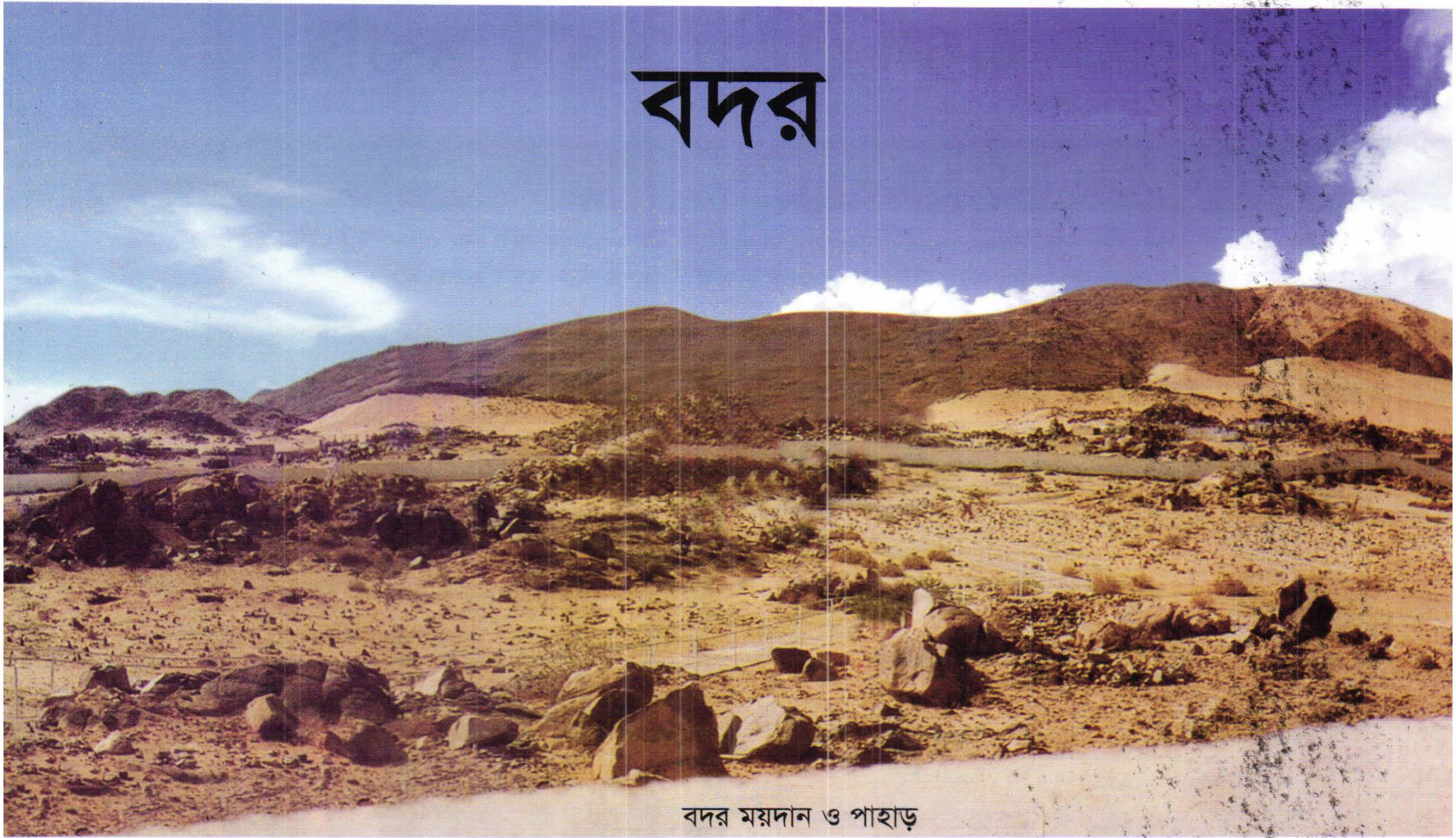

বদর ময়দান ও পাহাড়

বদর যুদ্ধ ঃ ২য় হিজরির ১৭ রমজান, ৬২৪ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি; মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে; মুসলিম সৈন্য: ৩১৩ জন (৮৩ মুহাজির, ২৩০ আনসার তন্মধ্যে ৭০ খাজরাজ, ৬১ আওস গোত্রের), কুরাইশ সৈন্য: ১০০০ জন (৭০০ উষ্ট্রারোহী, ৩০০ আশ্বারোহী); ঘটনা: আবু সুফিয়ানের কাফেলা আক্রান্তের মিথ্যা অপপ্রচারে উত্তেজিত হয়ে আবু জেহেল ১০০০ সৈন্য নিয়ে বদর প্রান্তে অবস্থান করলে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়; পতাকা বহন করেন মুসআব ইবনে উমাইর আবাদী (রা)।

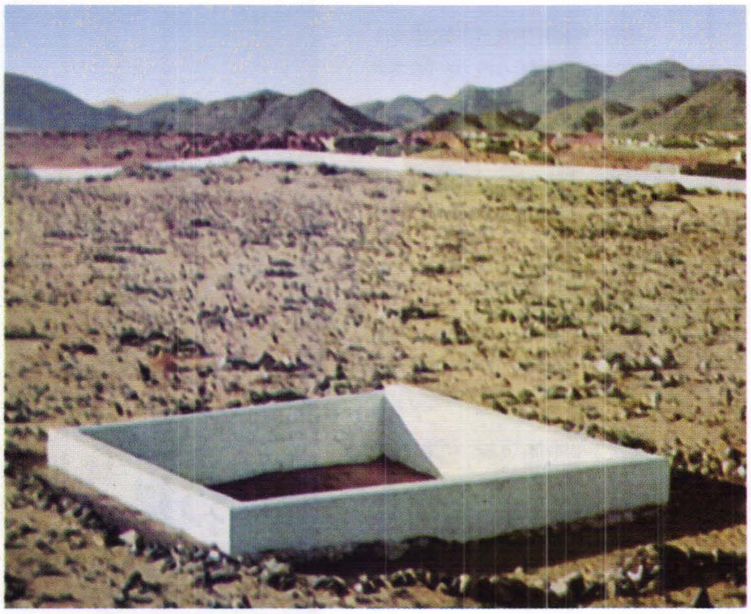

বদর শহীদদের কবর

উহুদ যুদ্ধ

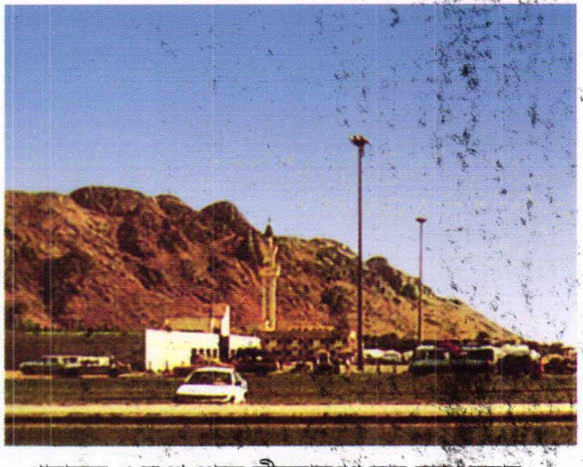

পাহাড়ের এ অংশ থেকে তীরন্দাজগণ স্থান ত্যাগ করায় উহুদ যুদ্ধে দৃশ্যত মুসলমানদের পরাজয় হয়। সাথে শহীদদের কবর ও মসজিদ দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.org

উহুদের যুদ্ধ ঃ মদীনার ৫ মাইল উত্তরে উহুদ উপত্যকায় ৬২৫ খি: ২৩ মার্চ/৩ হিজরি ৭ শাওয়াল- বদর যুদ্ধে পরাজয় ও অবমাননা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়। তখন রাসূল (সা) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। প্রথমে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও পরবর্তীতে কৌশলগত স্থান ত্যাগ করার কারণে সাময়িক বিপর্যয় ঘটে। ফলে যুদ্ধটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এতে ৭০ জন মুসলমান শহীদ এবং ৩৭ জন কাফের নিহত হয়।

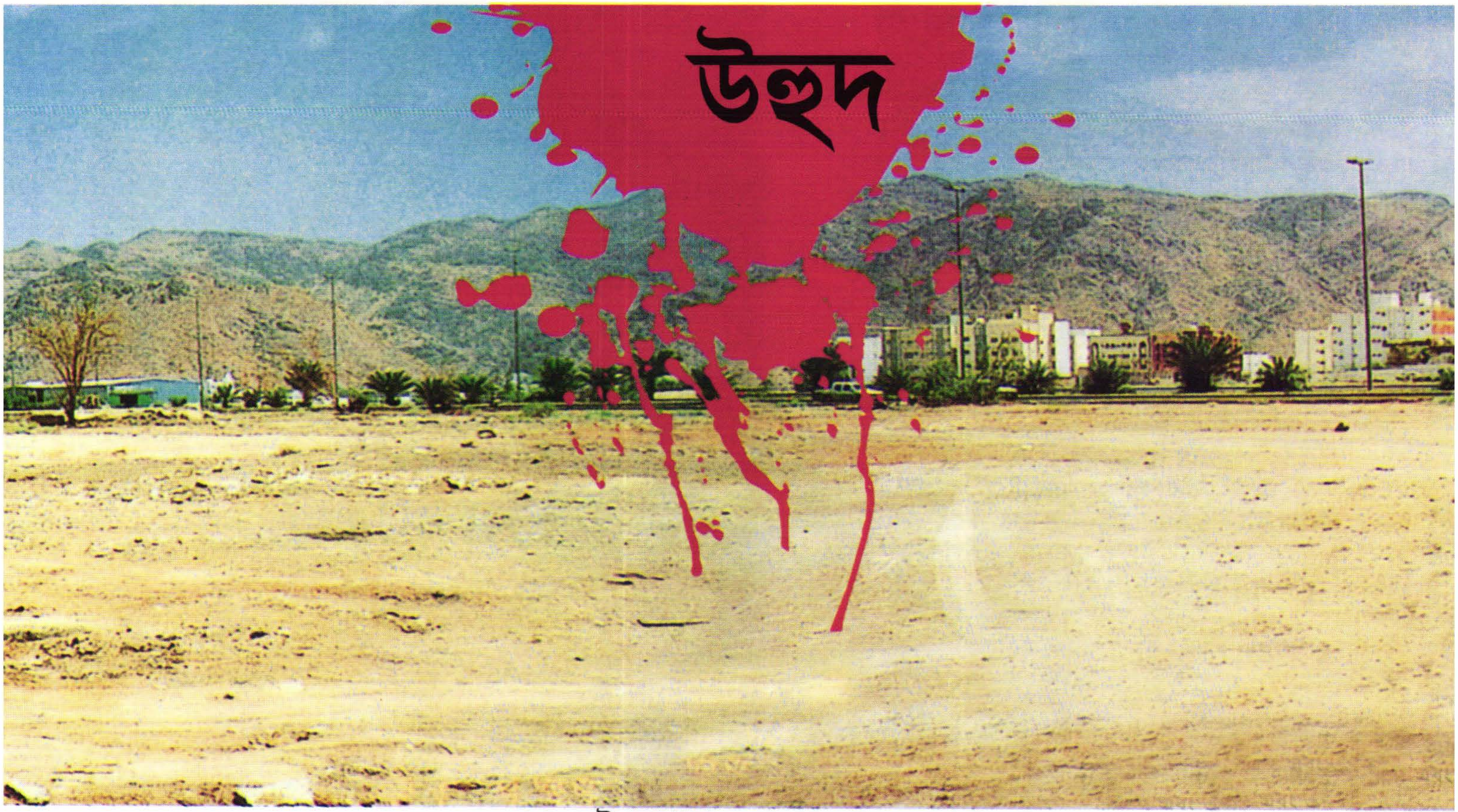

উহুদ পাহাড়

এই গুহায় রাসূল (সা) আহত হয়ে অবস্থান নেন

এখানেই সংঘটিত হয়েছিল উহুদের যুদ্ধ, যেখানে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন।

www.pathagar.org

খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব যুদ্ধ) ঃ মুসলমানদের নির্মূলের জন্য ইহুদি গোত্র বনু নাযিরের নেতৃবৃন্দ কুরাইশ বানুগাতফানসহ মক্কার আশেপাশের সকল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে। সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা) হজরত সালমান ফারসী (রা) এর পরামর্শে ৩ হাজার মুজাহিদ নিয়ে ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে কনকনে শীত ও ক্ষুধা- তৃষ্ণা উপেক্ষা করে অক্লান্ত পরিশ্রমে ১০ হাত গভীর, ৭-১০ হাত প্রস্থ,২৫০০ গজ দীর্ঘ পরিখা মদীনার উত্তর দিকে খনন করেন, বাকি তিন দিক ছিল পাহাড় ও খেজুর গাছে ঘেরা। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেররা ১০ হাজার পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এসে পরিখা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং ২৭ দিন অবরোধ শেষে ঝড়-বৃষ্টিতে পর্যুদস্ত হয়ে ২৩ জিলক্বদ পলায়ন করে। এতে বিক্ষিপ্ত হামলায় ৭ জন মুসলমান ও ১০ জন মুশরিক নিহত হয়।

খন্দকের রাস্তা ঃ এ রাস্তাটি এক সময় পরিখা ছিল। যা খন্দকের যুদ্ধের সময় খনন করা হয়। এর বামে ইহুদি, কুরাইশ, গাতফানদের সম্মিলিত বাহিনী ছিল; ডানে ছিল মুসলিম বহিনী। মুসলিম বাহিনীর উত্তর দিকে পরিখা, অপর তিন দিক পাহাড় ও খেজুর বাগানে ঘেরা ছিল।

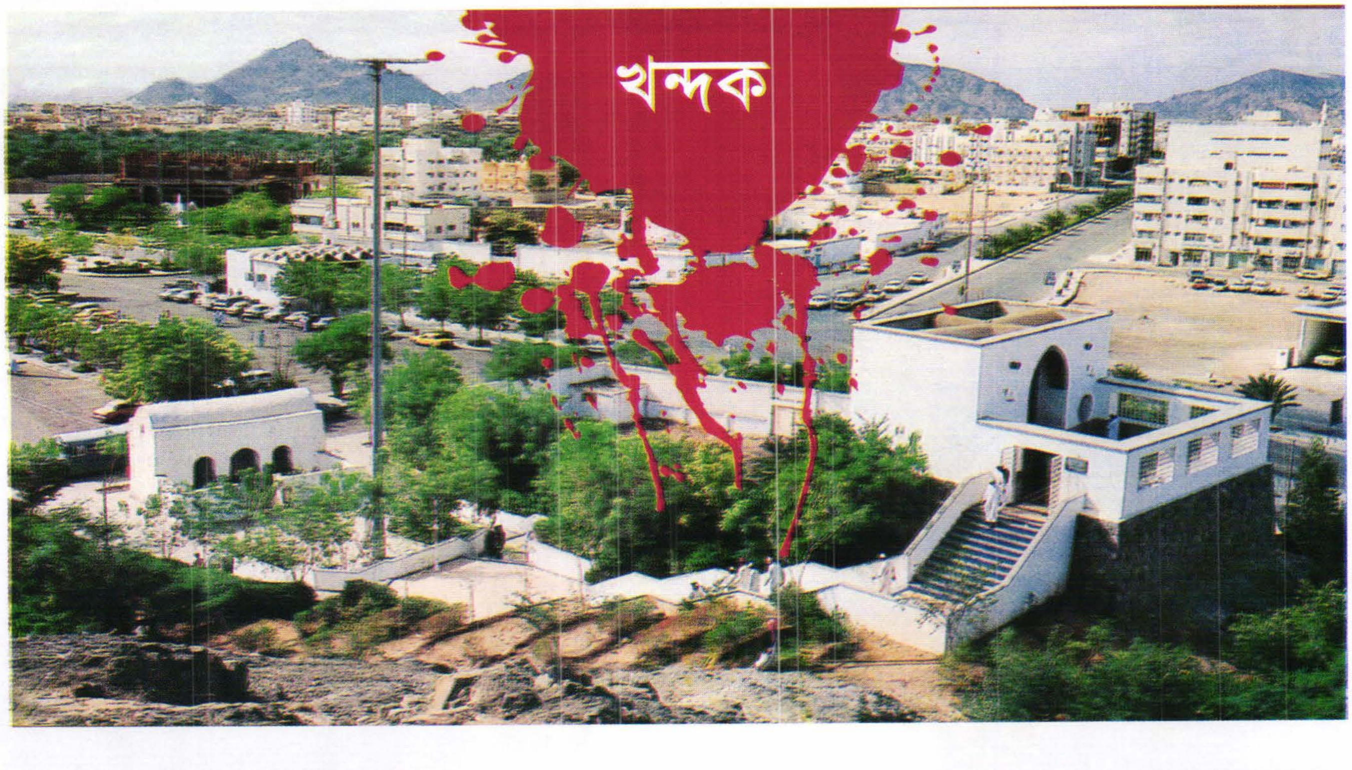

www.pathagar.org

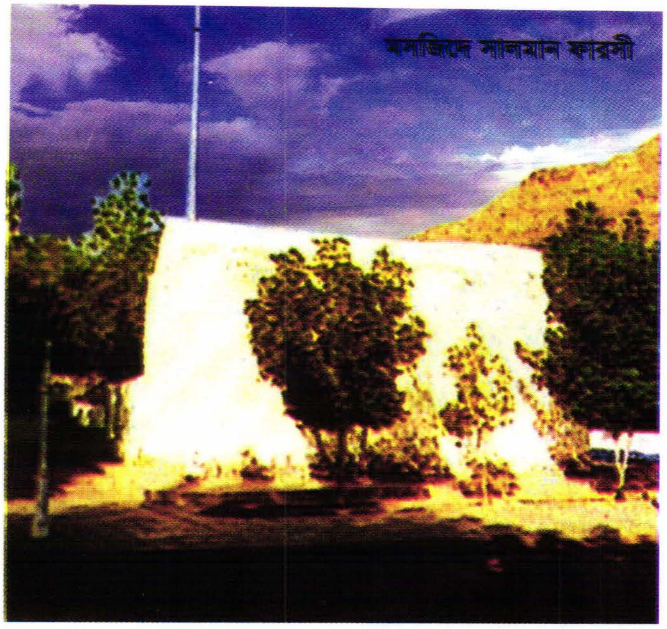

মসজিদে সালমান ফারসী ঃ খন্দক যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যে ৫টি মসজিদ (মসজিদুল ফাতাহ, সালমান ফারসী, উমর, ফাতেমা, আলী) তৈরি হয়, সেগুলি দেখা যাচ্ছে।

মসজিদুল ফাত্হ ঃ যেখানে সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্তের জন্য দোয়া করেছিলেন রাসূল (সা)। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ঃ স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে রাসূল (সা) ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১৪০০ সাহাবী নিয়ে হজে রওয়ানা হলে কুরাইশরা বাধা দিলে এ স্থানে (বর্তমানে সুমাইছি) তাঁবু গাড়েন। শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং দূত হত্যার গুজব ছড়ালে সাহাবীগণ বাবলা গাছের নিচে জিহাদের শপথ নেন। এতে ভীত হয়ে কুরাইশরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

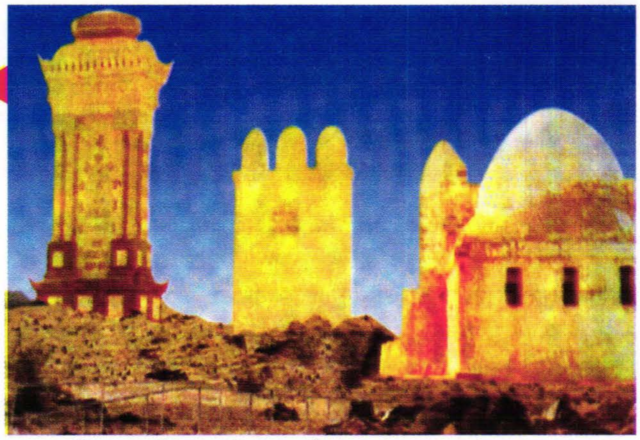

হুদায়বিয়ার সন্দি ও বাইয়াতে রিদওয়ান স্থল

খাইবারের যুদ্ধ ঃ মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত খাইবার এলাকাটি ইহুদিদের নিরাপদ ঘাঁটি ছিল। মদিনা থেকে উচ্ছেদকৃত ইহুদি গোত্রগুলো আশ্রয় নেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবধরনের ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়। তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য ৭ম হিজরির মহররম মাসে মহানবী (সা) ১৪০০ সাহাবী নিয়ে তাদের অবরোধ করেন। তারা ৬টি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং যুদ্ধে পরাজয়ের বশ্যতা স্বীকারের সন্ধিতে এর নিষ্পত্তি ঘটে।

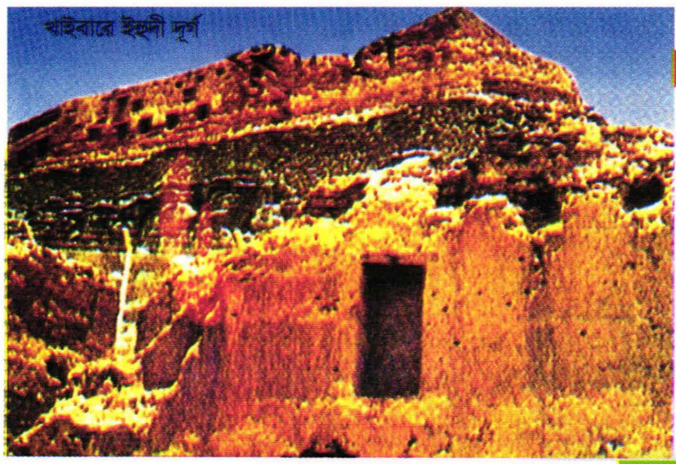

খাইবারে ইহুদি দুর্গ ঃ ইহুদিদের একটি দুর্গ। ৭ম হিজরিতে খাইবার অভিযানে এ দুর্গটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ অভিযানে ইহুদিরা সালেম, তামুস, নাতাত, কাসারাহ, শিক ও মূলবাহাত নামক ৬টি দুর্গে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধে এরা পরাজিত হয়ে সন্ধি করে।

www.pathagar.org

মুতার যুদ্ধ ঃ রাসূল (সা)এর বিশেষ দূত হারিস ইবনে মায়েরকে হত্যা করলে জর্দানের নিকটবর্তী মুতা নামক স্থানে জাফর বিন আবু তালিব (রা) এর নেতৃত্বে ৩ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অন্যদিকে এক লক্ষ রোমান বাহিনী মুসলমানদের বিপরীতে যুদ্ধ করে। প্রথম তিন দিন মুসলমানদের পর পর তিন সেনাপতি ১) জাফর বিন আবি তালিব ২) জায়েদ বিন হারেসা ৩) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শহীদ হওয়ার পর খালিদ বিন ওয়ালিদের চমৎকার রণকৌশলে মুসলমানরা এ অসম যুদ্ধে জয়লাভ করে। বিশেষ বীরত্বের কারণে রাসূল (সা) খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহা বিজয় ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ ও প্রত্যাখ্যান করলে ৮ম হিজরির ১০ রমজান ১০ হাজার সাহাবী নিয়ে মহানবী (সা) মক্কার দিকে রওয়ানা হন। রক্তপাত এড়াতে গোপনীয়তার সাথে ২১ রমজান মক্কার উপকণ্ঠে উপনীত হলে কুরাইশরা হতবিহবল হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ২১ বছরের নির্যাতন -নিষ্পেষণের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েও রাসূল (সা) সবাইকে ক্ষমা করে দেন, এতে কাফেররা অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদিনই কাবাসহ মক্কার সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করা হয়। বিনা রক্তপাতে মক্কা মুসলমানদের নিকট বিজিত হয়।

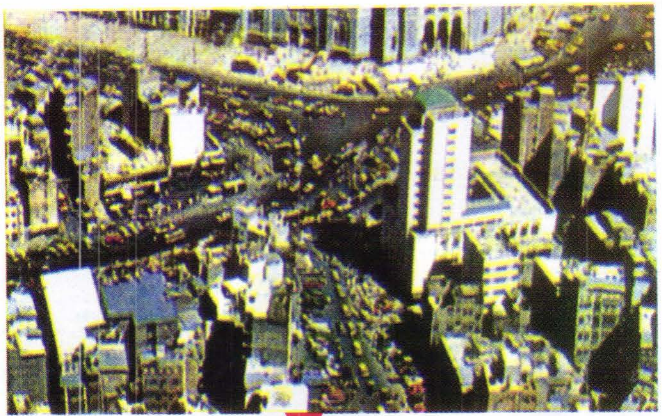

তারিকা হাজুন

তারিকা হাজুন ঃ রাসূল (সা)এর মক্কা বিজয়ের প্রবেশপথ। সে সময় মক্কা প্রবেশের ২টি পথের মধ্যে কুদা পাহাড়ের উচ্চভূমির এ পথ দিয়ে প্রবেশ করে হাজুন নামক স্থানে তিনি বিজয়ের পতাকা স্থাপন করেন। নিম্নভূমির অপর পথ দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন।

হুনাইন যুদ্ধের মাঠের একাংশ

হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ ঃ কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে মক্কার নিকটবর্তী হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। কাল বিলম্ব না করে রাসূল (সা) ১২ হাজার মুজাহিদ নিয়ে অষ্টম হিজরির ১০ শাওয়াল হুনাইনের দিকে অগ্রসর হন। শত্রুর আক্রমণে মুসলমানদের প্রাথমিক বিপর্যয় দেখা দিলেও রাসূল (সা) এর দৃঢ় নেতৃত্ব পাল্টা আক্রমণ করলে তাদের পরাজয় ঘটে। এতে ৬ হাজার লোক বন্দী এবং বাকিরা তায়েফে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী সেখানেও অগ্রসর হলে এরা দুর্গে আশ্রয় নেয়। দীর্ঘ এক মাস অবরোধের পর তা প্রত্যাহার করে। পরবর্তীতে এদের একদল মুসলমান হয়ে যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেয়ার অনুরোধ করলে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরের বছর এদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।

তাবুক যুদ্ধ ঃ তৎকালীন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নবউত্থিত ইসলামী শক্তিকে অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য সিরিয়া সীমান্তবর্তী আরব গোত্রসমূহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দিয়ে নিজে ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়। পূর্বেই রাসূল (সা) ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম, খাদ্যাভাব এবং বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মত প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব। রাসূল (সা) এর আহবানে সাহাবীদের নজিরবিহীন সহযোগিতা ছিল ইতিহাসখ্যাত, তারপরও তা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এ অবস্থায় রাসূল (সা) ৩০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে মাদায়েনে সালেহ এলাকার তাবুকে ঘাঁটি স্থাপন করেন। পূর্বের তথ্য ও ধারণার চেয়ে বিশাল বাহিনী এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা) কে উপস্থিত দেখে রোমান বাহিনী ভীত হয়ে পিছুটান দেয়। ফলে আশেপাশের সকল আরব গোত্র মুসলিম আধিপত্য মেনে নিয়ে অধিকাংশই মুসলিম হয়, বাকিরা জিজিয়া দেয়া শুরু করে।

তাবুক মসজিদ

ছারিয়া অভিযানের অধিনায়কগণঃ

সর্বপ্রথম অভিযান প্রেরণ করা হয় হজরত হামযা (রা)এর নেতৃত্বে ১ম হিজরির রমজান মাসে এবং সর্বশেষ অভিযান প্রেরিত হয় রাসূল (সা)এর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে একাদশ হিজরির রবিউসসানিতে। রাসূল (সা) মোট ৭৪টি অভিযান ৪৯ জন সেনানায়কের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে যায়েদ বিন হারিসা ৯ বার, গালিব বিন আবদুল্লাহ ও খালিদ বিন ওয়ালিদ ৪ বার, মুহাম্মদ বিন মাসালামা ও আলী আবু তালিব ৩ বার করে নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য বিখ্যাত অধিনায়কগণ হলেন আমর বিন আউফ, আমর ইবনুল আস, উসামা বিন যায়েদ, আলক্বামা, খালিদ বিন সায়িদ, বশীর ইবন সা'দ।

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহর (সা) জিহাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ

জিহাদ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

১। মোট যুদ্ধ ও অভিযান ঃ ১০২। নিজ পরিচালনায় গাযওয়া: ২৮টি (বড় ৯টি, ছোট ১৯টি) প্রতিনিধির মাধ্যমে (ছারিয়া): ৭৪।

২। অভিযানকাল ঃ ১ম হি: ৩টি (ছারিয়া)। ২য় হি: ১০টি (গাযওয়া-৭, ছারিয়া-৩)। ৩য় হি: ৭টি (গাযওয়া-৫, ছারিয়া-২)। ৪র্থ হি: ৭টি (গাযওয়া-২, ছারিয়া-৫)। ৫ম হি:৬টি (গাযওয়া-৩, ছারিয়া-১৪)। ৭ম হি:১৪টি (গাযওয়া-২, ছারিয়া-১২)। ৮ম হি: ১৩টি (গাযওয়া-৩, ছারিয়া-১০)। ৯ম হি: ১৩টি (গাযওয়া-১, ছারিয়া-১০)। ১০ম হি: ১২টি (ছারিয়া-১২)।

৩। নিহত শত্রু ঃ ৭৫৯ জন; বন্দি: ৬৫৬৪ জন। **৪। শহীদ:** ২৫৯ জন। আহত: ১২৭ জন। মুসলিম বন্দি: ১ জন।

৫। প্রতিপক্ষ: মক্কার কুরাইশ ও মিত্র বাহিনী, হাওয়াজিন, সাকীফ, ইহুদি গোত্রত্রয় (কাইনুকা নাযীর ও কুরাইয়া), রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, মদিনার মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবায়ের দল প্রমুখ।

জিহাদের অনুমতিঃ হিজরাতের পর প্রতি মুহূর্তেই কুরাইশদের হুমকির মুখে ছিল মদিনার মুসলমানগণ। বাণিজ্য পথে মদিনা হওয়ায় কুরাইশরাও মুসলমানদের চরম হুমকি মনে করত। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য এরা বিভিন্নমুখী তৎপরতা চালাতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে হিজরতের ৬ মাস পর রাসূল (সা)কে জিহাদের অনুমতি দিয়ে অহি নাযিল হয়- 'যারা অত্যাচারিত হয়ে আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম'। (সূরা হজ: ৩৯)

রাসুল (সা) এর যুদ্ধনীতি ঃ রক্তপাত ঘটানো রাসূল (সা) এর জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি একান্ত বাধ্য হয়েই সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন। তিনি কখনও প্রথম আক্রমণ করেননি। শান্তি কামনাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মক্কা বিজয়ে যাতে কোন ধরনের সংঘর্ষ না ঘটে এজন্য সম্পূর্ণ গোপনে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর যুদ্ধনীতিগুলো ছিল- সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতার গুরুত্ব দেয়া। ব্যভিচার ও লুটতরাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করা। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ গরিবের জন্য রক্ষিত থাকত। যুদ্ধ ছিল মাত্র আত্মরক্ষার্থে। প্রথম আক্রমণ ছিল নিষিদ্ধ। যুদ্ধ হতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য। আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য আল্লাহু আকবর ছাড়া আর কোন রণ হুঙ্কার নিষিদ্ধ ছিল। বিপরীত পক্ষে জয়ে দুর্বল অসহায় লোক ও অসামরিক লোকদের উপর আঘাত এবং পরিবেশ প্রতিবেশের জন্য হুমকি এমন ধ্বংসাত্মক কাজ নিষিদ্ধ ছিল। দূতকে হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। আত্মসমর্পণ করলে শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হতো। যুদ্ধ চলাকালিন সময় শান্তি প্রস্তাব আসলে তা গ্রহণ করা হতো, চুক্তি ভঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত শত্রুদের কবর দেয়া এবং তাদের অঙ্গহানী ও অসম্মান নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হতো।

রাসূল (সা)এর ব্যবহৃত যুদ্ধোপকরণ ঃ ৯টি তরবারি, তন্মধ্যে জুলফিকার ছিল বিখ্যাত, যা পরবর্তীকালে আলী (রা) ব্যবহার করতেন। ৭টি বর্ম। ৬টি বর্শা। রূপার বাঁধানো একটি কোমরবন্দ। ৩টি ঢাল। ৫টি নেযা। ২টি শিরস্ত্রাণ। ৩টি লাঠি, তন্মধ্যে বিখ্যাত মামসূক লাঠিটি চার খলিফাই ব্যবহার করেছেন। ৭টি ঘোড়ার নাম জানা যায়। ৪৫টি উট।

পথপ্রদর্শক (দালীল) ঃ মরুভূমিতে কোন রাস্তাঘাট না থাকায় পথ চেনা খুব কঠিন ছিল। তাই নিরাপদ গমন ও শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তায় গন্তব্যে পৌঁছার জন্য রাসূল (সা) প্রায় সব অভিযানে পেশাগত পথপ্রদর্শক ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে ১৪ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- আবদুল্লাহ ইবন উরায়কি (হিজরত), আবু হামজা (উহুদ), মাযকুর (বনু মুস্তালিক), আমর (হুদায়বিয়া), আলকামা (তাবুক)।

গুপ্তচর (উয়ুন) ঃ মহানবী (সা) প্রায় সকল অভিযানেই গুপ্তচরদের কাজে লাগিয়েছেন। তারা শত্রুদের সামরিক ও সংখ্যাগত শক্তি, তাদের কার্যব্যবস্থা, পরিকল্পনা, গমনপথ, ঘটনাস্থলের মানচিত্র প্রণয়নসহ শত্রু বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করত। যতদূর জানা যায় বদরযুদ্ধে প্রথম গুপ্তচর ব্যবহার করা হয়। বদরযুদ্ধে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, সাঈদ বিন যায়েদ, জুহায়নাহ আদী, আম্মার বিন ইয়াসির, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ; ইহুদ যুদ্ধে আনাস, মুনসী, হুবার ইবনুল মুনিব, আলী বিন আবু তালিব; খন্দক যুদ্ধে খাওয়াত ইবনে জুবায়ের, জুবায়ের ইবনে আওয়াম। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে বুশর ইবনে সুফিয়ান, হুনাইনের যুদ্ধে আঃ ইবনে আবি হাদরাদুল আসলামীসহ বিভিন্ন অভিযানের ১৬ জন গুপ্তচরের নাম জানা যায়।

পাতাকা বহন ঃ পতাকা বহন আরব সামরিক ঐতিহ্যের একটি অংশ ছিল। বিভিন্ন গোত্র আলাদা আলাদা পতাকা বহন করত, যাতে সেনানায়ক পতাকার তলে অবস্থান করতে পারে। রাসূল (সা) এ ঐতিহ্য বহাল রাখেন। ছারিয়াতে সাধারণত একজন পতাকাবাহক থাকলেও গাযওয়াতে কয়েকজন থাকতেন। ক্ষুদ্র গাযওয়াতে মুহাজির, খাযরাজ ও আউস গোত্র থেকে ৩ জন পতাকাবাহক থাকলেও বড় অভিযানগুলোতে যেমন, মক্কা বিজয়, তাবুক অভিযান সকল গোত্র ও তাদের বিশিষ্ট শাখাসমূহে নিজস্ব পতাকা বহন করে।

তালিয়াহ/স্কাউট/গোপন পর্যবেক্ষক দল ঃ তালিয়াহ ছিল রাসূল (সা) এর পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ক্ষুদ্র সেনাদল। ৩ থেকে ২০ জনের গঠিত তালিয়ার কাজ ছিল প্রকাশ্য এবং গুপ্তচরেরা গোপনে। তালিয়াদেরকে সেনাবাহিনীর পূর্বেই শত্রু বাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হতো। বদর যুদ্ধে মুবাইর ইবন আওয়াম, আলী (রা); উহুদ যুদ্ধে মালিক ও নুমান; হুদায়বিয়া ও খাইবার যুদ্ধে আব্বাদ বিন বিশর (রা) এর নেতৃত্বে তালিযাহ প্রেরণ করা হয়। আধুনিক স্কাউটের ধারণা এই তালিয়াহ থেকে উদ্ভব।

দেহরক্ষী ঃ সেনানায়ক হিসেবে রাসূল (সা) এর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী যারা ছিলেন- আব্বাদ ইবন বিশর (প্রধান), আম্মার ইবন ইয়াসির, বেলাল ইবনে রিবা, সা'দ ইবন মুয়ায, সাদ ইবন উবাদাহ (রা) প্রমুখ। মূলতঃ রাসূল (সা) এর নিরাপত্তায় সকল মুসলমান বিশেষ করে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সন্ধি-সনদ-চুক্তিঃ রাসূল (সা)এর যুগের চুক্তি-সন্ধিগুলো সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির। এগুলো চারটি যুগে বিভক্ত। ১ম যুগ: বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত। কুরাইশরা যুদ্ধ ঘোষণা করলে মহানবী (সা) নবীন রাষ্ট্রটির নিরাপত্তাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় গোত্রের সাথে বন্ধুত্বমূলক মৈত্রী বা নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার জন্য চুক্তি করেন। ২য় যুগ: হুদায়বিয়ার সন্ধি-যার মাধ্যমে মদিনার রাষ্ট্র আরবের মধ্যে একক শক্তিতে পরিণত হয়। ৩য় যুগ: হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সময়কালে। এ যুগের চুক্তিগুলো ছিল মুসলমানদের পক্ষ থেকে পরাজিত সম্প্রদায়কে সুযোগ বা নিরাপত্তা দান। ৪র্থ যুগ: মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরব ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলো তখন পরাজিত গোত্র জিজিয়ার বিনিময়ে স্বীয় ধর্মে থাকার অধিকার লাভের চুক্তি করত।

www.pathagar.org

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৮০-৪১৫খ্রি: | শশাঙ্ক ৫৯৮-৬৪১খ্রি: | হুসাম উদ্দিন ১২০৮-১০ ও ১২১২-২৭খ্রি: | আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ ১২৪২-৪৬খ্রি: | নাসিরউদ্দিন বোগরা খান ১২৮৭-৯১খ্রি: | রোকনউদ্দিন কায়কাউস ১২৯১-১৩০২খ্রি: | শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৩০২-২৪খ্রি: | ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮-৫৭খ্রি: | শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২-৫৭খ্রি: | সিকান্দার শাহ ১৩৫৭-৯৩খ্রি: | গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ১৩৯৩-১৪১১খ্রি:

শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ ১৪১২-১৩খ্রি: | জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ ১৪১৮-৩১খ্রি: | শাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪৮৭-৯০খ্রি: | শামসুদ্দিন মোফাজ্জর শাহ ১৪৯১-৯৩খ্রি: | আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯খ্রি: | শের শাহ শূর ১৫৩৮-৪৫খ্রি: | ইসলাম শাহ শূর ১৫৪৫-৫৩খ্রি: | দাউদ খান কররাণী ১৫৭২-৭৫খ্রি: | নূরউদ্দিন মোঃ জাহাঙ্গীর ১৬০৫-২৬খ্রি: | সম্রাট শাহজাহান ১৬২৬-৫৭খ্রি: | সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৫৭-১৭০৭খ্রি:

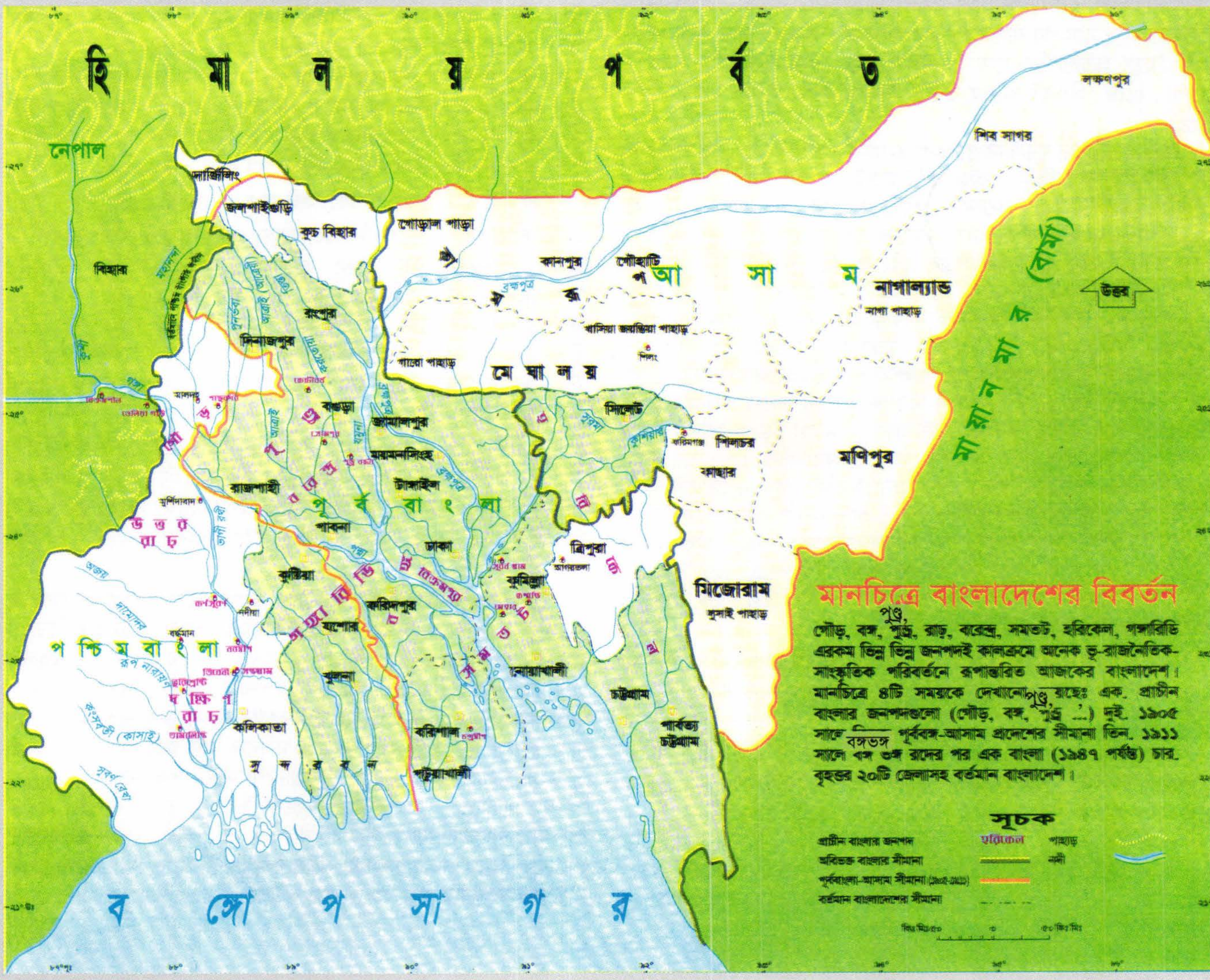

www.pathagar.org

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বিশ্বে জনসংখ্যার ঘনত্বে ২য় জনসংখ্যার পরিমাণে ৯ম, আয়তনে ৯০তম দেশ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জীবন্ত ব-দ্বীপ। ৬টি বিভাগ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট), ৬৪টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা, ৫২৫টি পুলিশ থানা, ২২৯টি পৌরসভা, ৪৪৫১টি ইউনিয়ন, ৫৮৯৫০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গ কিমি। মোট সীমানা ঃ ৫১৩৮ কিমি [স্থল ঃ ৪৪২৭ কিমি (ভারতের সাথে ৪১৫৬ কিমি, মায়ানমারের সাথে ২৭১ কিমি), জল ঃ ৭১১ কিমি] সমুদ্র সীমা ঃ ১২ নটিক্যার মাইল (আঞ্চলিক), ২০০ নটিক্যাল মাইল (অর্থনৈতিক)। সংসদীয় সরকার। ৩৯টি মন্ত্রণালয়।

www.pathagar.org

বিশাল পললভূমির বাংলাদেশ। যেভাবে পললভূমি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তেমনি বাংলাদেশের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তা তৈরি হয়েছে বহু সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি এর অধিবাসীদের চরিত্র ও জীবন দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। এরা পরিণত হয়েছে কষ্ট-সহিষ্ণু সাহসী ও সংগ্রামী মানুষে। বেড়ে উঠেছে স্বাধীনতার অদম্য প্রেরণা নিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর্য-নিষ্পেষিত মানবগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছিল এ জনপদকে। আবার তারাই ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটরদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে বিরামহীনভাবে। পাকিস্তান সৃষ্টির অগ্রসেনানী এদেশবাসীরাই পাকিস্তানী অন্যায়-অবিচারের নিকট মাথা নত না করে লড়াই করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করা সত্ত্বেও এদেশের জনগণ ভারতীয় আগ্রাসনকে প্রশ্রয় না দিয়ে বার বার প্রতিহত করেছে, নস্যাৎ করে দিয়েছে তাদের সকল আগ্রাসী ষড়যন্ত্রকে। এই হলো বাংলাদেশ ও এ অধিবাসীদের চিরকালীন পরিচয়।

জাতিসত্তার ভিত্তি ঃ বহু বিচিত্র রক্তের সংমিশ্রণে একটি সঙ্কর জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশীরা। আদি সেমিটিক দ্রাবিড় রক্তের সাথে মিশেছে অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলীয়, আর্য রক্তের ধারা নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় বিশেষ কাউকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও এখানকার গরিষ্ঠ মানুষের মিল তাদের জীবন দৃষ্টিতে। এই গরিষ্ঠ মানুষের জীবন চেতনা, আদর্শ, বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিই জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, জাতিসত্তার ভিত্তি।

বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা ঃ ভারতীয় বঙ্গভূমি গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্র-বরেন্দ্র, গৌড়-কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়-সুক্ষ-তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ-সমতট, হরিকেল-এই সব জনপদ নিয়ে। এই কয় জনপদ একত্রিত করে সর্ব প্রথম 'বাঙ্গালা' নাম দেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭)। তাই ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিঃসন্দেহে বলা যায় ইলিয়াস শাহের নাম। ইতিহাসে তার নামের আগেই দেখা যায় সর্বপ্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' আর তার সৈন্য বাহিনীর নাম ছিল 'বাঙ্গালা পাইক'। ইতপূর্বে বাংলাদেশের কোন কোন জনপদের রাজা-বাদশাগণ কখনো কখনো বিশাল শক্তির অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের রাজ্যের পরিধি বাংলার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু সমগ্র বাংলা অঞ্চল তথা বাংলা ভাষাভাষী বিশাল ভূভাগ নিয়ে ইলিয়াস শাহের পূর্বে কেউ এককভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তিনি দিল্লি থেকে যেমনি বাংলার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন যা পরবর্তী দু'শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, তেমনি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করেন- যা তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তিনি এমন একটি নামে পরিচিত করেন যা সার্বজনীয় হয় এবং পরবর্তী সাতশত বছরব্যাপী যে নামে পরিচয় দিতে বাঙালীরা গর্ব অনুভব করে। নতুবা এ দেশের নাম হতে পারতো গৌড়, সমটতী, হরিকেল বা অন্যকিছু। জাতি হিসেবে হয়তো পরিচিত হতো বাঙালী না হয়ে গৌড়ী, সমতট, হরিকেলি বা ভিন্ন কোন নামে।

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলাদেশ

শাসনামল	সাল	মোট বছর	মোট শাসক	উল্লেখযোগ্য নৃপতি/ শাসক
মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন	৩২৪খ্রিঃপূঃ-১৮৭খ্রিঃপূঃ	১৩৭	৫ জন	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার, অশোক
গুপ্ত (শশাঙ্ক সহ)	৩২০-৬৩৭ খ্রিঃ	৩১৭	২২ জন	চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্র গুপ্ত, ২য় চন্দ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক
মাৎসন্যায় (অরাজকতা)	৬৩৭-৭৫৬ খ্রিঃ	১১৯		
পাল	৭৫৬-১১২৪ খ্রিঃ	৩৬৮	১৪ জন	গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, ১ম মহীপাল, নারায়ণপাল
সেন	১১২৪-১২০৪ খ্রিঃ	৭৮	৩ জন	বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন
খিলজী	১২০৪-১২২৭ খ্রিঃ	২৩	৪ জন	বখতিয়ার খিলজী, শিরীন খিলজী, ইওয়াজ খিলজী
দিল্লীর অধীন	১২২৭-১৩৪১ খ্রিঃ	১১৪	৩১ জন	তুঘরিল, বোগরা খান, ফিরোজ শাহ, ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
ইলিয়াস শাহী	১৩৪২-১৪১৪ খ্রিঃ	৭১	৬ জন	ইলিয়াস শাহ, সেকান্দার শাহ, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
গণেশ-জালালুদ্দিন	১৪১৪-১৪৪১ খ্রিঃ	২৭	৪ জন	গণেশ, জালালুদ্দিন
ইলিয়াস শাহী (২য় দফা)	১৪৪২-১৪৮৭ খ্রিঃ	৪৫	৫ জন	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ, রুকন উদ্দিন বরবক শাহ
হাবশী শাসন	১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিঃ	৬	৪ জন	সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ, শাসসুদ্দিন মোজাফফর শাহ
হুসেন শাহী	১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ	৪৫	৪ জন	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
পাঠান	১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রিঃ	২৬	৭ জন	শের শাহ শূর, ইসলাম শাহ শূর
কররানী	১৫৬৫-১৫৭৬ খ্রিঃ	১১	৪ জন	সোলায়মান কররানী, দাউদ খান কররানী
মোঘল	১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিঃ	১৮১	৩৬ জন	ইসলাম খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, মুর্শিদ কুলি খাঁ, আলিবর্দি খাঁ, সিরাজুদ্দৌলা
ইংরেজ	১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিঃ	১৯০	৪৫ জন	ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণ ওয়ালিস, ডালহৌসি, ক্যানিং, হার্ডিঞ্জ, কার্জন
পাকিস্তান	১৯৪৭-১৯৭১ খ্রিঃ	২৪	১৮ জন	ফিরোজ খান নূন, শেরে বাংলা, আজম খান, মোনেম খান, টিক্কা খান

www.pathagar.org

ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্বের গুটিকয় মেগা সিটির অন্যতম। মসজিদের শহর বলে খ্যাত ঢাকা মোট ৪ বার রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। মোঘল যুগে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক সর্বপ্রথম (১৬১০-১৭১৭), বঙ্গবঙ্গের সময় ২য় বার (১৯০৫-১৯১১), পাকিস্তান সৃষ্টির ৩য় বার (১৯৪৭-১৯৭১) প্রাদেশিক রাজধানী। ঢাকার সাথে দু'ব্যক্তির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অখ্যাত এক জনবসতিকে ইসলাম খাঁ রাজধানী করে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আনেন এবং স্যার সলিমুল্লাহ দ্বি-খণ্ডিত বঙ্গে রাজধানী করে ঢাকার পূনর্জন্ম দেন। ১৯০৬ সালে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলমানদের প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ফোরাম মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দল ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ঢাকা ১৮৬৪-এ পৌরসভা, ১৯৭৮-এ পৌর কর্পোরেশন, ১৯৮৯-এ সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়। ঢাকা রক্ষায় ১৮৬৪-এ ফকল্যান্ড বাঁধ নির্মিত হয়। ১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিজলী বাতি সাপ্লাই দেয়া হয়। ১৮৭৮-এ চাঁদনী ঘাটে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কেন্দ্র গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় নির্মিত গভর্নর হাউজটি ১৯৭২ সালে বঙ্গভবনে রূপান্তরিত হয়।

আহসান মঞ্জিল : নবাব আব্দুল গণি কর্তৃক ১৮৭২ নির্মিত তৎকালীন ঢাকার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল

লালবাগ কেল্লা

লালবাগ কেল্লা ঃ লালবাগ দূর্গ নামে পরিচিত হলেও এ দূর্গের পোশাকী নাম আওরঙ্গাবাদ দূর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম বাংলার সুবাদার থাকাকালে ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তী সুবাদার নবাব শায়েস্তা খাঁ এ কাজ এগিয়ে নেন। ২০০০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৮০০ ফুট প্রশস্ত আয়তাকার এ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তিনতলা বিশিষ্ট প্রধান প্রবেশ তোরণ মোঘল স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। এছাড়া আরও দুটি তোরণ রয়েছে। দুর্গ এলাকার মাঝ বরাবর পশ্চিম প্রান্ত হতে এক সারিতে মসজিদ পরীবিবির মাজার, হাম্মামখানা ও দরবার গৃহ এবং একটি জলাশয়ের অবস্থান। মসজিদটি ঐতিহ্যবাহী মোঘল তিন গম্বুজ পরিকল্পনায় নির্মিত। এরপরে মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে পরীবিবির মাজার। ভারতীয় এবং ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মোঘল স্থাপত্যরীতির এক অনুপম নিদর্শন এই ইমারত। নানা স্থান হতে সংগৃহীত বহুমূল্যবান পাথর আর অপূর্ব কারিগরীর সমন্বয়ে নির্মিত এই সৌধটি বাংলাদেশে মোঘল ইমারতসমূহের মাঝে সহজেই আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। পূর্বপ্রান্তে পুকুর পাড়ে অবস্থিত দ্বিতল ইমারতটির উপরতলা দরবার কক্ষ এবং নীচতলা হাম্মামখানা। উষ্ণ এবং শীতল জলাধারসহ এখানে রাজকীয় গোছলের আয়োজন ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত এলাকা ঐতিহ্যবাহী মোঘল বাগান পরিকল্পনায় বিন্যস্ত।

www.pathagar.org

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

নানা ঘটনা ও বহু সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আজকের বাংলাদেশ

ইসলামপূর্ব বাংলা ঃ আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ এবং আর্য বিরোধীদের নিরাপদভূমিতে পরিণত হয়। গুপ্ত যুগে আর্যকরণ ও জাতিভেদ প্রথাপ্রতিষ্ঠা পেলেও পাল যুগে আবার জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পায়। বহিরাগত সেনারা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করলে বখতিয়ার খিলজীর বিজয় অভিযান জনগণকে মুক্তি দেয়।

সুলতানী যুগ ঃ ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৭ জন অগ্রবর্তী অশ্ববাহিনী নিয়ে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় ও লক্ষণ সেনের বিক্রমপুর পলায়ন, ১২১২-২৭, হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খিলজীর দিল্লির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন, ১৩৩৮ ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের ক্ষমতা গ্রহণ, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে একত্রিত করে স্বাধীন মুলকে বাঙ্গালা প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী জাতির পত্তন, ১৩৫৯ ফিরোজ শাহ তুঘলকের দ্বিতীয় বাংলা অভিযান ১৫৭৬ রাজমহলের যুদ্ধে দাউদের পরাজয়, ১৫৮৩-৯৯ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে ঈশা খাঁনের অবিরাম লড়াই, আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পরাজয় (১৫৯৭) ও সন্ধি স্থাপন।

মোঘল যুগ ঃ মোঘল যুগে বাংলা একটা প্রদেশ হলেও এ অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি হয়-১৬১০ সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগর) রাজধানী স্থানান্তর, ১৬৬৬- শায়েস্তা খাঁনের সুবেদারী আমলে চট্টগ্রাম অধিকার ও ইসলামাবাদ নামকরণ, ১৭১৭- মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত ও বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর, ১৭৪০- আলীবর্দী খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত, ১৭৫৬- আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজুদ্দৌলার বাংলার সিংহাসন লাভ।

ইংরেজ আমল ঃ ১৭৫৭- পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন) ও বাংলার ইংরেজ কর্তৃত্বের সূচনা, ১৭৬৪- বক্সারের যুদ্ধ, ১৭৬০-১৮০০- ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ১ম ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ, ১৮৬০-৬২- হাজী শরীয়াতুল্লাহ ও দুদু মিয়া কর্তৃক ফরায়েজী আন্দোলন, ১৮২১-৩১- অকুতোভয় বীর তিতুমীরের ইংরেজ-জমিদার প্রতিরোধ আন্দোলন ও শাহাদাৎবরণ, ১৮৫৭- হাবিলদার রজব আলী কর্তৃক সিপাহী বিপ্লবের সূচনা ও ব্রিটিশ বিরোধী মহাঅভ্যুত্থান, ১৮৬০- নীল বিদ্রোহ, ১৯০৫- নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬- ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯১১- বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯২০- খেলাফত আন্দোলন, ১৯২১- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বর্ণহিন্দুদের বিরোধীতা ১৯৪০- শেরেবাংলা কৃর্তক লাহোর প্রস্তাব পেশ।

পাকিস্তান আমল ঃ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ (১৪ আগস্ট) তমুদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূচনা (১সেপ্টেম্বর), ১৯৫২- ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব, ১৯৫৪- যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬৬- ছয়দফা পেশ, ১৯৬৯- গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন, ১৯৭০- নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়, ১৯৭১- প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন (২ মার্চ), কালোরাত্রি (২৫ মার্চ), অস্থায়ী সরকার গঠন (১৭ এপ্রিল), পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় (১৬ ডিসেম্বর)

ভাষা আন্দোলন ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার

১৯৪৭- প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠন ও ভাষা আন্দোলনের সূচনা (২ সেপ্টে.), নূরুল হক ভূইয়াকে আহবায়ক করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন (১ অক্টো), ১৯৪৮- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন (১১ মার্চ), ডাকসু জিএস গোলাম আযম গ্রেফতার (১৪ মার্চ), ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক প্রকাশ (১৪ নভে), প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট গোলাম আযমের স্মারকলিপি পেশ (২৭ নভে), ১৯৫২-'উর্দুই হবে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট আহবান, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রসমাজের মিছিল, পুলিশের গুলিবর্ষণে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখের শাহাদাত। ভাষা আন্দোলনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তন্মধ্যে কয়েকজন: অলি আহাদ, আঃ রহমান চৌধুরী, আব্দুল গফুর, সানাউল্লাহ নূরী, শাহেদ আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, গাজীউল হক প্রমুখ।

সেদিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। ইংরেজ বেনিয়াদের দুইশত বছরের শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও অর্থনৈতিক উপনিবেশিকতার শিকার হয়ে বাংলাদেশ পঙ্গু হয়ে গেছে। অথচ এক সময় পৃথিবীর অন্যতম ধনী অঞ্চল ছিল বাংলাদেশ। স্মরণাতীত কাল হতে পর্যটকগণ নানা দেশ ভ্রমণ করে সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেন। সেই প্রাচীনকালে খ্রিষ্টপূর্বে রোমান কবি ওভিদ, গ্রীক পণ্ডিত টলেমী, গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস; খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক ফাহিয়েন, ৭ম শতাব্দীর হিউয়েন সাং, ১৪শ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা, ১৫শ শতাব্দীর চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান, জিয়াউদ্দিন বারানীসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বর্ণনায় এসব জানা যায়। প্রথম পদার্পণেই সম্রাট হুমায়ুন অবাক বিস্ময়ে এর নাম দেন জান্নাতাবাদ, প্রেমে পড়ে যান এ অঞ্চলের।

সেসময় চীন থেকে মিশর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মসলিনসহ রেশমপণ্য, মৃৎ ও ধাতবপাত্র, মাদুর-পাটি, অলঙ্কার, শাঁখা, বনজ ঔষধ, সোরা (বারুদ উপকরণ), গুড়সহ অসংখ্য পণ্য রপ্তানি হতো। এ ধরনের সমৃদ্ধ দেশের অর্থ সম্পদ লুট করেই দরিদ্র-পশ্চাদপদ ইউরোপ ধনাঢ্য ইউরোপে পরিণত হয়। তাদের সভ্যতা বিকশিত হয় আমাদের অর্থসম্পদ গ্রাস করেই।

বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ

১৯৭২- সংবিধান গৃহীত (৪ নভেম্বর), কার্যকরী (১৬ ডিসেম্বর) ১৯৭৫- একদলীয় বাকশাল গঠন (২৫ জানু), ফারাক্কা বাঁধ চালু (২১ এপ্রিল), শেখ মুজিবুর রহমান নিহত (১৫ আগস্ট), সিপাহীজনতার বিপ্লব (৭ নভে), ১৯৭৬- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু (২৯ আগস্ট), ১৯৭৭- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রশিবিরের আত্মপ্রকাশ (৬ ফেব্রু.),১৯৭৮- ১ম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান নির্বাচিত (৩ জুন), ১৯৮১- জিয়াউর রহমান নিহত (৩০ মে), ১৯৮২- সামরিক শাসন জারির মাধমে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ (২৪ মার্চ), ১৯৮৩- ভাষাসৈনিক গোলাম আযম উদ্ভাবিত কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক পেশ (২০ নভে), ১৯৮৫- ঢাকায় ১ম সার্ক সম্মেলন, ১৯৮৭- জামায়াতের সদস্যগণের পদত্যাগে ৩য় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে যায়, ১৯৮৮- ভয়াবহ বন্যা, ১৯৯০- গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতন, ১৯৯১- বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ৫ম সংসদ নির্বাচন (২৭ ফেব্রু), জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে বিএনপির সরকার গঠন, ১৯৯২- তিনবিঘা হস্তান্তর, ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী

www.pathagar.org

লীগের বিজয় (১২ জুন), ২০০০- প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন (২১ ফেব্রু.), সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রশিবিরসহ ১০টি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয়ছাত্র ঐক্য গঠন (২৬ এপ্রিল), ২০০১- সরকার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্তপর্বে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মহাসমাবেশ (২৪ মার্চ), বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ (১৫ জুলাই), ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয় (১ অক্টো)।

মহাদুর্ভিক্ষ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে মানবসৃষ্ট তিনটি দুর্ভিক্ষই ছিল নজিরবিহীন। যথা–

১৭৭০ (১১৭৬ বাংলা) ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসৃষ্ট সবচেয়ে ভয়াবহতম এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক মারা যায়। নব প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনকে পাকাপোক্ত করাই ছিল এ দুর্ভিক্ষের কারণ।

১৯৪২-৪৩ (১৩৫০ বাংলা) ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩৫-৪০ লক্ষ লোক মারা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মা হয়ে জাপানি বাহিনীর প্রবেশ ঠেকাতে কৌশল হিসেবে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বেছে নেয় ইংরেজ সরকার।

১৯৭৪ ঃ বন্যাকে উপলক্ষ করে শাসকগোষ্ঠীর লুটপাট, কালোবাজারী, মজুদদারীর মাধ্যমে সৃষ্ট কৃত্রিম এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক লোক মারা যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর গবেষণা করে, তত্ত্ব দিয়ে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান অমর্ত্য সেন।

হৃদয়ে বাংলাদেশ

ছোট সোনা মসজিদ ঃ অনুপম এ স্থাপত্য কীর্তিটি হোসেন শাহ এর আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) নির্মিত। উর্ধ্বপ্রান্তে সোনালি বলয় থাকায় এর নাম সোনা মসজিদ। সুলতানী আমলের এ ধরনের অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শন বাংলাদেশে বিদ্যমান।

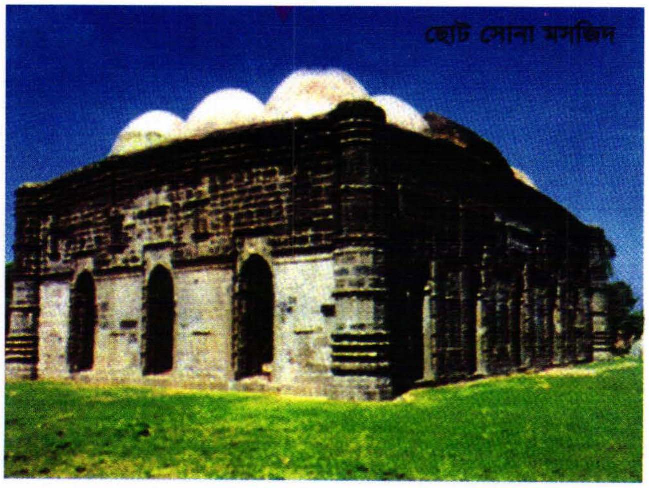

কোতওয়ালী দরওয়াজা ঃ সুলতানী আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক দুর্গ নগরী গৌড়ের অন্যতম প্রবেশদ্বার। এটি বাংলাদেশে-ভারতের মধ্যবর্তী শিবগঞ্জ মালদহ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় ভূখণ্ডে অবিস্থত। প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগর বা রাজধানীর প্রবেশপথে এ ধরনের তোরণ নির্মিত হতো। বিভিন্ন সময়ে বাংলার যেসব শহর রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পায় তন্মধ্যে ঢাকা, সোনারগাঁ, পাণ্ডয়া, লক্ষ্ণৌ, বিক্রমপুর বিখ্যাত।

সোমপুর বিহার (পাহাড়পুর)ঃ এক সময় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। ভারত বর্ষে আর্য বাক্ষণ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে নিপীড়িত জনগণের জন্য এ অঞ্চল ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এ সময় অনেক বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। নওগাঁ জেলায় অবস্থিত এ বিহারটি রাজা ধর্মপাল (৭৮১-৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত বিহারগুলো : শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভাসু বিহার, জগদ্দল বিহার ইত্যাদি।

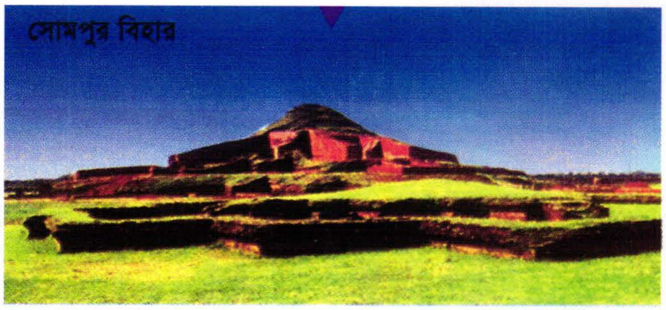

পুরাতন ঢাকা গেট ঃ মীর জুমলা ১৬৬০ সালে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর ঢাকার প্রবেশদ্বার হিসেবে এই গেট নির্মাণ করেন।

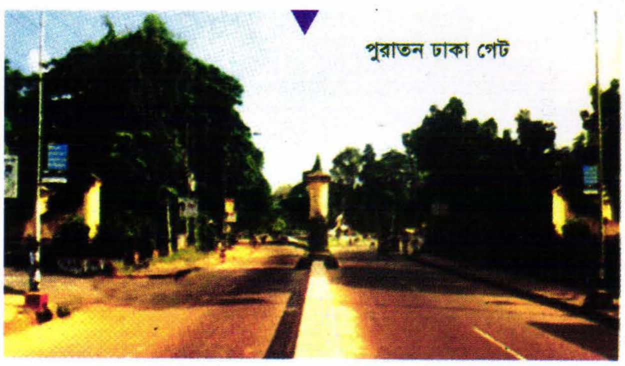

www.pathagar.org

বানিয়াচং গ্রাম ঃ প্রায় অর্ধমাইল দীর্ঘ সাগরদীঘির পাশে হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ গ্রাম।

বানিয়াচং গ্রামের একাংশ

সোনারগাঁ ঃ মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ইছামতি ও শীতলক্ষ্যা নদী দ্বারা চতুর্দিক সুরক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক সোনারগাঁ'র পূর্ব নাম ছিল সুবর্ণগ্রাম। কথিত আছে ঈশাখাঁ'র স্ত্রী সোনাবিবি'র নাম থেকে সোনারগাঁ হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে গড়ে উঠলেও ১২৮০ খ্রিস্টাব্দ হতে এর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী সোনারগাঁ বিশ্বের কয়েকটি কিংবদন্তি স্থানের একটি ছিল যাকে পৃথিবীর জান্নাত বলা হতো। যা রীতিমতো উপমায় পরিণত হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ একে রাজধানী করে এখান থেকেই বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শেরশা'র মধ্য এশিয়া বিস্তৃত বিখ্যাত গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডের সূচনা হয় এখান থেকেই। ঈশাখাঁ এখানে অবস্থান করেই সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন।

সোনারগাঁ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতিভূতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় প্রাদপ্রদীপের ভূমিকায় থেকে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে অবদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও মহিমান্বিত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাহাদুর শাহ পার্ক ঃ হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ১৮৫৭-এ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার বিদ্রোহের সূচনা হয়। ঢাকার অগণিত বিদ্রোহী সিপাহীদেরকে ইংরেজরা আটাঘর নামক ময়দানে ফাঁসি দেয় এবং ১৮৫৭ সালে রাণীর ঘোষণাপত্র মার্বেল ফলকে স্থাপন করে নাম দেয়া হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক। ১৯৫৭-এ সিপাহী বিপ্লবের একশ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে অজ্ঞাতনামা শহীদদের স্মরণে এখানে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় এবং ভিক্টোরিয়া পার্কের পরিবর্তে শেষ মোঘল সম্রাটের নামে বাহাদুর শাহ পার্ক করা হয়।

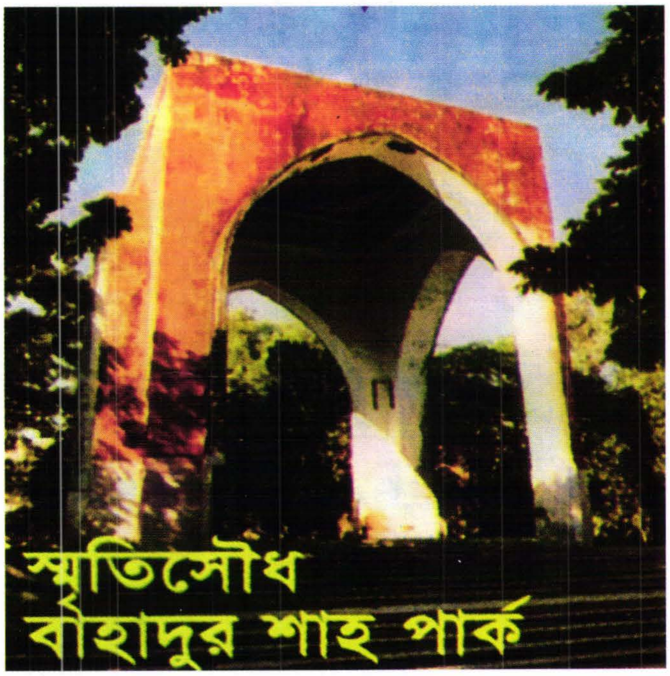

স্মৃতিসৌধ
বাহাদুর শাহ পার্ক

www.pathagar.org

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

হাতে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফ

সপ্তদশ শতাব্দীতে অপূর্ব কারুকার্যে ও সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা কুরআন শরীফটি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সে সময় ছাপাখানা না থাকলেও হাতে লিখেই মানুষ ধর্মীয় গ্রন্থ, বই-পুস্তক নিজস্ব সংগ্রহে রাখতো। কুরআনই হচ্ছে মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ। মুসলমানরা যতদিন কুরআনকে তাদের জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিল ততদিন তারা ছিল পৃথিবীর শাসক। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ কুরআনভিত্তিক শাসন চালু করায় সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতির ফলে মুসলিম জগতে নেমে আসে অমানিশা। অপমান, অধঃপতন আর নির্যাতন হয়েছে তাদের নিত্যসঙ্গী। মুসলমানদের রক্তে আজ পৃথিবী রঞ্জিত। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কুরআনের দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

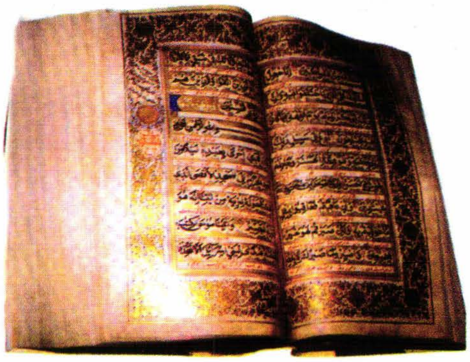

মানবতা অকৃত্রিম বন্ধু রাসূলে করীম (সা) এর হাতে গড়া একদল নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী ইসলামের সুমহান দাওয়াত নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে এবং বহু ইসলাম প্রচারক বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করেন। পরবর্তীতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

www.pathagar.org

শাহজালাল (রহ) এর মাজার সংলগ্ন মসজিদ : বাংলাদেশে ইসলামের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে কয়জন ব্যক্তিত্বের অবদান চিরস্মরণীয় তন্মধ্যে হজরত শাহজালাল (রহ) অন্যতম। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ তাঁর সেনাপতি সেকান্দার গাজিকে দু'বার রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠিয়ে ব্যর্থ হলে শাহজালাল (রহ) ৩৬০ জন শিষ্য নিয়ে ঐ বাহিনীকে সহযোগিতা করলে যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে গৌর গোবিন্দ পলায়নে বাধ্য হয়। সুদূর ইয়েমেনের দীপ্ত দরবেশ হজরত শাহজালাল (রহ) ৭০০ বছর পূর্বে সিলেট বিজয় করে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদিনার নগর রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে (১৩০৩-৪৬ খ্রি:) যে উন্নত সভ্যতার পত্তন করেছিলেন তার ভিত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তারই স্মৃতিধন্য এই সিলেট বাংলাদেশের সম্পদ-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধির প্রতীক। সুপ্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এবং শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারে ধন্য সিলেট বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী।

শাহজালাল (রহ) এর মাজারসংলগ্ন মসজিদ

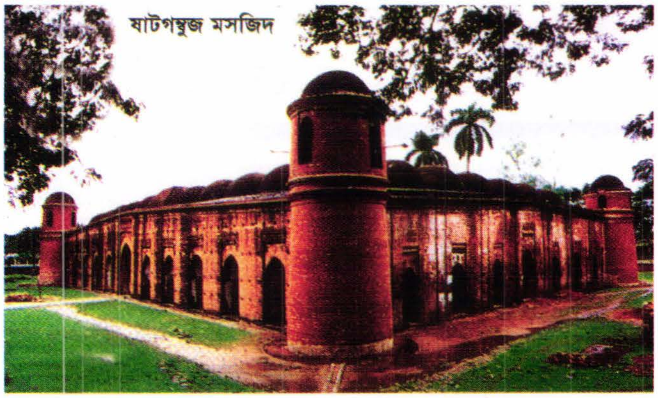

ষাটগম্বুজ মসজিদ : খুলনা বিভাগের সর্বত্র জনবসতি গড়ে তোলা এবং ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন খান জাহান আলী। তিনি এলাকায় কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন খলিফাবাদ বা আল্লাহর প্রতিনিধির অঞ্চল। বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদসহ ৩৬০টি মসজিদ, লোনা পানির দেশে সুপেয় পানির জন্য ৩৬০টি দীঘি ও অসংখ্য পাকা সড়ক নির্মাণ করেন। তিনি ঝিনাইদহের বারবাজার থেকে দক্ষিণমুখে পথে পাকা সড়ক, পাকা মসজিদ নির্মাণ ও বড় বড় জলাশয় খনন করে অগ্রসর হতে হতে বাগেরহাটে এসে আস্তানা গড়েন। সেখানেই ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইন্দ্রাকপুর জলদুর্গ

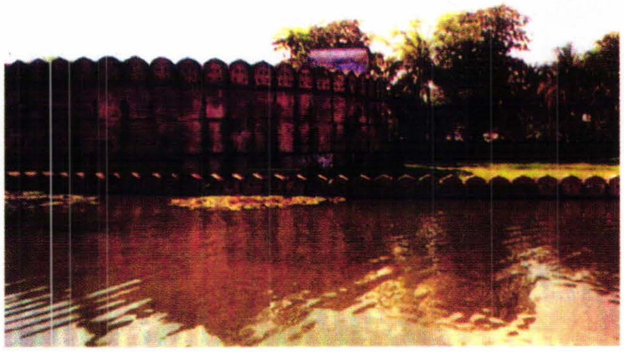

ইন্দ্রাকপুর জলদুর্গ : ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার মীরজুমলা মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুন্সীগঞ্জের ইছামতি নদীর তীরে এ দুর্গ তৈরি করেন। বাংলাদেশে যতগুলো প্রাচীন দুর্গ দেখা যায় তন্মধ্যে জলদুর্গ হিসাবে ইন্দ্রাকপুর বিখ্যাত।

দরসবাড়ি মাদ্রাসা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় নগরীতে ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে এই বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হয়। পাশে একটি চমৎকার মসজিদ রয়েছে। আরবি দরস অর্থ পাঠদান। মাদ্রাসার দরস বা পাঠ দান করা থেকেই এলাকার নাম দরসবাড়ি হয়ে যায়।

www.pathagar.org

ধানমন্ডি ঈদগাহ ঃ বাংলাদেশের প্রাচীন ঈদগাহের একমাত্র নিদর্শন। বাংলার সুবাদার শাহ সুজার আমলে দেওয়ান মীর আবুল কাশেম ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। অন্যান্য বিখ্যাত ঈদগাহের মধ্যে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ।

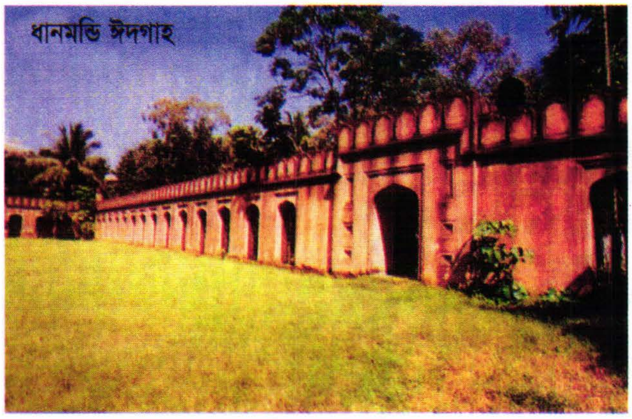

পানাম পুল ঃ মুসলিম শাসনামল ছিল জনকল্যাণমুখী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল তখন। সে সময় অসংখ্য রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-পুল নির্মাণ করা হয়। সোনারগাঁয়ে মোঘল আমলে নির্মিত পানাম জনপদের প্রবেশপথে ১৭৩ ফুট দীর্ঘ এ পুলটি তারই নজির।

গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কবর ঃ এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বাংলার স্বাধীন শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় শাসক গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ। তাঁর ন্যায়বিচার আজো কিংবদন্তি হয়ে আছে। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্য গণেশের চক্রান্তে ১৪১১ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন।

গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কবর, সোনারগাঁ

নহবতখানা ঃ মুসলিম শাসকদের প্রাসাদের প্রবেশপথে এধরনের নহবতখানা থাকত। এখান থেকে মুসাফিরদের আশ্রয়ের সন্ধান দেয়া হতো। সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন ও ফরমান জারী করা হতো। এটিই বাংলাদেশের সন্ধানপ্রাপ্ত একমাত্র নহবতখানা।

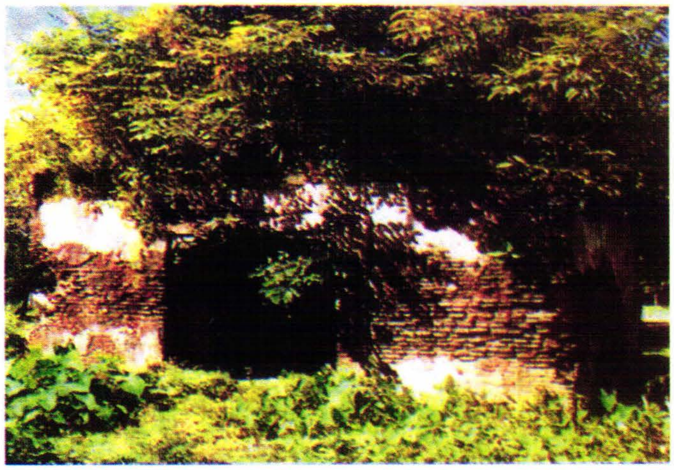

শায়েস্তা খানের বাড়ি ঃ ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর বসবাসের জন্য ছোট কাটরা বলে খ্যাত এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এর প্রাচীন সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটি ঢাকার চক বাজারে অবস্থিত।

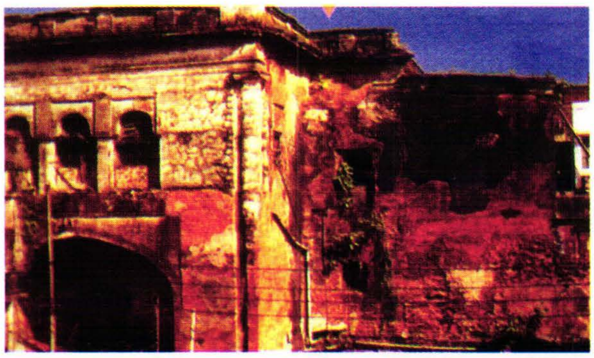

শায়েস্তা খানের বাড়ি

দুর্গের প্রবেশপথ ঃ এটি নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ দুর্গের প্রবেশপথ। দুর্গের প্রবেশ পথ কৌশলগত কারণে বেশ উঁচু এবং সরু বাঁকা হতো। যাতে শত্রুবাহিনী সহজে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

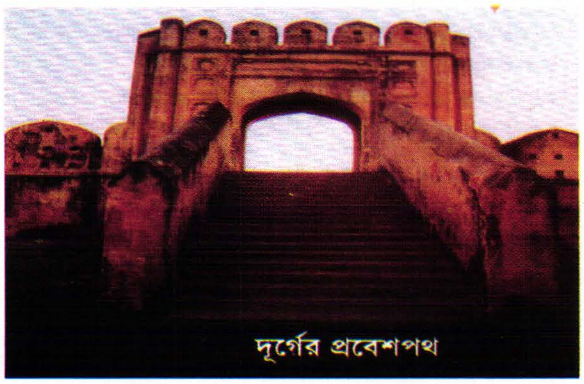

www.pathagar.org

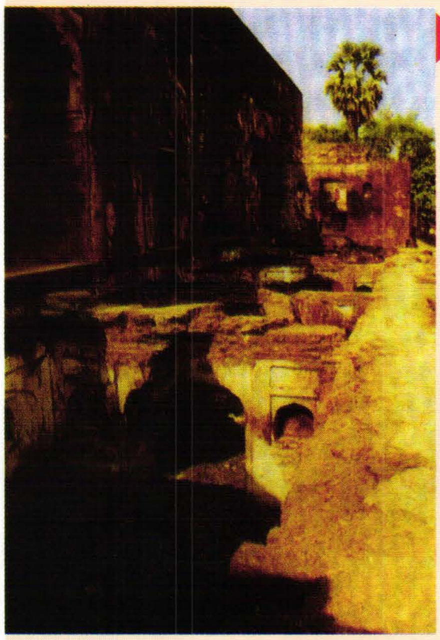

তাহখানা ঃ জলাশয় সংলগ্ন ইমারত। এর ভূগর্ভস্থ কক্ষকে শীতল রাখতে জলাশয় হতে পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ করা হত। গৌড়ের এই তাহ্খানাটি ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা তার পীর শাহ নিয়ামাতুল্লাহর জন্য নির্মাণ করেন।

শিলালিপি ঃ ইতিহাস উদ্ধারে শিলালিপির ভূমিকা অপরিসীম। ইতিহাস ইসলামের দান। প্রায় সকল ইসলামী স্থাপত্যে শিলালিপি দেখা যায়। এসব শিলালিপিতে রয়েছে শৈল্পীক নিদর্শন। ১৫৮২ সালে স্থাপিত বগুড়া জেলার শেরপুরের খেরুয়া মসজিদের গাত্রে ধূসর বেলে পাথরের এ চমৎকার শিলালিপিটি সংরক্ষিত আছে।

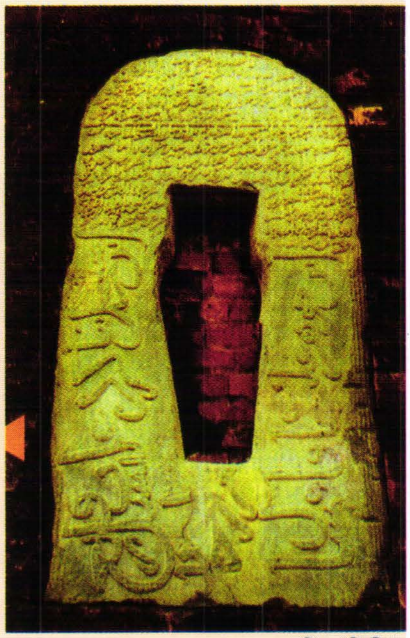

তাহখানা

শিলালিপি

বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই ইসলামের আগমন

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই এদেশের অধিবাসীগণ ইসলামের সাথে পরিচিত ছিলেন। আবরদেরকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে চীনে যেতে হতো। এছাড়াও এ বন্দরের সাথে ইসলাম আগমনের পূর্বেই আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) এর সময় ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক (রহ) এর নেতৃত্বে কায়েস ইবনু ছায়রদী, তামীম আনসারী, উরওয়াহ ইবনু আছাছা, আবু কায়েস ইবনু হারিসা (রহ) সহ একটি দল চট্টগ্রামে আসেন। এখানে ইসলাম প্রচার করে কয়েক বছর পর তাঁরা চীনে যান। রাসূল (সা) এর ওফাতের পর যে সকল সাহাবী ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীন প্রচার করতে এসে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছেছেন তাঁরা হলেন ০ আব্দুল্লাহ ইবনু উতবান ০ আসেম ইবনু আদী ০ হাকিম ইবনু আবিল আস সাকাফী (রা)। পরবর্তীতে দু'জন তাবেয়ী মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহায়মেন-এর একটি দলসহ এরূপ পাঁচটি দল বাংলা মুলুকে ইসলাম প্রচার করেন।

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়। ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে কবলিত মুসলমানগণ আরাকানে আশ্রয় পায়। ৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের মুসলমানেরা পার্শ্ববর্তী (চাটিগাঁও/ চট্টগ্রাম) নামক স্থানে বিজয় করেন এবং বাংলায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহ মুহাম্মদ সুলতান বলখী নৌ-পথে ইসলাম প্রচারের জন্য মানিকগঞ্জের হরিনামনগর আসেন। পরবর্তীতে বগুড়ার মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী অঞ্চলে মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে একদল মুবাল্লিগ নিয়ে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী নেত্রকোনায় আসেন। মদনপুরের রাজার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিলে প্রথমে তিনি বিদ্বেষপোষণ করলেও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহ মাখদূম রূপোশ রাজশাহী অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক। বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে যেসব ইসলাম প্রচারক সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে বাংলায় ইসলামের ভিত গড়ে তুলেছিলেন শাহ মাখদূম ছিলেন তাদের প্রধানতম। তিনি রামপুরের বোয়ালিয়াকে কেন্দ্র করে রাজশাহীকে ইসলামের দূর্গে পরিণত করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়ীবেশে ইসলাম

উত্তরবঙ্গ (গৌড়, নদীয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর): ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী; **পূর্বাঞ্চল** (সোনারগাঁও, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ): ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে মুগিসউদ্দিন তুগরীল; **সিলেট:** ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহজালাল, সেকান্দার গাজী; **চট্টগ্রাম:** ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ; **খুলনা বিভাগ:** ১৪১৮-১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে খান জাহান আল।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে। মুসলিম শাসন একাধারে ৫৫৪ বছর চলেছিল। তা হলো- ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি রাজমহল, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, যশোর ও নদীয়ায় ইসলাম সম্প্রসারণের জন্য মসজিদ, ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ করেন। ১২১২-২৭ খ্রিষ্টাব্দে হুসাম উদ্দিন খিলজী বহু মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তিনি বিশিষ্ট আলেমদেরকে ভাতা প্রদান এবং দরবারে ওয়াজের ব্যবস্থা করতেন। ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁ এসে বসতি স্থাপন করে নির্ভেজাল জ্ঞান বিতরণের জন্য এখানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৩০১-০৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহের শাসনাকালে শ্রীহট্টের মুসলিম নিপীড়ক রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে সেনাপতি সেকান্দার গাজীর নেতৃত্বে দু'বার ব্যর্থ অভিযানের পর হজরত শাহজালালের সহযোগিতায় হিন্দুরাজের পতন হয়। আব্দুল কাদির

www.pathagar.org

জিলানীর পৌত্র সায়েদ আহমদ তানুরী লক্ষ্মীপুরের কাঞ্চনপুরে ইসলাম প্রচার করেন। বখতিয়ার মাইসুর সন্দ্বীপে ইসলাম প্রচার করেন। ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহ শফীউদ্দীনের সহযোগিতায় জাফরখান সাতগাঁও জয় করেন ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌতির গভর্নর বাহরাম খানের রিসালদার ফখরুদ্দীন ভুলুয়া (নোয়াখালী), চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন সম্প্রসারিত করেন। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করা ছাড়াও ইসলাম প্রচারে মুবাল্লিগদেরকে উৎসাহিত করতেন। ১৪৩৯ খ্রিষ্টাব্দে খান জাহান আলী বৃহত্তর খুলনায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ষাটগম্বুজ মসজিদ তাঁর অমরকীর্তি। তিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করেন। ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে আরব দেশ থেকে শাহ ইসমাঈল গাজী ১২০ জন মুবাল্লিগ নিয়ে গৌড়ে আসেন এবং সিলেট ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউসুফ শাহ তাঁর শাসনামলে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের নৈতিক মানোন্নয়নে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন এবং বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন শাহ পরাগল খান খলিফাতুল্লাহ, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলাইমান কররাণী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তিনি সালতানাতে ইসলামী শরীয়াহ বিষয়ক আলোচনা করতেন। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ঈশা খাঁ বার ভূঁইয়াদের নিয়ে বাতিল ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মোঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে বাংলাকে দ্বীনেএলাহীর প্রভাবমুক্ত রাখেন এবং দিল্লী থেকে বিতাড়িত প্রতিবাদী মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেন। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ঢাকায় এসে পৌছে প্রথমে যাকাত, উশর, জায়গীর ইত্যাদি সংক্রান্ত অসঙ্গতি দূর করেন। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার হয়ে বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ নির্মাণ করেন; ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ জুন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। অপরিণামদর্শী স্বার্থান্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ফলে ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হয়ে ১৯০ বছর ইংরেজদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে হয়।

ইংরেজ আমলে মুসলিম সংস্কারকদের ভূমিকা

১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলে বাংলার মুসলমানদের ওপর ইংরেজ শাসন ও হিন্দু জমিদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুসলমানরা তিন ধরনের আক্রমণের শিকার হতে থাকে। দখলদার ইংরেজদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরম আক্রমণ। তাদের তল্পিবাহক হিন্দু এলিটদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ব্যাপক ধর্মান্তকরণের চেষ্টা। এই বহুমুখী আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন মুসলিম সমাজ সংস্কারকগণ। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন-

হাজী শরীয়তুল্লাহ ঃ তিনি মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার, শিরক, বেদায়াত নির্মূলের জন্য ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে দুদু মিয়া মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৪০-৬২ খ্রি:) এটাকে ইংরেজ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ দেন।

মীর নিসার আলী তিতুমীর ঃ তিনি ১৮২১ সালে ইংরেজ, হিন্দু জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ ও মুসলিম সমাজে আত্মজাগরণ সৃষ্টিতে গড়ে তোলেন আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের দমন করে ইংরেজ পেটুয়াবাহিনীকে একাধিকবার পরাজিত করেন। তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লায় শাহাদাত বরণ করেন।

মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ঃ তিনি বাংলা আসামের আনাচে-কানাচে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মুসলিম সমাজকে পরাধীনতার হীনমন্যতা ও হিন্দু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেন। তিনি মুসলমানদেরকে আবার মুসলমান বানান। তখনকার মুসলিম সমাজ এতটা অধঃপাতে গিয়েছিল যে, পুরুষরা লেংটি ও মেয়েরা গামছা পরত এবং হিন্দু জমিদারদের দেয়া নবজাতকের নামে নাম গিছু, গাছা, পেটা, ফেজু এ ধরনের গ্রহণ করত। মুসলমানরা হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠান সবই পালন করত। তিনি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রচারকার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখে মুসলিম সমাজের আমূল পরিবর্তন করেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ ঃ খ্রিষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর চেষ্টার ফলেই মিশনারীদের কর্মতৎপরতা অনেক কমে যায় এবং মুসলিম সমাজ সতর্ক হতে পারে।

বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হওয়ার পরও মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ

বিশ্বমানচিত্রের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, এর চারপাশে নানা মতাবলম্বীদের আবাসভূমি হওয়ার পরও কিভাবে বিচ্ছিন্ন এ অঞ্চলটি মুসলিম প্রধানের গৌরব অর্জন করল, তার কারণ হলো: ইসলাম যখন সমগ্র দুনিয়ায় মুবাল্লিগ ও মুজাহিদগণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছিল তখন স্থলপথের চেয়ে নৌ-পথই ছিল যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম। বাংলার চাটিগাঁ ছিল বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর একটি। ইসলাম প্রচারক ও আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজ বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে শৎগঙ্গ (চট্টগ্রাম) বন্দর হয়ে চীন দেশে যেত। এ সুবাদে বাণিজ্য কাফেলা ও মুবাল্লিগগণ বাংলায় প্রবেশ করে ইসলামের দাওয়াত মানুষের হৃদয় রাজ্যে গেঁথে দেন। তাছাড়া রাজনৈতিক বলয়মুক্ত, শান্ত প্রকৃতি ও কোমল স্বভাবের অধিকারী, নৈতিক চরিত্রে খুবই উন্নত এ অঞ্চলের মানুষ ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলাম রাজনৈতিক তৎপরতার সমন্বয়ে বিজয়ী রূপ লাভ করে।

www.pathagar.org

অঞ্চলভিত্তিক বিখ্যাত ইসলাম প্রচারকগণ

চট্টগ্রাম ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ: সাহাবী-আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাব, কায়েস ইবনু হুযাইফা, উরওয়াহ ইবনু আছাছা, আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা), ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ: তাবেয়ী-মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ মুহায়মেন, ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ: আওলিয়া-বায়েযীদ মোস্তামী, মাহমুদ মাহী সওয়ার, বদর শাহ, ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দ: শেখ ফরিদ, ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ আমানত। কুমিল্লা-চাঁদপুর ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ রাস্তি, শাহ মাদার খাঁ **নেত্রকোনা** ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী **মুন্সীগঞ্জ** ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ: আদম শাহ্ **রাজশাহী** ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ মাখদুম রূপোশ, ফুরকান শাহ বগুড়া ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ বন্দিগী গাজী, ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ; শাহ সুলতান বলখী, ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ: ফতেহ আলী **দিনাজপুর** ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ: আলী মারদান খিলজী, বদরুদ্দীন **পাবনা** ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ: মাখদুম শাহ দৌলা **সোনারগাঁও** ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দ: শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ শফীউদ্দীন, ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ: শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, শায়খ শারফুদ্দীন ইয়াহিয়া, ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ: শায়খ আলাউল হক **সিলেট** ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ: শাহজালাল ইয়ামেনী, শাহ পরাণ ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ ইসমাঈল গাজী **লক্ষ্মীপুর** ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ: খান জাহান আলী, গরীবশাহ, শাহ মাদার, ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ মুহাম্মদ আবু তাহির **ঢাকা বিভাগ** ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দ: সুলতান রুমী, ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ: আদম শহীদ, ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ: তুরকান শাহ, ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দ: সুলাইমান খান, ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ আলী বোগদাদী, ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ: শাহবাজ খান, ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ: মুয়াযযাম খান মীর জুমলা, ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ: শায়েস্তা খাঁন জাহাঙ্গীর **খুলনা** ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ: হযরত খান গাজী **রংপুর** ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ কলন্দর ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দ: মখদুম শাহ জালালুদ্দীন, জাহাঁগশাত বুখারী, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ: সৈয়দ আবু জাফর মাদানী, গোরা সৈয়দ পীর, পাগলা পীর, ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ ইসমাঈল গাজী, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ: কেরামত আলী জৌনপুরী, শাহ ফলাদার **ফরিদপুর** ১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ: বদিউদ্দীন শাহ মাদার, ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ আলী বোগদাদী, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ: হাজী শরীয়তুল্লাহ, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ: শামসুল হক ফরিদপুরী **জামালপুর** ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ কামাল, ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দ: শাহ জামাল **বৃহত্তর বরিশাল** ১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দ: সাইয়েদুল আরেফীন, মীর কুতুব, চেরাগ আলম, নফিসুর রহমান, শাহ ওয়াজির আলী, শাহ ইয়ার, ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ: নেছার উদ্দিন আহমদ, ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ: কেরামত আলী, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ: আবু জাফর ছালেহ।

ইসলাম প্রচারে বঙ্গে উল্লেখযোগ্য শহীদগণ

১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ: বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদ (একদল অনুসারীসহ)। ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ: পাবনার শাহজাদপুরে মখদুম শাহদৌলা (২১ জন অনুসারীসহ) ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ: বগুড়ার শেরপুরে শাহ তুর্কান শহীন। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ: সাতগাঁও-এ শাহ সুফী শহীদ ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ: কুমিল্লায়। সাইয়েদ আহমদ কল্লা শাহ ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দ: গৌড়ে শায়খ বদরুল ইসলাম। ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দ: সোনারগাঁও-এ শায়খ আনওয়ার শাহ। ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ: বর্ধমানে খাজা আনওয়ার শাহ, ঢাকায় শাহ আব্দুর রহীম।

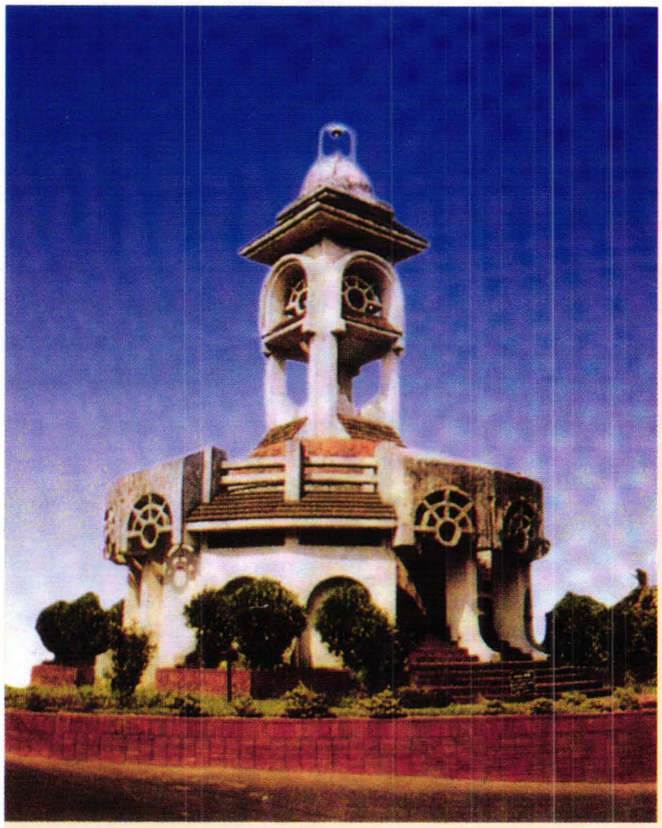

চেরাগী পাহাড়

চেরাগী পাহাড়ে শাহ বদরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান

শাহ বদর এখানে চাটি বা চেরাগ জ্বালিয়ে লোকালয় গড়ে তোলেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। তাই এলাকার নাম হয় চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম। বার আওয়ালিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামে পদধূলি পড়েছে অসংখ্য পুণ্যাত্মার। সেই রাসূল (সা) এর যুগ থেকেই তাঁর প্রিয় ৪ জন সাহাবীসহ এখানে এসেছিলেন অসংখ্য মুসলিম ব্যবসায়ী ও ইসলাম প্রচারক। তাঁরা ইসলাম প্রচার ও জনগণের কৃষ্টি-কালচার পরিবর্তন করেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগেই চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী আরাকানসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী বিভিন্ন বন্দর যেমন মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, চীন, থাইল্যান্ডে ইসলাম প্রচার হতে থাকে। গড়ে ওঠে একটি মুসলিম নৌ-এলাকা। এ নৌ পথেই চট্টগ্রাম হয়ে ইসলাম বাংলায় প্রথম প্রবেশ করে। এজন্যই চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

www.pathagar.org

বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতি

যমুনা নদী

বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতি

অপরূপ সৌন্দর্যের আধার বাংলাদেশ। উর্বরা পললভূমিতে বেড়ে উঠা গাছে গাছে পাখিদের প্রাতঃ-সন্ধ্যা সঙ্গীত, একেবেঁকে চলা রূপালী নদীগুলো, দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ে সবুজের হাতছানি পাহাড়ের গা ফুঁড়ে বের হওয়া অসংখ্য ঝর্ণা, বিশাল বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র অবগাহন, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-বাদল, শিশির স্নিগ্ধতা, হিমেল আমেজ আর বসন্ত মুগ্ধতা নিয়েইতো ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ। রংতুলিতে আঁকা ছবির মত সম্রাট হুমায়ুনের জান্নাতাবাদ বাংলাদেশ আজ ফারাক্কার মরণছোবলে কিছুটা বিবর্ণ হলেও বিশ্বে এখনো অনন্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় আমাদের গৌরবের দেশ।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

Bango-Basin বা বঙ্গখাতে পলি জমে বাংলাদেশী ভূ-খণ্ডের উৎপত্তি। টারশিয়ারী যুগের শিলা, প্লায়স্টেসিন যুগের সোপান এবং পরবর্তীকালের পলল থেকে মৃত্তিকা গঠিত। মাটির P^H মান ৪ থেকে ৭.৫ পর্যন্ত। অধিকাংশ এলাকা পলল গঠিত সমভূমি (১,২৪,২৬৬ বর্গ কিমি), বেলে পাথর শেলপাথর, কাদা দ্বারা গঠিত পাহাড়গুলোর অধিকাংশ টারশিয়ারী যুগের। গড় উচ্চতা ২,০৫০ ফুট; সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয় (তাজিনডং)। পাহাড়ে ৩৩টি উপজাতির বসবাস। দেশে প্রবাহিত ২৩০টি নদীর মোট দৈর্ঘ্য১১,৭৩৯ কিমি। জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেমি। সিলেটের লালখানে সর্বোচ্চ (৬৩৭.৫ সেমি), নাটোরের লালপুর সর্বনিম্ন (১১৭.৫ সিমি) বৃষ্টিপাত হয়। গড় তাপমাত্রা ২৫° সে। মোট স্থলভাগের ১৭% বনভূমি। ৩,৬৬,৭০,০০০ একর জমির মধ্যে ২,০১,৯৮,০০০ একর আবাদী জমি (৬২%)। বিশ্বে বাংলাদেশ পাটে ২য়, ধানে ৪র্থ, চায়ে ৮ম, আমে ১৩তম উৎপাদনকারী দেশ। ৫টি অঞ্চলের ২২টি গ্যাস ফিল্ডের ৪৪টি কূপ থেকে উত্তোলন করা হয়। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১০.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ৫টি কয়লা, ২টি পিট কয়লা, ৬টি শক্ত পাথর, ৩টি চুনা পাথরের খনিসহ আরোও অনেক প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

আবহমান বাংলা ঃ মাঠের পর মাঠ ভরা সবুজের সমারোহ, পুকুর-খাল-বিল-নদী-নালা, গাছ-গাছালির ঝোপ-ঝাড়, হরেক রকম পাখ-পাখালির ঐকতানে পুরো বাংলাই যেন এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র। ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং থেকে শুরু করে নতুন কোন পর্যটক প্রথম দর্শনেই তন্ময় হয়ে যান বাংলার অপরূপ দৃশ্য দেখে।

আবহমান বাংলা

চলন বিল ঃ বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য বিল ও হাওর রয়েছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত এসব বিল-হাওড় কৃষিক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখে। এছাড়া মাছে-ভাতে বাঙালীর জন্য মিষ্টি পানির নানা জাতের মাছ সরবরাহ করে এসব বিল ও হাওর। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল চলনবিল উত্তরবঙ্গের বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তবে পাবনা ও নাটোরে বড় অংশ প্রবাহিত। একদিকে উচ্চ অংশ প্রবাহিত। একদিকে উচ্চ বরেন্দ্রভূমি, অন্যদিকে বিশাল চলনবিল যেন প্রকৃতির এক অপরূপ দান। খুলনার ডুমুরিয়ার বিল ডাকাতিয়া, সিলেটের তামাবিলও বিখ্যাত। সিলেটের হাকালুকি হলো হাওড়গুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ।

চলন বিল

www.pathagar.org

সূর্যাস্ত অপরূপ দৃশ্য ঃ হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন গঙ্গার মূল শাখা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করে। বাংলাদেশের ইতিহাস- সংস্কৃতি- জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রমত্তা পদ্মা আজ ফারাক্কার মরণফাঁদে মৃতপ্রায়। পদ্মা বিধৌত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আজ ধু ধু বালুচর।

পদ্মায় সূর্যাস্ত

চা বাগান ঃ চা বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। ছোট বড় মিলিয়ে ১৫৮ টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৪ টি সিলেট অঞ্চলে। সর্বাধিক ৯১টি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। চা রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ৮ম। বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৪.৫ কোটি কেজি। চা বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

চা বাগান

রমনা পার্ক ঃ ১৯৪৯ সালে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ৭৩ একর আয়তনের মনোরম রমনা পার্ক যেন ইটের ঢাকায় সবুজের হাতছানি। পার্ক জুড়ে এঁকেবেকে চলা ৮০০ মিটার লম্বা লেক এবং ১২৪ প্রজাতির শত শত গাছ পার্কটিতে চমৎকার নৈসর্গিক আবহ তৈরি করেছে। নগরবাসী ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঢাকার বিষাক্ত বায়ু থেকে পরিত্রাণ পেতে একটু পরিচ্ছন্ন বায়ুর জন্য এখানে সকাল-সন্ধ্যায় ভীড় জমায়।

জাফলং

জাফলং ঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। স্রষ্টা যেন আপন হাতে সাজিয়েছেন এ ভূমিকে। সবুজ টিলা আর পাহাড়ী নদীর মায়া জড়ানো সিলেটের জাফলং সৌন্দর্যপিয়াসীদের মন হরণ করে। আকাশসম উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর পানিতে বয়ে আসা অসংখ্য পাথর চিরকাল প্রকৃতি প্রেমিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এ পাথর এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার মাধ্যমও বটে।

বলা লেক

বলা লেক ঃ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক সুপেয় পানির এ হ্রদটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতন এ হ্রদটি বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রমনা পার্ক
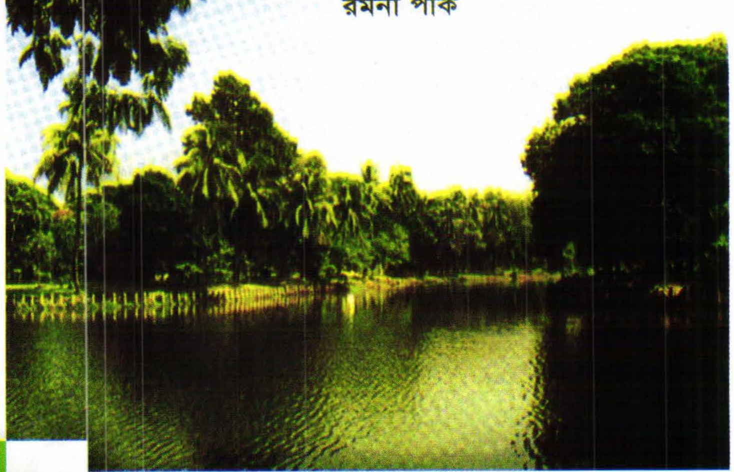

www.pathagar.org

জুম চাষ ঃ উপজাতিদের আদি চাষ পদ্ধতি এই জুম চাষ। উপজাতিরা চাষের মৌসুমে পাহাড়ের ঢালের একটি স্থানকে নির্ধারণ করে প্রথমে আগুন ধরিয়ে সবধরনের ঘাস-আগাছা পুড়িয়ে পরিষ্কার হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে একই সঙ্গে কয়েক প্রকার বীজ বপন করে। চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা, তিল প্রধান। বছরে দু'বার চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ভাল ফসল পেলেও সার্বিকভাবে এটি খুবই ক্ষতিকর। এতে ভূমি ক্ষয় এবং বনভূমি উজাড়ের ফলে বিরানভূমিতে পরিণত হয়।

জুম চাষ

সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল ঃ সাঙ্গু নদীটি বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তের আরাকান পাহাড় থেকে উৎপত্তি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন এবং বাংলাদেশের জলসীমায় শেষ হওয়া দুটি নদীর মধ্যে এটি একটি। ২৪৪ কি.মি. দীর্ঘ এ নদীটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। আকাশ থেকে তোলা উপরের ছবিতে সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল ও এর আশেপাশের পাহাড়ী উপজাতিদের বসতি দেখা যাচ্ছে। হালদা নামক অপর নদীটি খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলি পর্বতশৃঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলি নদীতে পতিত হয়েছে।

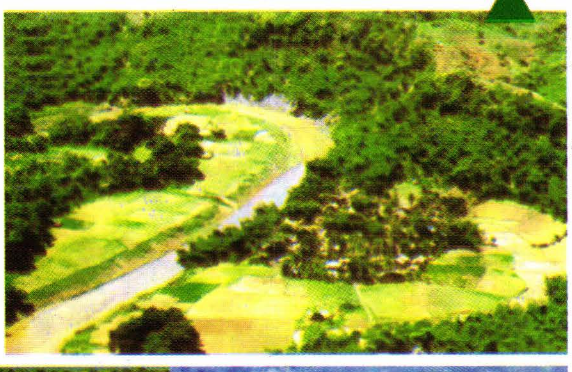
সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল

প্রবাল

সেন্টমার্টিন

কুয়াকাটা ঃ দক্ষিণবাংলার পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত বিশাল নারকেল বাগান ও নয়নজুড়ানো বালিয়াড়ি সমৃদ্ধ কুয়াকাটা বিশ্বের একটি বিরল সমুদ্র সৈকত, যেখান হতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়। ১৮ কি.মি. দীর্ঘ এ সৈকতের মূল সৌন্দর্য ২০০ একর জুড়ে বিস্তৃত কাব্যময় নারকেলবীথী, কুয়াকাটার অভিন্ন আত্মীয় জেলেপাড়া ও রাখাইন বসতি। এছাড়া ১৫৫ কি.মি. দৈর্ঘ্যের পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার বাংলাদেশের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ।

কুয়াকাটার সূর্যোদয়

সুন্দরবন ঃ বিশ্ব ঐতিহ্যের ৫২২তম তালিকাভুক্ত বাংলাদেশের জাতীয় বন সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। এটি বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা এই ৫টি জেলাকে স্পর্শ করেছে। ৫৫৭৫ বর্গকি.মি. আয়তনের এ বনটি টাইডাল বা জোয়ার ভাটার বনও। ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী এবং সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, বাইন, গোলপাতা, পশুর প্রভৃতি অসংখ্য গাছপালা একে মোহনীয় করেছে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন স্পটে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে মূলতঃ চারধরনের বন রয়েছে- পাহাড়ী বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বন, সমতল ভূমির শালবন, গ্রামীণ বন। ১২০০০ বর্গকি.মি. আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল। মোট ৩৬টি জেলায় রাষ্ট্রীয় বনভূমি রয়েছে।

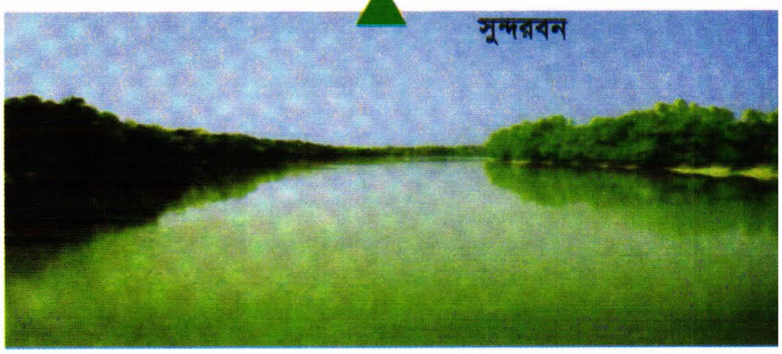
সুন্দরবন

সেন্টমার্টিন ঃ অসংখ্য নারকেল গাছে ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বীপ সেন্টমার্টিনের এক সময় নাম ছিল নারিকেল জিঞ্জিরা। বিশ্বের গুটিকয় প্রবালদ্বীপের অন্যতম ৩.৮ বর্গমাইলের সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এখানে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন টন চুনাপাথর মজুদ আছে। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে বাংলাদেশে অসংখ্য মনোরম দ্বীপ রয়েছে। তন্মধ্যে ৯০.৬৫ বর্গকি.মি. আয়তনের নিঝুম দ্বীপ সমুদ্র সৈকত, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত এবং পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা। হাতিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, মনপুরা, সন্দ্বীপ, সোনাদিয়া বিখ্যাত দ্বীপ।

www.pathagar.org

রিজুক ঝর্ণা ঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশে বাংলাদেশে অসংখ্য জলপ্রপাত-ঝর্ণা রয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত ৭০ ফুট উচ্চতার এ রিজুক ঝর্ণাটি বাংলাদেশের ২য় উচ্চতম। ২৫০ ফুট উচ্চতার মাধবকুণ্ড উচ্চতম জলপ্রপাত হিসেবে বিখ্যাত হলেও বান্দরবানে লোকচক্ষুর আড়ালে অসংখ্য ঝর্ণা রয়েছে। চুম্পি, বাকত্লাই, ত্লাবং, রুমানাপাড়া, নাইনয়, সানক্রাই, ফ্লিন্ডপুং তুলপেসহ অসংখ্য ঝর্ণা রয়েছে। এছাড়া সিতাকুন্ডে গরম পানির ঝর্ণা রয়েছে।

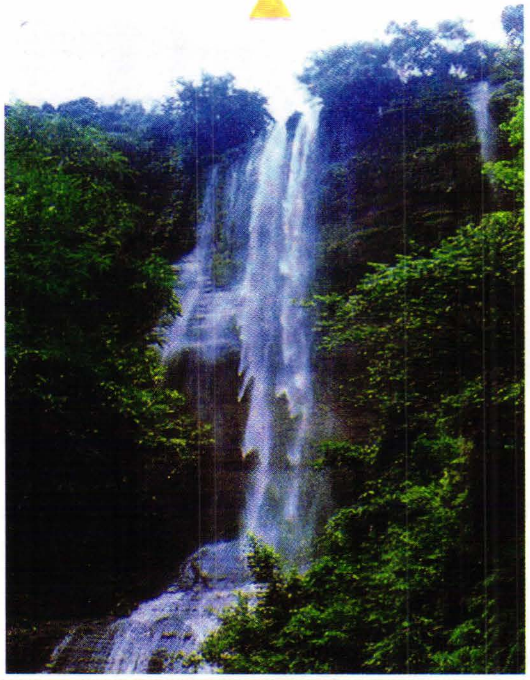

রিজুক ঝর্ণা

বিজয় (তাজিনডং) ঃ আকাশ থেকে তোলা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিনডং এর একাংশ। ৩১৮৫ ফুট উঁচু এ চূড়াটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। মারমা শব্দ তাজিনডং এর অর্থ গভীর অরণ্যের পাহাড়। পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা বান্দরবান প্রকৃতির অপরূপ দান। চিরহরিৎ বনাঞ্চল বলে খ্যাত বান্দরবান তথা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল বলে।২৯২৮ ফুট উঁচু কেওক্রাডং এবং ৩য় উচ্চতম শৃঙ্গ চিম্বুকও বান্দরবানে অবস্থিত। টারশিয়ারী যুগে গঠিত ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের পাহাড়গুলো উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

বিজয় (তাজিনডং)

সীমান্তবর্তী অভিন্ন নদী

১. রায়মঙ্গল	২০. বুড়ি তিস্তা	৩৯. সোনাই-বারদাল
২. ইছামতি-কালিন্দি	২১. তিস্তা	৪০. জুড়ি
৩. বেতনা-কোদালিয়া	২২. ধরলা	৪১. মনু
৪. ভৈরব-কপোতাক্ষ	২৩. দুধকুমার	৪২. ঢালাই
৫. মাথা-ভাঙ্গা	২৪. ব্রহ্মপুত্র	৪৩. লুঙ্গিয়া
৬. গঙ্গা	২৫. জিঞ্জিরাম	৪৪. খোয়াল
৭. পাগলা	২৬. চিল্লাখালি	৪৫. সুতাং
৮. আত্রাই	২৭. ভুগাই	৪৬. সোনাই
৯. পুনর্ভবা	২৮. নাটাই	৪৭. হোয়রা
১০. তেতুলিয়া	২৯. সনেস্বরী	৪৮. বিজনি
১১. ট্যাঙ্গন	৩০. যাদুকাটা	৪৯. সালদা
১২. কুলীক	৩১. ঝালকাটি-ধামলিয়া	৫০. গোমতী
১৩. নাগর	৩২. নয়াগঞ্জ	৫১. কাকরী-ডাকাতিয়া
১৪. মহানন্দা	৩৩. উমলাম	৫২. সেলোনিয়া
১৫. ডাহুক	৩৪. ঢালা	৫৩. মুহুরী
১৬. করতোয়া	৩৫. পিয়াইন	৫৪. ফেনী
১৭. তালমা	৩৬. সারি-গোয়াইন	৫৫. মাতামুহুরী
১৮. ঘোড়ামারা	৩৭. সুরমা	৫৬. নাফ
১৯. দেওনাল-যমুনাস্বরী	৩৮. কুশিয়ারা	

অভিন্ন নদীর মধ্যে ৫৪ ক্রমিক পর্যন্ত নদীগুলোতে ভারত বাঁধ দেয়ায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং উত্তরবঙ্গসহ বিরাট একটি অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

তোমরা তোমাদের মহান রবের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে
আল কুরআন

www.pathagar.org

মহাবিশ্ব
(Revealing the Secrets of the Universe)

মহাবিশ্ব ঃ আমাদের পরিচিত এই মহাবিশ্বে প্রায় ১০ হাজার কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে। এরা গুচ্ছাকারে মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে, তবে এসব গ্যালাক্সি একে অন্যের থেকে অভাবনীয় বিশাল দূরত্বে রয়েছে।

মহাবিশ্বের আকৃতি ঃ মহাবিশ্বের বর্তমান ব্যাপ্তি প্রায় ২৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। আলো এক সেকেন্ডে অতিক্রম করে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার কিলোমিটার। এই আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় এক আলোকবর্ষ। সে হিসেবে এক আলোকবর্ষ সমান হচ্ছে প্রায় ৯,৪৬১ বিলিয়ন কিলোমিটার।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ঃ আজ থেকে ১৩০০ কোটি বছর আগে এক বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাং' (Big Bang) । বিগ ব্যাং এর প্রায় ৩ লক্ষ বছর পরে পদার্থ কণিকা তার বর্তমান রূপ লাভ করে। এর আগে পদার্থ পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র কণিকায় বিরাজমান ছিল। বিগ ব্যাং এর প্রায় ৯.২ মিলিয়ন বছর পর প্রাণের সৃষ্টি হয় এই মহাবিশ্বে।

মহাবিশ্বের পরিণতি ঃ মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিডম্যান তিনটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এডউইন হাবল আবিষ্কার করেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা আসল 'বিগ ব্যাং'- এরই ফল

ফ্রিডম্যানের প্রথম মডেল অনুযায়ী এই প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, অর্থাৎ গ্যালাক্সীসমূহ একটি ত্বরণে পরস্পর থেকে দূরে সরতে থাকবে। দ্বিতীয় মডেল অনুযায়ী, এই প্রসারণ ক্রমান্বয়ে থেকে যাবে এবং মহাবিশ্ব একটি স্থিতিশীল আকৃতি পাবে।

তৃতীয় মডেল অনুযায়ী, মহাবিশ্বের কৃষ্ণবস্তুর প্রবল মহাকর্ষ বলের কারণ একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হবে এবং 'বিগ ব্যাং' এর বিপরীত 'বিগ ক্রাঞ্চ' (Big crunch) বা বৃহৎ সংকোচনের মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃহৎ সংকোচন এড়িয়ে যাবার মত ত্বরণ গ্যালাক্সীগুলির রয়েছে।

কয়েকজন খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী

স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ঃ মহাকর্ষ বলের সূত্রের সাহায্যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম বলেন যে, মহাকর্ষ বল গ্রহগুলিকে তাদের কক্ষপথে ধরে রেখেছে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) ঃ ১৯০০ সালে তাঁর কোয়ান্টাম থিওরি প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, আলোকে তরঙ্গ/কণিকা উভয় রূপেই ধারণা করা যায়।

আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) ঃ তাঁর যুগান্তকারী আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রমাণ করেছিল যে, আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি এবং পদার্থ ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য।

এডউইন হাবল (১৮৮৯-১৯৫৩) ঃ তাঁর পর্যবেক্ষণে আবিস্কৃত হয় যে, মহাবিশ্ব ক্রম সম্প্রসারণশীল।

স্টিফেন হকিং (জন্ম ১৯৪২) ঃ ব্ল্যাকহোলের কোয়ান্টাম প্রকৃতি ও মহাকর্ষ বলের রূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।

আরব ও উপমহাদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী

আল ফারগানী ঃ নবম শতাব্দীর খ্যাতিমান আরব জ্যোতির্বিদ। তিনি খলিফা আল-মামুন এর দরবারের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। তাঁর রচিত "জ্যামি এলমুল নজুম ওয়াল হরকত আল মামাযিয়া" গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় "Elements of Astronomy" নামে অনুদিত হয়। তিনি সৌরজগতের ৪টি গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করেছিলেন।

আল খারেজমী ঃ বীজগণিতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আলজিবর ওয়াল মুকাবিলা" থেকেই অ্যালজেবরা (Algebra) নামটির উৎপত্তি। তিনি আকাশের মানচিত্র প্রণয়ন করেন এবং "ফিজিজ" নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল বেরুনী ঃ একাদশ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর রচিত "কানুনে মাসউদী"তে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ইবনে ইউনুস ঃ দশম শতাব্দীর এই জ্যোতির্বিদ একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকা 'জিজে ইবনে ইউনুস' নামে পরিচিত।

www.pathagar.org

ওমর খৈয়াম ঃ খ্যাতনামা আরব কবি ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম 'জিজ-ই-মালিকশাহী' নামের একটি তারা তালিকা এবং 'তারিখ-ই-জালাল' নামে একটি নিখুঁত পঞ্জিকা রচনা করেন।

আল বাত্তানী ঃ মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে যার নাম পশ্চিমা বিশ্বে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়, তিনি হলে আল-বাত্তানী। পাশ্চাত্য জগতে ইনি Albategnius নামে পরিচিত। আল বাত্তানীই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, সূর্যের অপভূ স্থির নয়, তার অগ্রগমন আছে। তিনি গ্রহসমূহের দূরত্বও নির্ণয় করেন। এছাড়া চান্দ্র মাসের সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক ট্রপিকাল বৎসরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন।

জাবির ইবনে আফলাহ ঃ জ্যোতির্বিদ্যাতে জাবির টলেমীর মতবাদকে ভীষণভাবে সমালোচনা করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত নয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইবনে তোফায়েল ঃ টলেমীর মতবাদের বিরুদ্ধবাদী দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম ইবনে তোফায়েল। তিনি গ্রহসমূহের অবস্থানের ক্রমও পরিবর্তন করেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ঃ ব্রহ্মগুপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ করে তার ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে বলেছেন "পৃথিবী গোলাকার এবং এ সম্বন্ধে অন্য যা কিছুই বলা হোক না কেন, সে সমস্ত মিথ্যা।"

আর্যভট্ট ঃ প্রখ্যাত উপমহাদেশীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত "শিষ্রধীবৃদ্ধি" গ্রন্থটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। আর্যভট্ট 'শূন্য' আবিষ্কারের জন্য গণিতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বরাহমিহির ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত উপমহাদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির। 'বৃহৎ-সংহিতা' নামে একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

অতএব তোমরা প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

চন্দ্র টেলিস্কোপের গৃহীত 'ক্রাব নেবুলা' নামক নিহারিকার ছবি।

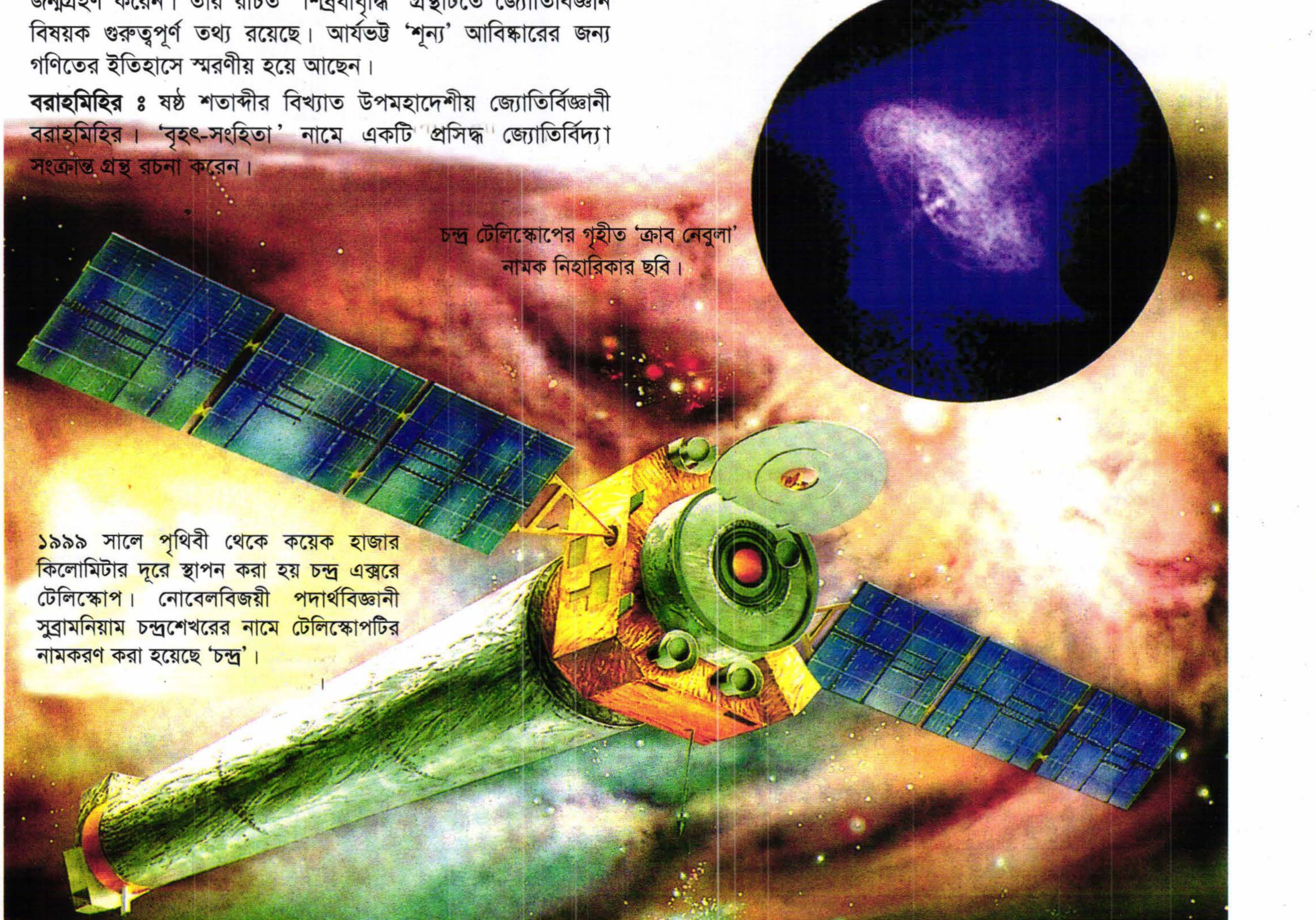

১৯৯৯ সালে পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে স্থাপন করা হয় চন্দ্র এক্সরে টেলিস্কোপ। নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখরের নামে টেলিস্কোপটির নামকরণ করা হয়েছে 'চন্দ্র'।

www.pathagar.org

জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) : মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও এতে বিদ্যমান বস্তুসমূহ, যেমন- গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, ধূমকেতু, গ্রহাণু এবং ছায়াপথসমূহের গতিবিধি পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞানই হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা।

৩৩৫-৩২৩, খ্রিষ্টপূর্ব অ্যারিস্টটল (Aristotle) : এই গ্রীক পদার্থবিদ ও দার্শনিক পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে অভিহিত করেন। পনেরশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশ্বাসটি জনমনে প্রচলিত ছিল।

১৩৭-১৪৫, টলেমী (Ptolemy) : এই গ্রীক জ্যোতির্বিদ ১০৮০টি তারকার অবস্থান সনাক্ত করেন এবং তাদেরকে ৪৮টি নক্ষত্রপুঞ্জে বিভক্ত করেন। তাঁর বই-এ তিনি এটি প্রকাশ করেন। তিনি অ্যারিস্টটলের মতবাদকে ভিত্তি হিসেবে ধরেন এবং এটি এক হাজার চারশত বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

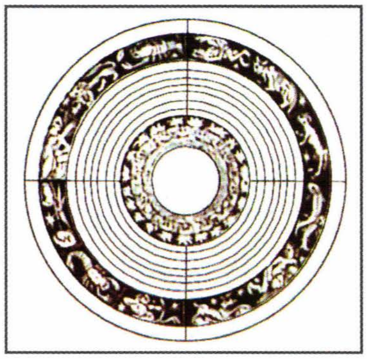

অ্যারিস্টটলের মহাবিশ্ব

১৫৪৩, নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicholas Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩) : এই পোলিশ জ্যোতির্বিদ তাঁর 'De Revolutionibus Orbium caelestium' বইটিতে সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে অভিহিত করেন।

১৫৯৬ টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১) : এই ড্যানিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৫৭৫ থেকে ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দৃশ্যমান তারকার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা থেকে ৭৭০টি তারকার সুস্পষ্ট অবস্থান সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

১৬০৮, প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র : জার্মান বিজ্ঞানী হ্যান্‌স লিপারসে (Hans Lippershey, ১৫৭০-১৬১৯) সামরিক কার্যে ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ : জার্মান জ্যোতির্বিদ, জোহান্‌স কেপলার (Johannes Kepler, ১৫৭১-১৬৩০) গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণনের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহসমূহের বৃত্তাকার গতিপথের মতবাদটি ভুল প্রমাণিত হয়।

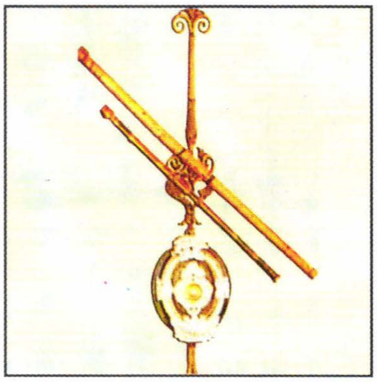

সপ্তদশ শতাব্দীর টেলিস্কোপ

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ : ইতালীর বিজ্ঞানী এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহারকারী গ্যালিলিও (Galileo) (১৫৬৫-১৬৪২) বৃহস্পতিবার চন্দ্র আবিষ্কার করেন এবং সৌরকলঙ্ক (Sunspots) ও চাঁদের গর্ত সনাক্ত করেন। তিনি দেখান যে, শুক্র গ্রহ এবং চন্দ্র একই কলায় (সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বিবেচনা করে) অবস্থিত।

১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দ : ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন (Isaac Newton, ১৬৪২-১৭২৭) মহাকর্ষ সূত্র প্রকাশ করেন। এর ফলে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথম প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ : ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এডমন্ড হ্যালী (Edmund Halley).

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ : জার্মান সঙ্গীতবিদ উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) ইউরেনাস (Uranus) গ্রহটি আবিষ্কার করেন। এর ছয় বছর পর তিনি এই গ্রহের চারটি চাঁদের অস্তিত্ব বের করেন। তিনি যুগ্ম তারকা, (Binary Stars), অনেক নীহারিকা ও গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং অনেক ছায়াপথের অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

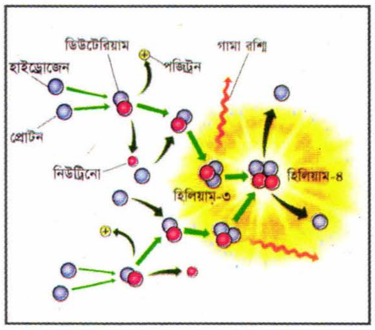

হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ফিউশন

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ : জার্মান জ্যোতির্বিদ ইয়োহান গ্যালে (Johann Galle, ১৮১২-১৯১০ এবং হাইনরিখ ডি'এরেস্ট (Heinrich D'Arrest, ১৮২২-১৮৭৫) নেপচুন (Neptune) গ্রহ আবিষ্কার করেন।

১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ : হার্ভার্ড মানমন্দির (Harvard Observatory, USA) -এ সর্বপ্রথম তারকার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ : জার্মান বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein, ১৮৭৯-১৯৫৫) দেখান যে, ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। এই তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের উজ্জ্বলতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্যের ফিউশন (Fusion) প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন অণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

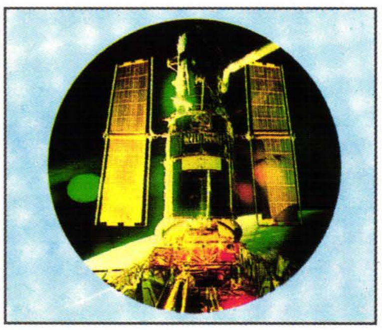

হাবল টেলিস্কোপ

www.pathagar.org

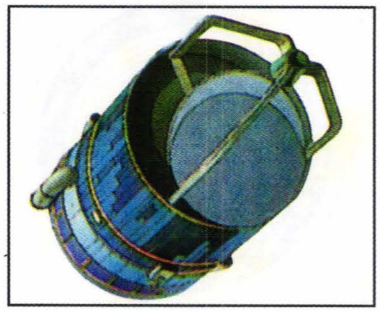

জিওত্তো মহাকাশ যান

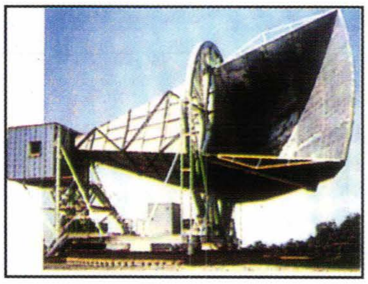

মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের রেডিও এন্টেনা

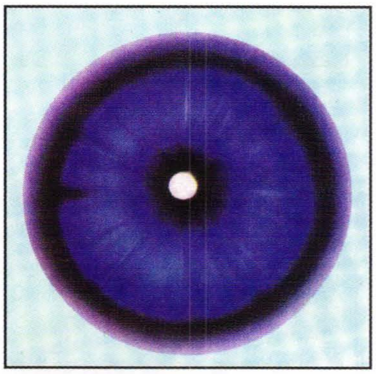

গ্রহজাত নীহারিকা

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ ঃ সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব (Expanding Universe) সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন আমেরিকার জ্যোতির্বিদ ভেস্তো স্লাইফার (Vesto Slipher, ১৮৭৫-১৯৬৯)।

১৯২৪-৩০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ স্বতন্ত্রভাবে মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) প্রদান করেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী অ্যাবে লেমাতর (Abbe Lemaitre, ১৮৯৪-১৯৬৬) এবং রাশিয়ান বিজ্ঞানী এ. ফ্রিডম্যান (A. Friedmann, ১৮৮৫-১৯২৫)।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডইউন হাবল (Edwin Hubble) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান জ্যোতির্বিদ ক্লাইড টমবাফ (Clyde Tombaugh)প্লুটো (Pluto) গ্রহ আবিষ্কার করেন।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান প্রকৌশলী কার্ল জ্যান্সকি (Karl Jansky, ১৯০৫-৫০) পৃথিবীর বাইরে বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। তার উদ্ভাবিত আকাশ-তার (aerial) ছায়াপথ হতে বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করেছিল।

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias, জন্ম ১৯৩০) এবং রবার্ট উইলসন (Robert Wilson, জন্ম ১৯৩৬) মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ আবিষ্কার করেন।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রী জোসেলিন বেল (Jocelyn Bell, জন্ম ১৯৪৩) প্রথম পালসার (Pulsar) সনাক্ত করেন।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জিওত্তো মহাকাশ যান (Giotto space probe) প্রথম ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের (হ্যালির ধূমকেতু) আলোকচিত্র প্রেরণ করে।

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ সর্বপ্রথম বৃহৎ প্রতিফলক টেলিস্কোপ, হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে স্থাপন করা হয়। এটির সাহায্যে মহাবিশ্বের পরিষ্কার আলোকচিত্র ধারণ করা হয়।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দ ঃ বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়।

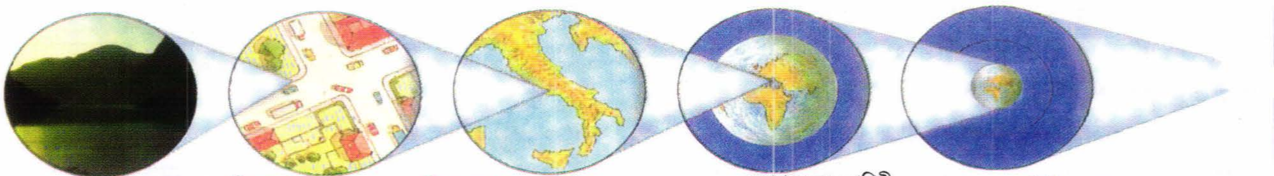

ভূমিস্তর

নিম্ন অক্ষাংশ হতে উড়ন্ত অবস্থায় ১ কি.মি.

উচ্চ অক্ষাংশে আবর্তিত অবস্থায় ১,০০০ কি.মি.

মহাশূন্য হতে পৃথিবী (১০০,০০০ কি.মি)

পৃথিবী ও চন্দ্র (১ মিলিয়ন কি.মি.)

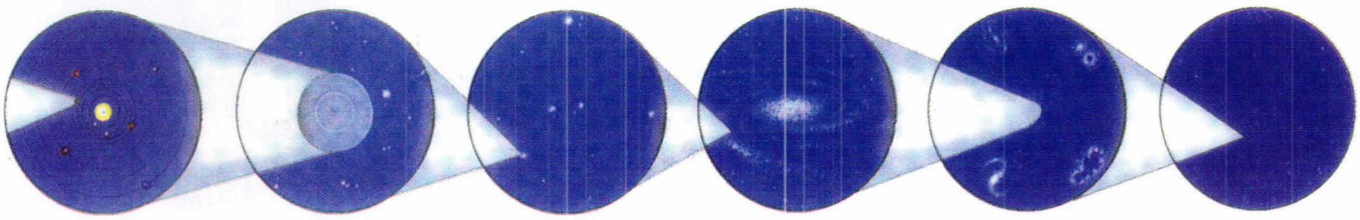

সৌরজগৎ (১০ বিলিয়ন কি.মি.)

নক্ষত্রমণ্ডল (১,০০০ বিলিয়ন কি.মি)

নিকটবর্তী তারাসমূহ (১০০ আলোকবর্ষ)

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি (১০০,০০০ আলোকবর্ষ)

গ্যালাক্সিপুঞ্জ (৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ)

জানা মহাবিশ্বের (২৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ)

www.pathagar.org

তথ্য কণিকা
(Data Bank)

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ ঃ গ্যালাক্সি হলো অজস্র তারার পরিবারের মত। গ্যালাক্সি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমাদের মিল্কিওয়ে একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এছাড়াও উপবৃত্তাকার, অসম, বার্‌ড, ক্যানিবাল প্রভৃতি ধরনের গ্যালাক্সি রয়েছে।

মিল্কিওয়ে

বার্‌ড স্পাইরাল

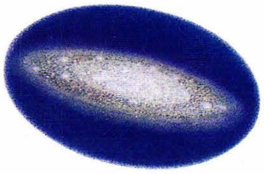
উপবৃত্তাকার

অসম

ক্যানিবাল

কোয়েসার পরিচিতি ঃ কোয়েসার হচ্ছে দূরবর্তী গ্যালাক্সির প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এদের অভ্যন্তরে কৃষ্ণগহ্বর থাকে। আমাদের জানা মহাবিশ্বের দূরতম বস্তু হলো PC 1247+3106 নামের কোয়েসার, যা ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। প্রথম আবিষ্কৃত এবং নিকটতম কোয়েসার হলো 3C-273। এটি ২০০ কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত।

নিকটতম গ্যালাক্সিসমূহ

গ্যালাক্সী	ধরন	ভর (বিলিয়ন সৌর ভর)	দূরত্ব (আলোকবর্ষ)
অ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda M31)	স্পাইরাল	৩০০	২,৫০০,০০০
মিল্কিওয়ে (Milky way galaxy)	স্পাইরাল	১৫০	০
ট্রায়াঙ্গুলাম (Galaxy in Triangulum M33)	স্পাইরাল	১০	২,৫০০,০০০
বৃহৎ ম্যাগিলান মেঘ (Large magellanic cloud)	অসম	১০	১৬০,০০০
এন. জি. সি ২০৫ (NGC 205)	উপবৃত্তাকার	১০	২,৫০০,০০০
এন.জি. সি ২২১ (NGC 221)	উপবৃত্তাকার	৩	২,৫০০,০০০
ক্ষুদ্র ম্যাগিলান মেঘ (Small magellanic cloud)	অসম	২	১৯০,০০০
এন.জি.সি ১৮৫ (NGC 185)	উপবৃত্তাকার	১	২,০০০,০০০
এন. জি. সি ১৪৭ (NGC 147)	উপবৃত্তাকার	১	১,৯২০,০০০

নিকটতম কোয়েসার 3C-273

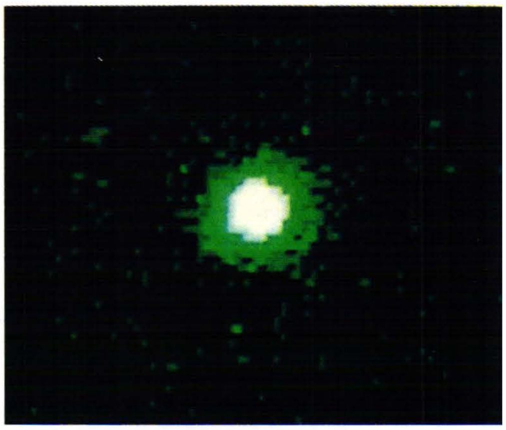

সূর্যের পরিসংখ্যান

বয়স	৫০০ কোটি বছর
ব্যাস	১৩,৯২,০০০ কি.মি.
ভর	পৃথিবীর ৩,৩২,৯৪৬ গুণ
ঘনত্ব	পানির ঘনত্বের ১.৪১ গুণ
পৃথিবী থেকে দূরত্ব	১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কি.মি.
নিকটতম তারার দূরত্ব	৪০,০০০ বিলিয়ন কি.মি.
কেন্দ্রের তাপমাত্রা	১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস
পৃষ্ঠের তাপমাত্রা	৫,৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস
উজ্জ্বলতা	৩৯০ বিলিয়ন বিলিয়ন মেগাওয়াট
গতি	গ্যালাক্সিকে আবর্তন করতে ২৪ কোটি বছর লাগে

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

বয়স	প্রায় ১১ বিলিয়ন বছর
তারকা সংখ্যা	২০০ বিলিয়ন
ব্যাস	১ লক্ষ আলোকবর্ষ
কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব	২৫,০০০ আলোকবর্ষ
সূর্যের কক্ষপথে আবর্তন কাল	২৪০ মিলিয়ন বছর

www.pathagar.org

তারা পরিচিতি ঃ তারা হচ্ছে বিশাল গোলকাকৃতির হাইড্রোজেন এর অগ্নিকুণ্ড। মহাকর্ষ বলের কারণে তারা স্থির থাকে। তারার অভ্যন্তরে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং এর ফলে প্রচুর তাপ ও আলোক শক্তি উৎপন্ন হয়।

"এস্কিমো নেবুলা" এক প্রকার গ্রহজাত নীহারিকা (Planetary Nebula)

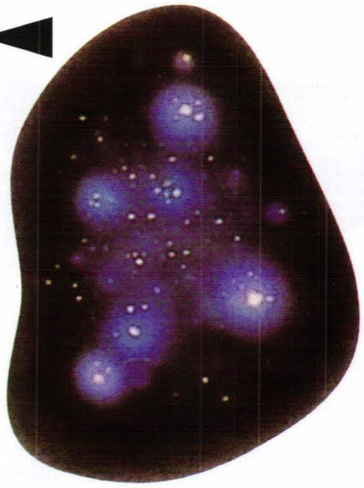

সবচেয়ে অনুজ্জ্বল তারা ঃ RG 0058,8-207, এটি একটি বাদামী তারা, এর উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতার ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

উজ্জ্বলতম সুপার নোভা ঃ SN 1006, 1006 খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এটি দেখা গিয়েছিল। তারাটি এত উজ্জ্বল ছিল যে দিনের বেলাতেও দেখা যেত।

দ্রুততম পালসার ঃ PSR 1937+214, যার ঘূর্ণন বেগ সেকেন্ডে ৬৪২ বার।

লোহিত বামন তারার ব্যাস ঃ সূর্যের চেয়ে ১০০ গুণ পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে।

সুপার নোভার নির্গত শক্তি ঃ সূর্যের ৯ বিলিয়ন বছরে নির্গত শক্তি সুপার নোভা নির্গত করে ১ মিনিটে।

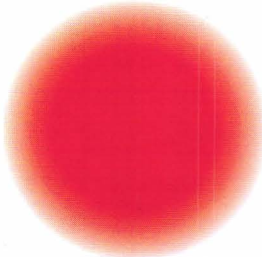

রক্তিম দৈত্য (Red Giant) ঃ যখন সূর্যের ন্যায় কোন তারকার হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘাটতি হয়, তখন এটির স্ফীতি ঘটে এবং এটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির শীতল তারকায় রূপান্তরিত হয়।

খোলা ঝাড় (Open Cluster) ঃ গঠনশীল তারকার একটি দলকে খোলা ঝাড় বলা হয়।

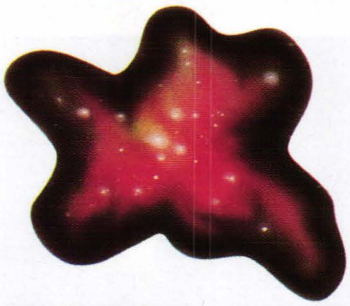

নীহারিকা (Nebula) ঃ হাইড্রোজেন গ্যাস ও ধূলিকণার বিশাল মেঘপুঞ্জ থেকে তারকাসমূহ উৎপন্ন হয়। এ মেঘপুঞ্জকে বলা হয় নীহারিকা।

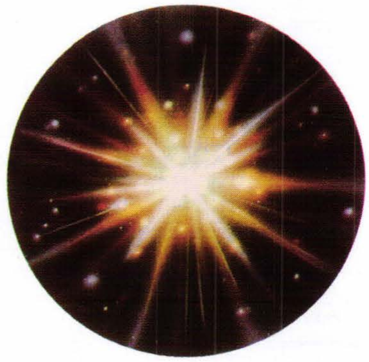

সুপারনোভা (Supernova) ঃ প্রচণ্ড ভরের কোনো তারকার মৃত্যুর সময় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে এটির আকস্মিক সঙ্কোচন ঘটে। এর পরপরই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। একেই সুপারনোভা বলা হয়।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকার একটি আবদ্ধ পুঞ্জে গ্যাস ও ধূলিকণা ঘনসংবদ্ধ থাকে এবং এটি দ্রুত চলে ও উত্তপ্ত হয়। এই আবদ্ধ পুঞ্জ একটি নতুন তারকায় পরিণত হয়।

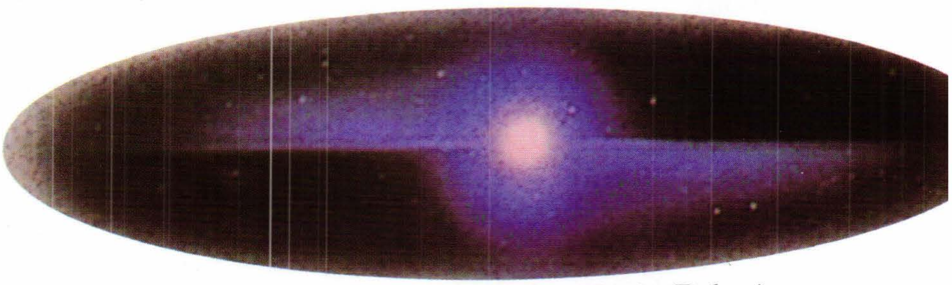

পালসার (Pulsar)

www.pathagar.org

নিকটতম তারা (Nearest Stars)		
তারা (Star)	ধরন (Star type)	পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে দূরত্ব (Distance) (আলোক বর্ষ)
সূর্য (Sun)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	০
প্রক্সিমা সেন্টারি (Proxima Centauri)	লোহিত বামন (Red dwarf)	৪.২
আলফা সেন্টারি A (Alpha Centauri A)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	৪.৩
আলফা সেন্টারি B (Alpha Centauri B)	কমলা প্রধান সারি (Orange main sequence)	৪.৩
বার্নার্ডের তারা (Barnard's Star)	লোহিত বামন (Red dwarf)	৫.৯
উল্‌ফ ৩৫৯ (Wolf 359)	লোহিত বামন (Red dwarf)	৭.৬
লুব্ধক A (Sirius A)	সাদা প্রধান সারি (White main sequence)	৮.৬
লুব্ধক B (Sirius B)	শ্বেত বামন (White dwarf)	৮.৬

উজ্জ্বলতম তারা (Brightest Stars)		
তারা (Star)	ধরন (Star type)	পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে দূরত্ব (Distance) (আলোক বর্ষ)
সূর্য (Sun)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	০
লুব্ধক (Sirius)	সাদা প্রধান সারি (White main sequence)	৮.৬
অগস্ত্য (Canopus)	শ্বেত দৈত্য (White giant)	২০০
আলফা সেন্টারি (Alpha Centauri)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	৪.৩
স্বাতী (Arcturus)	লোহিত দৈত্য (Red giant)	৩৬
আভিজিৎ (Vega)	সাদা প্রধান সারি (White main sequence)	২৬
ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	হলুদ দৈত্য (Yellow giant)	৪২
আর্দ্রা (Rigel)	নীল দৈত্য (Blue giant)	৯১০

সূর্যের পরিচিতি

সূর্যের পৃষ্ঠের ১ বর্গমিটার জায়গা ১০০ ওয়াট ক্ষমতার ৫ লক্ষ বৈদ্যুতিক বাল্বের উজ্জ্বলতা নিয়ে জ্বলে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, সূর্য এক সেকেন্ডে তার ৩৫ মিলিয়ন গুণ বেশি শক্তি নির্গত করে। সূর্যের চৌম্বক ঝড়ের কারণে পৃথিবীতে সম্প্রচারিত রেডিও সিগন্যাল ব্যাহত হয়। সূর্যের নিজ অক্ষে ঘূর্ণনকাল বিষুব অঞ্চলে ২৫ দিন এবং মেরুর কাছাকাছি ৩৫ দিন। সূর্যের অপেক্ষাকৃত শীতল বহিরাবরণ (করোনা) সরিয়ে ফেললে প্রবল বিকিরণে পৃথিবীর সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে।

তারকার মধ্যস্থ গ্যাসের প্রচণ্ড ভরের কারণে উৎপন্ন অভিকর্ষ বল গ্যাসকে কেন্দ্রমুখীভাবে আকর্ষণ করে কিন্তু আলো এবং বিকিরণজনিত চাপ গ্যাসকে কেন্দ্রমুখীভাবে উল্টা দিকে ঠেলা দেয়।

একটি তারকা পুরোপুরি গ্যাস দ্বারা তৈরি

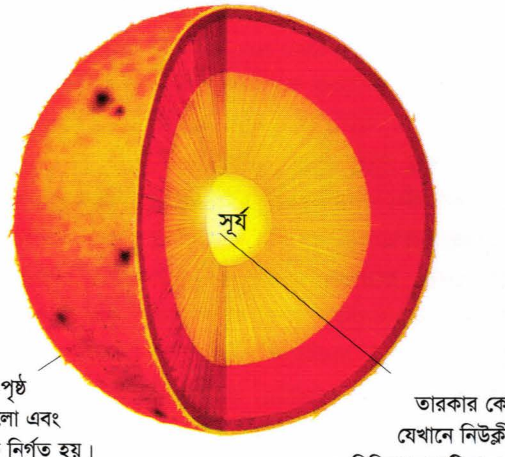

www.pathagar.org

পদার্থবিদগণ চেষ্টা করছেন জানার জন্য যে, কিভাবে মহাবিশ্ব চলে, আর কেন এভাবেই চলে। তবে তৃতীয় উদ্দেশ্য কেন মহাবিশ্ব আছে, কেন এ মহাবিশ্ব, কেন মানুষ, কেন জীবজন্তু, কেন এত সব-এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না বিজ্ঞানের গবেষণাগারে। এ প্রশ্নের উত্তর জানতে তো মানুষ আদিকাল থেকেই আগ্রহী। কেন আমরা এখানে? কেন এই মহাবিশ্ব?

মহাবিশ্ব ও মানুষ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তার জবাব জানা গেছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে। বিজ্ঞান যা বলতে পারেনি, তা-ই আমরা অন্যত্র পেয়েছি। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর **জামাল নজরুল ইসলাম** বলেন -

"পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সেটা আমরা মাত্র গত কয়েক শতাব্দী ধরে জানি। মধ্যযুগের পর এই তথ্যটি উপস্থাপন করেন পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolas Copernicus) (১৪৭৩-১৫৪৩) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক De Revolutionibus Orbium Caelestium-এ (অর্থাৎ আকাশের ঘূর্ণায়মান বস্তুসমূহ)। এটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সনে, তাঁর মৃত্যুর বছরে। তারপরে ইতালীয় জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ জিওর্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno) (১৫৪৮-১৬০০) এবং গ্যালিলিও গ্যালিলাই (Galileo Galilei) (১৫৬৪-১৬৪২) আবার এই বিষয়টি উপস্থাপন করেন, এবার প্রকাশ্যে, কারণ কোপার্নিকাস তাঁর জীবনকালে তাঁর এই ধারণাটি প্রকাশ করেননি। তৎকালীন খ্রিষ্টান চার্চের ধারণা ছিল যে, আকাশের সবকিছু পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। তাই এই কথাগুলি তাঁদের মনঃপুত হয়নি। এই কারণে ব্রুনোকে ১৬০০ সনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং গ্যালিলিওকে তাঁর এই তত্ত্বটিকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমশ এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য হয় এবং অবশেষে সম্পূর্ণ সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন গ্রীকদেশে এ ধারণাটি (অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে) কতিপয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্রস্তাব করেছিলেন। এ কথাটি প্রথম বলেছিলেন গ্রীক জ্যোতির্বিদ সেমসের অ্যারিস্টার্কাস (Aristarchus of Samos) প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০ সনে। তখনও আরেক দার্শনিক ক্লিয়্যানথেস্ (Cleanthes) দাবি করেছিলেন যে, অ্যারিস্টার্কাসকে অসদাচরণের অপরাধে দণ্ডিত করা উচিত। কিন্তু পরে গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি (Ptolemy) (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) পৃথিবী-কেন্দ্রিক তত্ত্বটি এত ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন (অবশ্যই ভুলভাবে) যে, এটা প্রায় দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময় মেনে নেয়া হয়েছিল। মধ্যযুগে খ্রিষ্টান চার্চের গোঁড়ামি সক্রিয় ছিল এবং এই ভুল ধারণার জন্য তা অনেকটা দায়ী ছিল। পৃথিবীর নিজ অক্ষের (Axis) চারদিকে ঘোরার কারণে যে মনে হয় আকাশের বস্তুসমূহ চারদিকে ঘুরছে, এই তত্ত্বটি ভারতের জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক আর্যভট্ট দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হয় প্রায় ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। যে ধরনের গণিত জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাথমিকভাবে ব্যবহার হয়, সেটাতে অবদান রাখেন আর্যভট্ট এবং অন্য এক ভারতীয় গাণিতিক ভাস্করাচার্য (জন্ম ১১১৪ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রাচীন গ্রীক দেশের এবং প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শনের বহনকারী (Transmitters) হিসাবে এবং নিজস্ব অবদানের জন্য (জ্যোতির্বিদ্যায়ও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ইসলামের চিন্তাবিদরা। যেমন আল-খাওয়ারজমী (নবম শতাব্দী), ইবনে সিনা (৯৮০-১০১৭), ইবনে হাইথাম ইত্যাদি। কিন্তু চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে সম্ভবত ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির কারণে ইসলামের চিন্তাবিদরা বিজ্ঞানে ও দর্শনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেননি। তখন থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় এবং সাধারণ বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা।

কোপার্নিকাস অ্যারিস্টার্কাসের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অ্যারিস্টার্কাসের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আশ্চর্যজনক।

আইজাক নিউটনের (Isaac Newton) (১৬৪২-১৭২৭) আবির্ভাব বিজ্ঞান তথা মানব চিন্তার অগ্রগতির জন্য একটি বিরল ঘটনা। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী এবং যুগান্তকারী, মানব সভ্যতার জন্য পথ-নির্দেশক। পৃথিবীর এবং বিশ্বের প্রক্রিয়াসমূহ যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক নিয়মানুযায়ী চলে সম্ভবত নিউটনের অবদানের পরেই এটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য গত এক শতাব্দীতে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে এবং বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'নিউটনীয় বিপ্লব' ও প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন।

মাধ্যাকর্ষণ বল সবসময়ে সক্রিয় থাকে এবং এই কারণে প্রমাণ করা যায় যে, অন্য কোন বস্তুকে যেটা সূর্যের তুলনায় অনেক ছোট, যদি আমরা যথেষ্ট গতিবেগ দেই (Give it sufficient velocity) তাহলে হয়ত সেটা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব থেকে অবশেষে মুক্ত হয়ে দূরে চলে যাবে, অথবা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরবে যতদিন সূর্য থাকবে। সর্বদা বিদ্যমান ও সক্রিয় মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া এই চারদিকে ঘোরার জন্য অন্য কোন অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন হয় না (It does not require any additional force)। এটা নিউটনের গতিসূত্রের একটা পরিণাম, যেটা সঠিকভাবে প্রমাণ করতে হলে কিছু গণিতের প্রয়োজন। গণিতের যে অংশটিকে Differential Calculus বলা হয় সেটার দ্বারা সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই গাণিতিক পদ্ধতি নিউটন স্বয়ং আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য জার্মান দার্শনিক ও গাণিতিক লাইব্‌নিত্‌জ্‌ও (Gottefried Wilhelm Leibniz) (১৬৪৬-১৭১৬) স্বাধীনভাবে Differential Calculus আবিষ্কার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গণিতের যে বিষয়কে আমরা Intergral Calculus বলি, যেটা এক অর্থে এর সম্পূরক, সেটার কিছুটা আভাস ছিল প্রাচীন গ্রীক গাণিতিক আর্কিমিডিসের (Archimedes, প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২ সন) কাজে। (আর্কিমিডিসের পিতা ছিলেন জ্যোতির্বিদ ফেইডিয়াস, Pheidias)।

গ্রহাদির কক্ষপথে উপবৃত্তাকার ঘোরা মাধ্যাকর্ষণ সূত্র থেকে Differential Calculus ছাড়া জ্যামিতিক পদ্ধতিতেও (Geometrical Method) প্রমাণ করা যায়।

www.pathagar.org

যেটা নিউটন তাঁর বিখ্যাত বই Principia তে ব্যাখ্যা করেও ছিলেন। গ্রহগুলির কক্ষপথ যে উপবৃত্তাকার, সেই তথ্যটি নিউটনের আগে থেকে জানা ছিল। এটা যৌথভাবেই নিরীক্ষা দ্বারা (Observation) আবিষ্কার করেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) (১৫৪৬-১৬০১) এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা জার্মান বিজ্ঞানী জোহানেস্ কেপ্লার (Johannes Kepler) (১৫৭১-১৬৩০)। টাইকো ব্রাহের নিরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ করে কেপলার গ্রহগুলির কক্ষপথ সম্পর্কে তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন যেগুলিকে কেপলারের গ্রহের গতিবেগ সূত্র (Kepler's Laws of Planetary Motion) বলা হয়। পরবর্তীকালে নিউটন প্রমাণ করেন যে, কেপলারের গ্রহের গতিবেগ সূত্রসমূহ তাঁর মাধ্যাকর্ষণ সূত্রেরই ফলাফল অথবা পরিণাম।

নিউটনের গতিসূত্রের এবং বলবিদ্যা অথবা গতিবিদ্যার (Dynamics and Mechanics) পেছনে বিরাট অবদান রয়েছে গ্যালিলিওর। গ্যালিলিওর মৃত্যু এবং নিউটনের জন্ম একই সনে হয় (১৬৪২)। নিউটন বলেছিলেন, যদি আমি অন্যদের থেকে দূরে দেখতে পেয়ে থাকি, সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, আমি কতিপয় দৈত্যের কাঁধে চড়েছিলাম (If have been able to see further than any one else this is because I have stood on the shoulders of giants)। যে 'দৈত্যের' কথা নিউটন চিন্তা করেছিলেন তাঁদের নাম (জানা মতে) তিনি উল্লেখ করেননি । সম্ভবত তাঁরা ছিলেন আর্কিমিডিস (Archimedes), গ্যালিলিও (Galileo), টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe), কেপ্লার (Kepler) ও কোপার্নিকাস (Copernicus)।

উপরে দেখা গেলো, বিজ্ঞান এক স্থানে বসে নেই। মত ও তত্ত্বের পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানের এ হলো সীমাবদ্ধতা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে, কুরআন সেই ৭ম শতাব্দীতে বলছে "সূর্য তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত। ইহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত ব্যবস্থা।" (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ঃ ৩৮)। "তিনি (আল্লাহ্) চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত" (সূরা লোকমান, আয়াত ঃ ২৯)। "আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস, চন্দ্র ও সূর্য; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চালনশীল।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৩৩) "সূর্যের সাধ্য নাই চন্দ্রকে সীমার মধ্যে পায়, রাত্রির সাধ্য নাই দিবসকে অতিক্রম করে। প্রত্যেকে স্ব-স্ব কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমান" (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ঃ ৪০)। সূরা আর-রা'দ, আয়াত ঃ ২, সূরা ফাতের, আয়াত ঃ ১৩ ও অন্যান্য আয়াতেও এমনি বক্তব্য রয়েছে।

কুরআন বলে- "এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতির্ময় আর সূর্যকে করেছেন প্রদীপ্ত উজ্জ্বল।" (সূরা নূহ, আয়াত ঃ ১৬)। "কত মহান তিনি, যিনি আকাশে সংস্থাপন করেছেন দুর্গ এবং ওর মধ্যে স্থাপন করেছেন প্রদীপ সদৃশ সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র" (সূরা আল-ফোরকান, আয়াত ঃ ৬১)। একটি বিকিরণ করে অন্যটি প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরনের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিকগণ জেনেছেন টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতকের দিকে।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সম্পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্তে। এক্ষেত্রে কুরআনে এসেছে স্বয়ং স্রষ্টা থেকে জ্ঞানের এমন কিছু তথ্য, যা মানুষ পূর্বে জানত না। এটিও স্রষ্টার প্রমাণের একটি দলিল ছাড়া আর কী?

A. Cracy Morrison (এ ক্র্যাসি মরিসন) নামে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছেন যে, অলঙ্ঘনীয় গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্ব একজন 'সুপারহিউম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিয়াস (প্রকৌশলী প্রতিভাবান অতিমানব) দ্বারা পরিকল্পিত এবং পরিচালিত।

সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ও কুরআন মজীদ

মরিস বুকাইলী লেখেন, "মহাবিশ্ব যে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অধুনা এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। তবে, কিভাবে যে মহাবিশ্বের সেই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে, তা নিয়ে এখনো ইতস্তত কিছু কিছু মতভেদ রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সর্বজন-পরিচিত আপেক্ষিক থিওরিতে প্রথম উল্লেখিত হয়। যেসব পদার্থবিজ্ঞানী ছায়াপথের আলোক-রশ্মির বর্ণালীবিভা সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় নিরত ছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাও মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সমর্থন করেছেন।

ড. স্টিফেন ডব্লিউ হকিং-এর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" পুস্তকে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় কোরআন মজীদ বলে,

"আমি (আল্লাহ্) আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই এটিকে সম্প্রসারণ করেছি।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৪৭)।

এক্ষেত্রে ড. মরিস বুকাইলীর ব্যাখ্যা হলো- কুরআনে সম্প্রসারণ অর্থে "মুসি'উনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা বহুবচন ও বর্তমান কালবাচক। মূল ক্রিয়া হলো "আউসা'আ", যার অর্থ হলো-প্রসারণ করা, আরো প্রশস্তকরণ, বিস্তারিত করা, সম্প্রসারণ করা।

উল্লেখ্য যে, ১৯২৯ সালে বৈজ্ঞানিক হাবল ঘোষণা করেন যে, 'গ্যালাক্সি' (ছায়াপথ)সমূহ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি হিসাব কষে দেখলেন যে, ১৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে যখন 'বিগ ব্যাং' (বৃহৎ বিস্ফোরণ) হয়, তখন সূর্য, তারকা, ছায়াপথ, আকাশ, পৃথিবী কিছুই ছিল না এবং সেই থেকে সৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আইনস্টাইন স্থির বিশ্বের কথা বলেছিলেন। তবে হাবলের পূর্বে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রুশ পদার্থবিদ আলেকজান্ডার এ. ফ্রিডম্যান বিশ্ব সম্পর্কে তিনটি মডেল উত্থাপন করেন। এর পরপরই বেলজীয় জ্যোতির্বিদ Georges Lemaitre বলেন যে, বিশ্ব ছিল প্রথমে খুবই ঘন ও উত্তপ্ত "Primeval atom" (মৌল অণু)।

বিশ্ব সৃষ্টি হয় এই মৌলিক অণুর ভীষণ বিস্ফোরণে অর্থাৎ "বিগ ব্যাং" ঘটনার পর।

www.pathagar.org

১৯৪৮ সালে তিনজন ব্রিটিশ তত্ত্ববিদ Herman Bondi, Thomas Gold ও Fred Hoyle হাবলের বিশ্ব সম্প্রসারণের তত্ত্বকে ঠিক রেখে the steady state theory (স্থির পদ তত্ত্ব) প্রদান করেন এবং বলেন যে, বিশ্বের কোন সূচনা বা শেষ নেই। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে George Gamow 'বিগ ব্যাং' কালীন সময়ের সেই অতি ঘন ক্ষুদ্র অগ্নিবলয়ের তাপের পরিমাপ কষে দেখালেন এবং বললেন যে, 'বিগ ব্যাং'-এর পরে তাপ হ্রাসের পরবর্তী অবস্থা যাকে নামকরণ করা হয় 3K Background Radiation তার ছিটেফোঁটা এখনও বিশ্বে রয়েছে। ১৯৬৫ সালে Arno Penzias and Robert Wilson (যারা আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের পদার্থবিদ ছিলেন) 3K background radiation তাদের যন্ত্রে ধরেন। এই পর্যবেক্ষণ স্টিডি স্টেট থিওরি'র সলিল সমাধি রচনা করে এবং 'বিগ ব্যাং' থিওরিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। 'বিগ ব্যাং-এর পরে বিভিন্ন পর্যায়ে ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী, সূর্য, গ্রহাদি, চন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে।

বিশ্বসঙ্কোচন ও কুরআন মজিদ

"মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে বিরাট আয়তন প্রাপ্ত হবে এবং তারপর আবার চুপ্‌সে যাবে। সেটি দেখাবে অনেকটা বাস্তবকালের অনন্যতার মতো। সুতরাং এক অর্থে কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) থেকে দূরে থাকলেও আমাদের সবার মৃত্যু অবধারিত (মহাবিশ্ব সঙ্কোচনের ফলে)"। (পৃষ্ঠা-১৪৭, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম)

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে মনে হয়, বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন বিশ্ব যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি এক সময় সঙ্কুচিত হবে- তার অবস্থানগত কারণেই। কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত এ প্রসঙ্গে যা বলে, তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে। কুরআন বলে, "সেদিন (রোজ কিয়ামতে) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ১০৪)

"কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাতের মুঠোয় থাকবে ও আকাশগুলো গুটিয়ে থাকবে তাঁর ডানহাতে।" (সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৬৭)।

"সূর্য যখন গুটানো হবে, নক্ষত্র যখন খসে পড়বে, পাহাড়গুলো যখন সরানো হবে,......." (সূরা তাকবীর, আয়াত ঃ ১-৩)

"যে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসবে?' যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র করা হবে -সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায়?' না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।" (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ঃ ৬-১১)।

"নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে.....।" (সূরা মুরসালাত, আয়াত ঃ ৭-১০)।

"অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন আকাশ থেকে ধোঁয়া নেমে এসে মানব জাতিকে গ্রাস করবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি।" (সূরা দুখান, আয়াত ঃ ১০-১২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে প্রতীয়মান হবে যে, বৈজ্ঞানিকদের ধারণার মতো মহাবিশ্বকে প্রলয়ের সময় গুটানো হবে। মহাবিশ্ব সঙ্কোচিত হবে ও মানুষ ভীষণ বিপদে নিপতিত হবে। ডঃ হকিং তো বলেছেন যে, বিশ্ব চুপসে গেলে বা সঙ্কোচিত হলে "আমাদের সবার মৃত্যু অবধারিত" (পৃষ্ঠা-১৪৭, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম)। উপরোক্ত আয়াতগুলি নিয়ে কোন পদার্থবিদ বা জ্যোতির্বিদ গবেষণা করলে আরো নতুন, চমকপ্রদ তথ্য পেতে পারেন।

কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম,
যিনি মহিমাময় ও মহানুভব
সূরা আর রাহমানঃ ৭৮

www.pathagar.org

আপেক্ষিকতা (RELATIVITY)

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। এ তত্ত্বে তিনি মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণযোগ্য ধর্মাবলীর পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক বর্ণনা দেন। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ যদি মহাবিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তবে তা পর্যবেক্ষকের গতি নিরপেক্ষ হবে। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এরূপ ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করে, যদিও এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন পর্যবেক্ষকের গতি অপরিবর্তিত থাকে। পর্যবেক্ষকের পরিবর্তিত গতিবেগের জন্য তার উপর একটি বাহ্যিক বল ক্রিয়াশীল হবে এবং এই পরিস্থিতিকে ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তার ব্যাপক আপেক্ষবাদ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

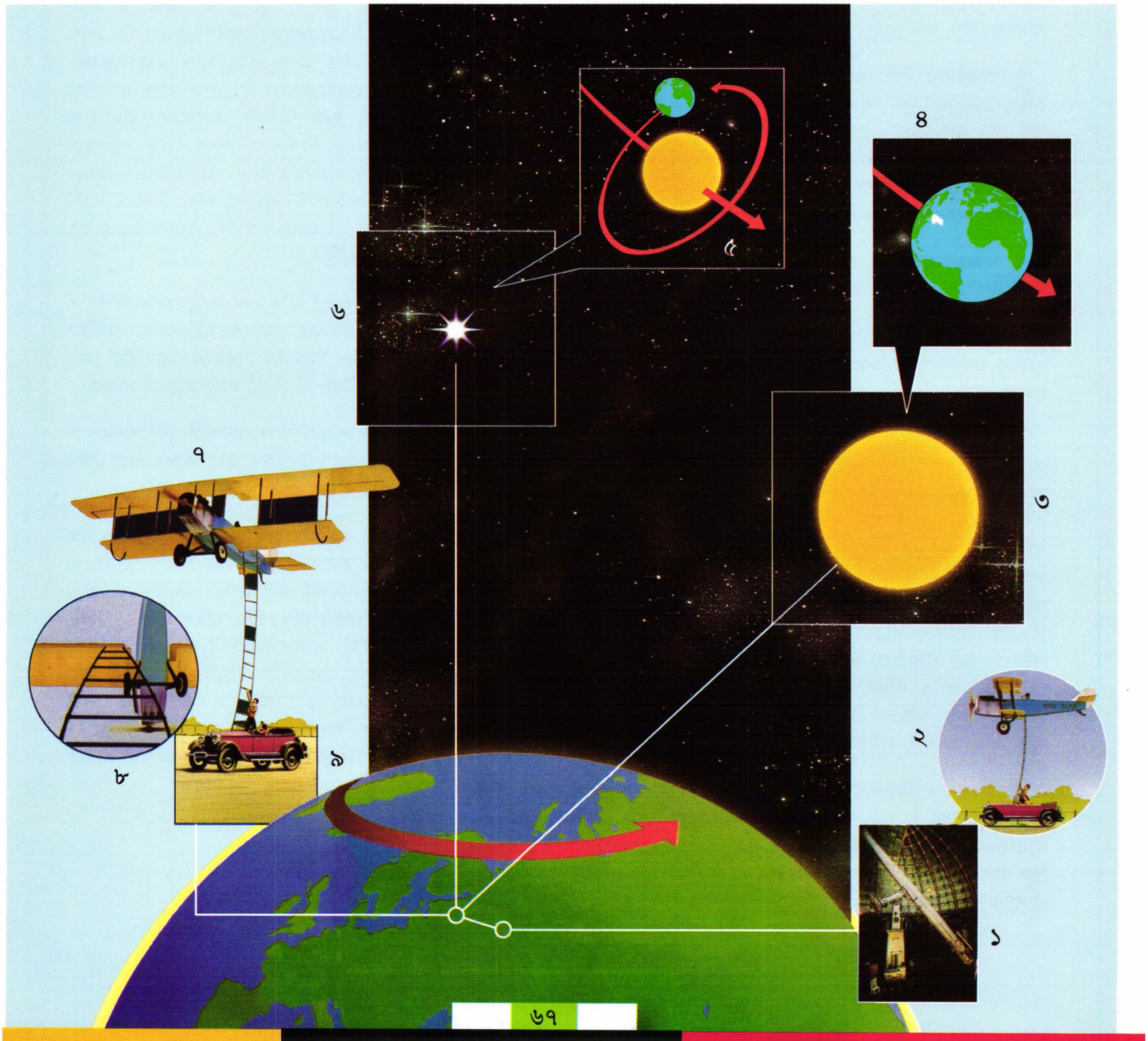

www.pathagar.org

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের পেছনে দু'টি প্রধান মূলনীতি আছে। প্রথমটি হল "আপেক্ষিকতার নীতি"। এ নীতি অনুসারে কোন কিছুর গতি কেবল পরস্পরের সাপেক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব। অর্থাৎ, গতি বা স্থিতির কোন অস্তিত্ব নাই। উদাহরণস্বরূপ, একটি চলন্ত রেলগাড়ির ভেতরে কোন যাত্রীর কাছে ঐ রেলগাড়ির মেঝেতে গাড়ির সমবেগে গতিশীল একটি বলকে স্থির মনে হবে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, কোন পরম প্রসঙ্গ কাঠামোর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ, এমন কোন প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া যাবে না, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে স্থির। আগে মনে করা হতো পৃথিবী একটি পরম প্রসঙ্গ কাঠামো। কিন্তু এখন আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এমনকি সূর্যও স্থির নয়। বর্তমানে, বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আমাদের গ্যালাক্সিসমূহও মহাশূন্যে চলমান। সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্বের কোথাও কোন পরম স্থির বিন্দু নেই, যেখান থেকে সকল পর্যবেক্ষণসমূহ করা সম্ভব।

আপেক্ষিকতার নীতি আরো বলে যে, এমন কোন পরীক্ষণের অস্তিত্ব নেই যা কিনা পর্যবেক্ষণকারীকে বলতে পারে যে- মহাশূন্যে তার পরম গতি কী? বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতিটি হল- "যদিও সমস্ত গতি পর্যবেক্ষণ বিন্দুর ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু আলোর গতি সর্বত্রই সমান বা ধ্রুব।" ১৮৯০ সালের কতকগুলি পরীক্ষণের (মাইকেলসন/মর্লির পরীক্ষা) মাধ্যমে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব 'ইথার'-এর ধারণাকে বাতিল করে 'স্থান-কাল' (Space-time) এর ধারণা প্রচলন করে।

এ দু'টি নীতি থেকে দেখানো যায় পরস্পরের সাপেক্ষে আপেক্ষিক গতিতে চলমান পর্যবেক্ষকদের নিকট একই বস্তুর দৈর্ঘ্য, গতিবেগ, সময়ের ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। প্রথমটি হল কোন বস্তুই আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে চলাচল করতে পারে না। দ্বিতীয়টি হল, কোন বস্তুর ভর আর শক্তি আসলে একই। ভর হল শক্তির সংহত রূপ। শক্তি হল ভরের বিযুক্ত বা অসংহত রূপ। কাজেই ভর ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। ভর-শক্তির সমতুল্যতার এই নীতি আইনস্টাইন তার বিশ্ববিখ্যাত $E=mc^2$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করেন। ভর-শক্তির সমতুল্যতার এ নীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ- নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়ায় (তারকাসমূহের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিক্রিয়া) ক্ষুদ্র পরিমাণের ভর বৃহৎ পরিমাণের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও এ শক্তিই তারকাসমূহের জ্বলন এবং সূর্যের তাপ বিকিরণের জন্য দায়ী, যা কিনা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে এবং পৃথিবীকে আমাদের জীবনধারণের উপযোগী রাখে।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে পর্যবেক্ষকের গতি তার পর্যবেক্ষণ বিন্দুর সাপেক্ষ। চলন্ত একটি গাড়ি থেকে চলন্ত একটি উড়োজাহাজে সিঁড়ি বেয়ে যে ব্যক্তি উঠে তার কাছে উড়োজাহাজটিকে স্থির মনে হয়। কিন্তু মাটিতে অবস্থানকারী কোন পর্যবেক্ষকের নিকট ঐ ব্যক্তি এবং উড়োজাহাজ উভয়কেই গতিশীল মনে হবে। সূর্য-৩ এ অবস্থিত একজন তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষক গাড়ি এবং মাটিতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের গতিকে পৃথিবী-৪ এর গতির সাপেক্ষে দেখবে, যা কিনা সূর্য-৫ এর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে; যেখানে গ্যালাক্সী-৬ এর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন তারাতে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষক ঐ গ্যালাক্সীকে কেন্দ্র করে সূর্যের গতিও দেখতে পাবে।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের অবতারণা করেন এবং এ সময়েই এ তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। এ তত্ত্ব অনুসারে, যে সব প্রসঙ্গ কাঠামো একে অপরের সাপেক্ষে স্থির সমবেগে চলছে অর্থাৎ জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ যে সকল সমীকরণের মাধ্যমে এই নিয়মগুলোকে প্রকাশ করা হয়, সে সকল সমীকরণের রূপ সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে একই রকম। আইনস্টাইন তাঁর এ যুগান্তকারী কাজকে সে সকল প্রসঙ্গ কাঠামোর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে চান, যারা পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে না থেকে ত্বরিত গতিতে আছে, অর্থাৎ এ সকল প্রসঙ্গ কাঠামোর আপেক্ষিক বেগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাধারণীকরণের মাধ্যমে আইনস্টাইন মহাকর্ষ বলের জন্যেও একটি নতুন এবং সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করলেন। এখন পর্যন্ত এ তত্ত্ব সবচেয়ে সফল তত্ত্ব বলে প্রমাণিত।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে সমতুল্যতার নীতি। এ নীতি অনুসারে পৃথিবী স্থানীয়ভাবে সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি প্রসঙ্গ কাঠামো এবং মহাকাশে (যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র অনুপস্থিত) অভিকর্ষ ত্বরণে উর্ধ্বগামী একটি প্রসঙ্গ কাঠামো সমতুল্য।

এর অর্থ এ প্রসঙ্গ কাঠামো দু'টিতে অবস্থানকারী পর্যবেক্ষকদ্বয় যে কোন পরীক্ষণের সমতুল্য ফলাফল পাবেন এবং তাদের পক্ষে প্রসঙ্গ কাঠামোদ্বয়ের পার্থক্য করা অসম্ভব।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে সময় কোন বিচ্ছিন্ন স্থানাঙ্ক নয় বরং এটি অপর তিনটি স্থান জাতীয় স্থানাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত। এ মহাবিশ্বে যা কিছুই গতিশীল তাই স্থান-কালের সম্মিলিত এ ক্ষেত্রে জিওডেসিক নামক সরল রেখায় চলে। জিওডেসিক সরলরেখা কিন্তু স্থান-কালের এই ব্যাপ্তি বক্র। এ বক্রতার উৎস হল বৃহৎ পরিমাপে উচ্চভরসম্পন্ন বস্তু অর্থাৎ গ্রহ, তারা, নক্ষত্র ইত্যাদি। এ ক্রিয়ার একটি উদাহরণ হল মহাকর্ষীয় লেন্স, যে প্রক্রিয়ায় বহু দূরে অবস্থিত একটি "কোয়েসার"এর প্রতিবিম্ব, মধ্যবর্তী কোন গ্যালাক্সী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে দুই বা তার চেয়ে বেশী অংশে বিভাজিত অবস্থায় দেখা যায়।

www.pathagar.org

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ বলের ব্যাখ্যা অন্যান্য বলের অনুরূপ নয়। স্থান-কালের বক্রতার জন্যই মহাকর্ষীয় বলের উদ্ভব আর বস্তুর উপস্থিতিই স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। বস্তু নিরপেক্ষ স্থান কালের অস্তিত্ব নাই। বস্তুর উপস্থিতি স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয় বলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বস্তুর নিকটে ছোট একটি বস্তুর জিওডেসিক বরাবর গতি বড় বস্তুর দিকে হয়। অর্থাৎ মহাকর্ষ বল আকর্ষণধর্মী এবং ক্ষুদ্র বস্তুর ত্বরণ বৃহৎ বস্তুর দিকে। আমরা মানুষেরা ত্রিমাত্রিক জগতের বাসিন্দা। এজন্য আরা মহাবিশ্বের বক্রতা চতুর্থ মাত্রার ম্যামে উপলব্ধি করতে পারি না। এ স্থান কালের বক্রতার ফলাফলই মহাকর্ষ বল, যা কিনা গ্রহ-নক্ষত্র , নীহারিকাপুঞ্জের গতির জন্য দায়ী।

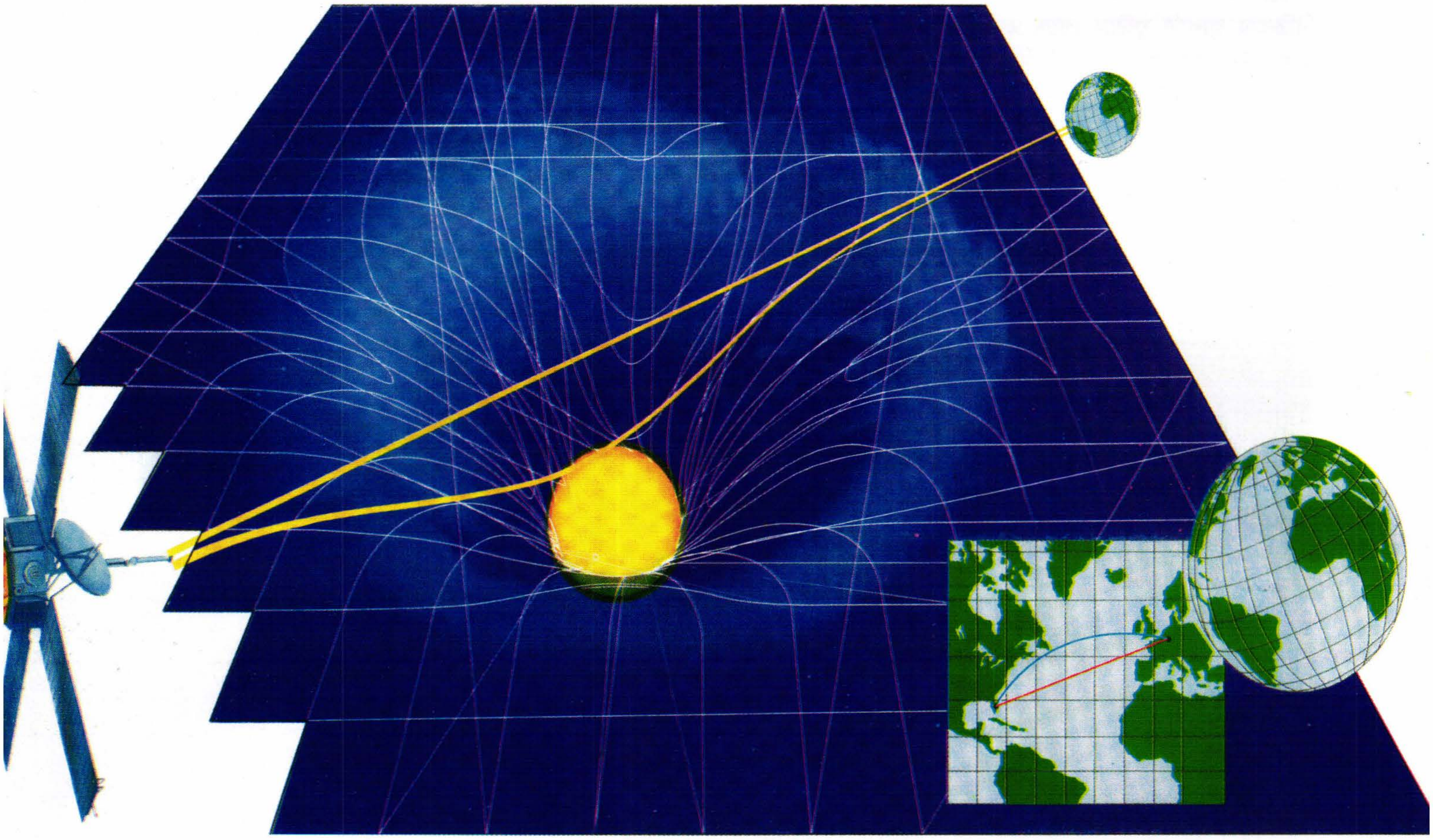

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে সূর্য স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। এ জন্য সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়া রেডিও সিগন্যালের গতি কমে যায়। এই ফলাফল NASA দ্বারা পরিক্ষিত হয়েছে যখন তা ১৯৭০ সালের মধ্যভাগে মঙ্গলগ্রহে মহাশূন্যযান পাঠায়। যখন মঙ্গলগ্রহ সূর্যের দূরবর্তী প্রান্তে ছিল তখন NASA এবং মহাশূন্য যানগুলো সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়া রেডিও সিগনাল পর্যবেক্ষণ করে। পরীক্ষণে দেখা যায় রেডিও সিগন্যাল পৃথিবীতে পৌঁছতে ১০০ মাইক্রোসেকেন্ড অতিরিক্ত সময় নেয়।

ইউরোপ হতে উত্তর আমেরিকা যাওয়ার ক্ষুদ্রতম পথ দ্বিমাত্রিক একটি মানচিত্রে সরলরেখা মনে হবে। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী-ত্রিমাত্রিক, সেহেতু প্রকৃত পথ বাঁকা হবে। একই ঘটনা ঘটে যখন স্থান-কালের ক্ষেত্র দিয়ে বস্তু এবং বিকিরণ গতিশীল হয়। যদিও মনে হয় তারা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা চতুর্থমাত্রিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা চতুর্থমাত্রিক ক্ষেত্রে বক্র পথে চলে।

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য"
সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০

www.pathagar.org

নিউট্রন তারকা, পালসার এবং কৃষ্ণ বিবর

NEUTRON STARS, PULSARS AND BLACK HOLES

একটি তারকাকে স্থিতাবস্থায় রাখে এর কণিকাগুলির মহাকর্ষ বল এবং নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির ভারসাম্য। কিন্তু ফিউশন বিক্রিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তারাটি মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সঙ্কুচিত হয়ে নিউট্রন তারকা অথবা কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয়।

নিউট্রন তারকা হলো বৃহৎ কোন তারা অবশেষ মাত্র। নিউট্রন তারকাসমূহের ভর সাধারণত সূর্যের দেড় গুণের বেশি। কিন্তু এদের গঠন উপাদানগুলো এত ঘনীভূত অবস্থায় যে এ প্রকার তারকার ব্যাস হয় মাত্র ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার। পালসার হলো মূলত দ্রুত ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকা। ১৯৬০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রী জোসেলিন বেল প্রথম পালসারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পালসারের কার্যক্রম অনেকটা সমুদ্রে জাহাজকে পথ নির্দেশক বাতিঘরের মত। যখন এ ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকার চৌম্বক মেরু আমাদের দৃশ্যপটের সরলরেখায় আসে তখনই আমরা এর বিকীর্ণ শক্তি দেখতে পাই। অন্য সময় পাই না।

সুপার নোভা বিস্ফোরণের পর নিউট্রন তারকাগুলো অতি উচ্চবেগে ঘুরতে থাকে। সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন পালসারকে মিলিসেকেন্ড পালসার বলে এবং এরা প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বার আবর্তিত হয়।

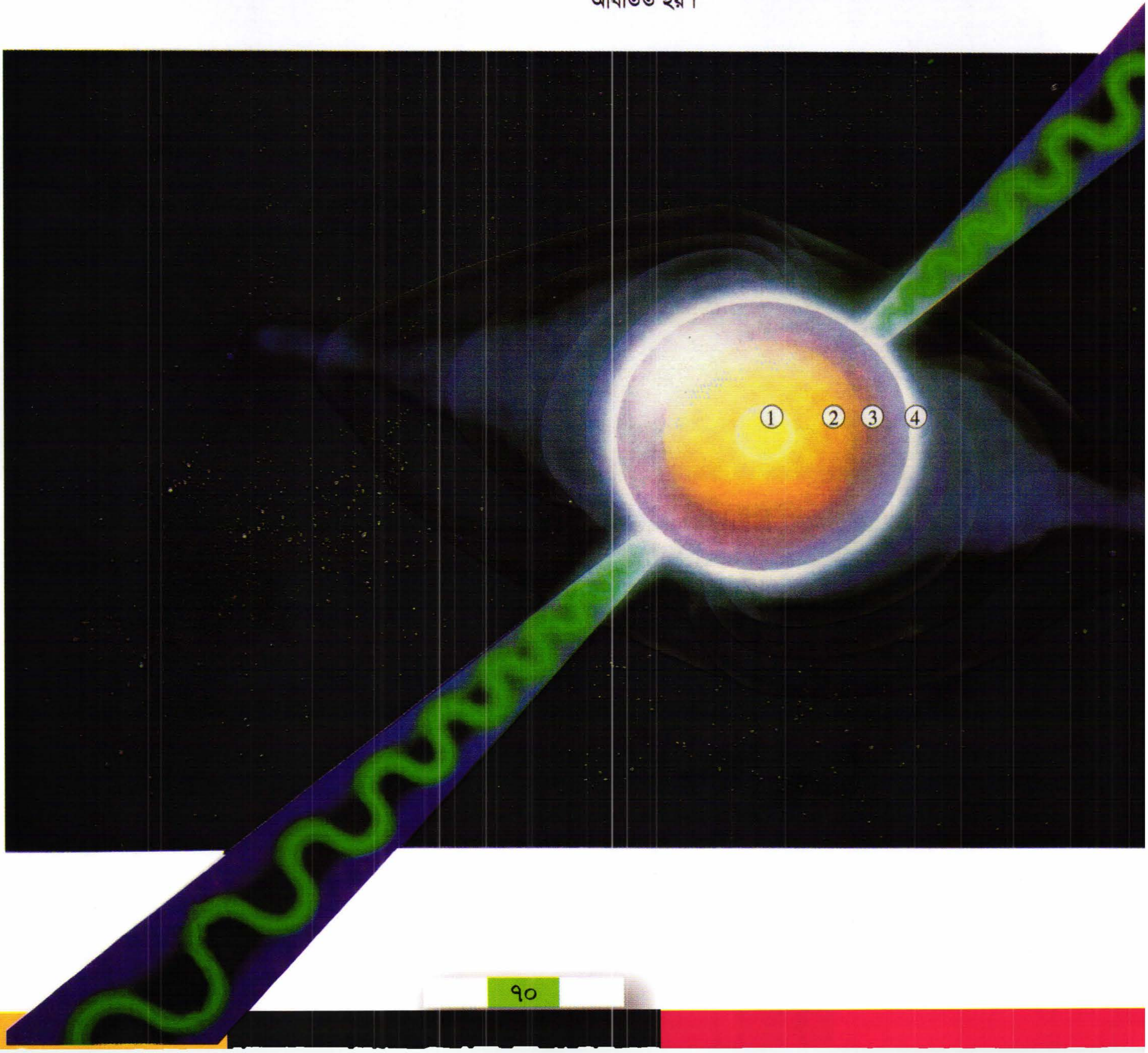

www.pathagar.org

ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর গণিতের সাহায্যে সর্বপ্রথম দেখান যে, কোন তারকার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হলে তার অন্তিম পরিণতি হিসেবে এটি ব্ল্যাকহোলে কিংবা নিউট্রন তারায় পরিণত হতে পারে। সৌরভরে এই সীমা চন্দ্রশেখরের সীমা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে আবিস্কৃত হয় কৃষ্ণ বিবরে (Black Hole) এ পরিণত হওয়ার জন্য তারার ভর হওয়া প্রয়োজন ৩.২ সৌরভের চেয়ে বেশি। এই সীমাকে বলা হয় ওপেনহাইমার-ভলকফ (Oppenheimer-volkoff) সীমা। যখন ৩.২ সৌরভরের চেয়ে বেশি ভরবিশিষ্ট কোন তারার নিউক্লিয়ার ফিউশন জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, তেব তা সঙ্কুচিত হয়ে অসীম ঘনত্বের একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই বিন্দুর নাম সিঙ্গুলারিটি (Singularity) । এই বিন্দুর চারপাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য থেকে কোন কিছুই (এমনকি আলো) বের হতে পারে না। এরই নাম ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণবিবর। কৃষ্ণবিবরের সীমানাকে বলা হয় হরাইজন (Horizon)।

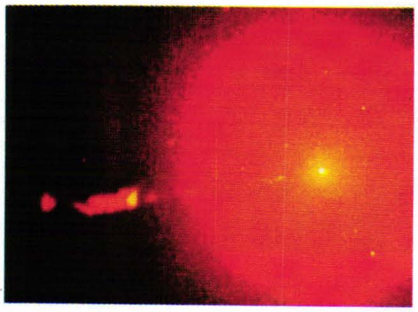

কেন্দ্রের সাদা অংশটি উপবৃত্তীয় গ্যালাক্সি M৮৭ এর অন্তর্গত। এটি একটি সাধারণ উপবৃত্তীয় গ্যালাক্সি হতে ৩০০ গুণ বেশি তারকা ঘনত্ব নির্দেশ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণ ২.৬ মিলিয়ন সৌরভর বিশিষ্ট কোন একটি কৃষ্ণ বিবর (Black hole) তারকাগুলোকে ধরে রেখেছে।

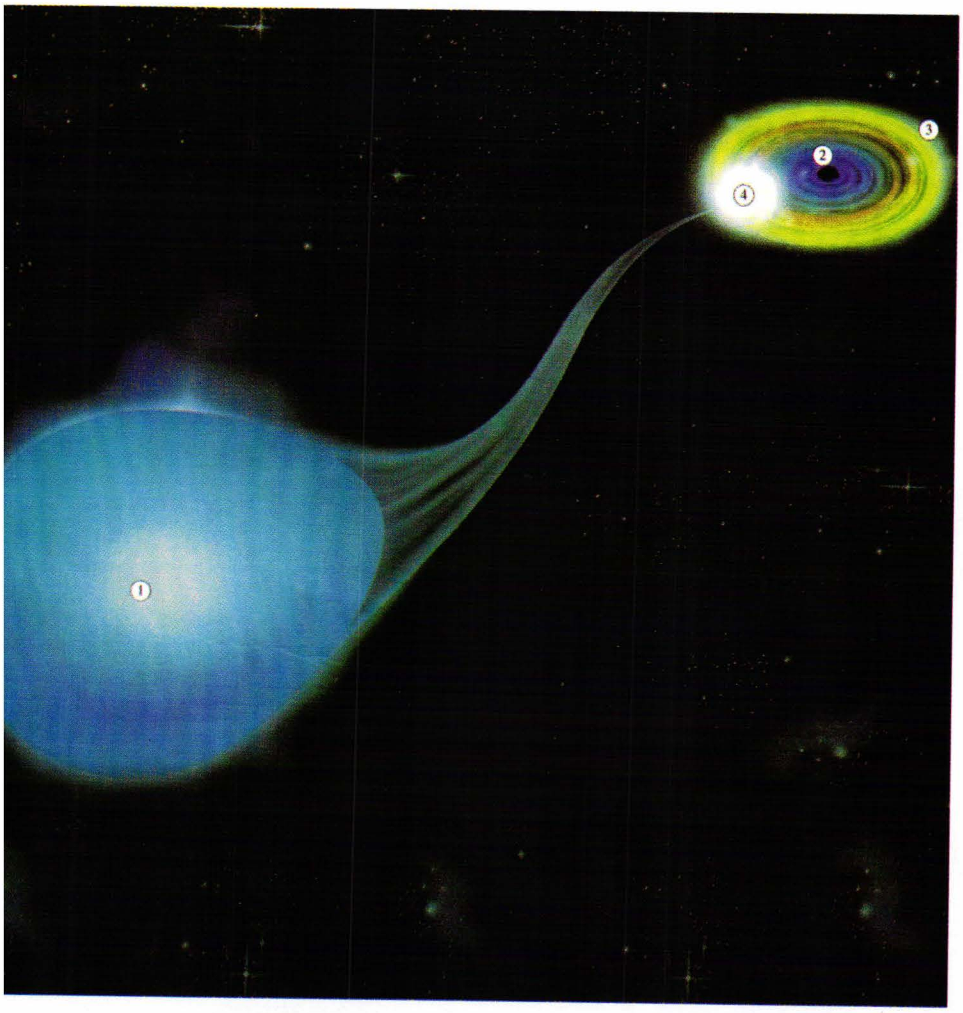

1. Supergiant star (অতিদানব তারকা)
2. Black hole (কৃষ্ণবিবর)
3. Accretion disk (বর্ধিত চাকতি)
4. Hot spot (উষ্ণ স্থান)

একটি নীল বর্ণের অতি বৃহৎ তারকা কৃষ্ণ বিবরের (x-1) এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারকাটির বহির্ভাগ ধীরে ধীরে কৃষ্ণবিবরের বহির্ভাগের সংস্পর্শে আসছে। এ সংস্পর্শ স্থানটির তাপমাত্রা অতি উচ্চ এবং এটি থেকে X-Ray নির্গত হয়, যা আমাদের পৃথিবী হতেও অবলোকন করা যায়।

www.pathagar.org

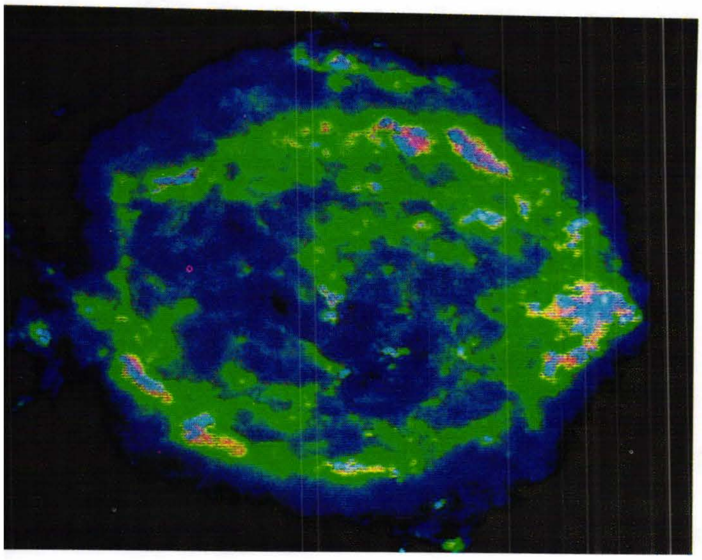

সুপারনোভা ক্যাসিওপিয়া A এর অবশেষের একটি চিত্র। এটি ৩০০ বছর আগে বিস্ফোরিত হয় এবং তা আজো মহাকাশের অন্যতম শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ উৎস। নীলাভ জায়গাগুলো সর্বাধিক বিকিরণকে নির্দেশ করে।

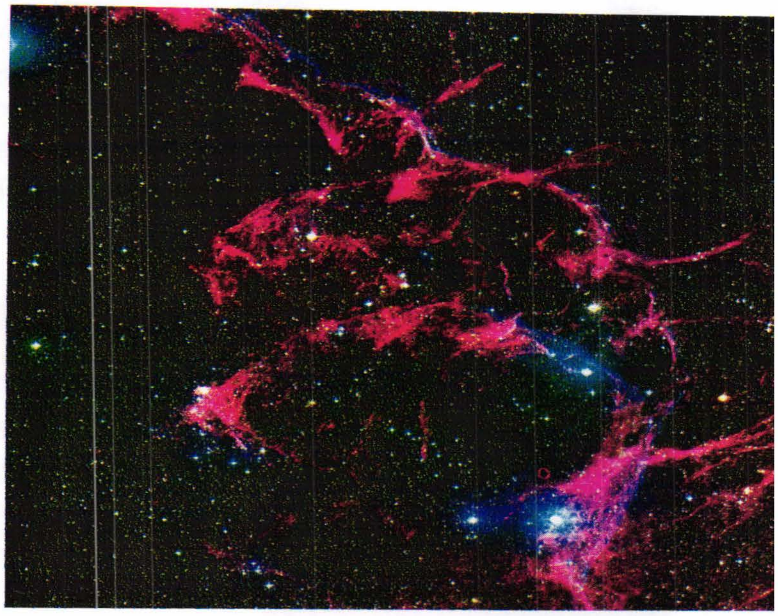

এটি ভেলা সুপারনোভার অবশেষের একটি চিত্র। চিত্রে সুপারনোভাটির একটি ক্ষুদ্র অংশকে দেখানো হয়েছে। ধারণা করা হয়, আজ হতে প্রায় ১২০০০ বছর পূর্বে সুপারনোভাটি সৃষ্টি হয়েছিল। একেবারে মাঝামাঝি পালসার ০৯৩৩-৪৫ অবস্থিত, যাকে সুপারনোভা সৃষ্টিকারী তারকাটির অবশেষ হিসেবে মনে করা হয়।

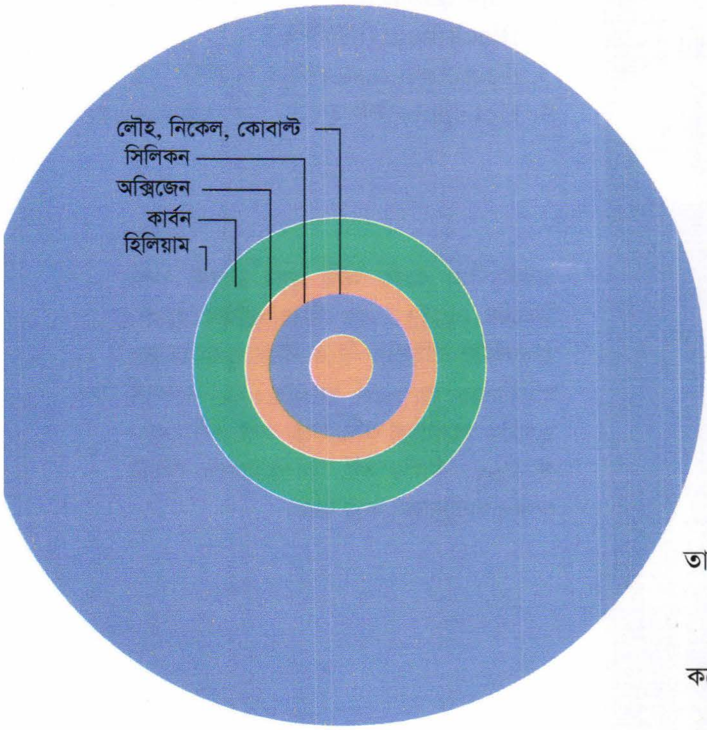

যখন একটি অতি বড় তারকা তার জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন এর কেন্দ্রীয় অংশের বিভিন্ন স্তরে ফিউশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। হাইড্রোজেন ফিউশন হিলিয়াম সৃষ্টি করে। হিলিয়াম ফিউশন সৃষ্টি করে কার্বন এবং অক্সিজেন। কার্বন ফিউশন নিয়ন ও ম্যাগনেসিয়াম তৈরি করে এবং অক্সিজেন ফিউশন তৈরি করে সিলিকন ও সালফার। সবশেষে সিলিকন ও সালফার ফিউশন লৌহ সৃষ্টি করে। লৌহের ফিউশনের জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় বলে লৌহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায়।

কোন তারকার ভর চন্দ্রশেখর সীমার (১.৪ সৌরভর) বেশি হলে তা বিস্ফোরণ সহকারে সুপারনোভা সৃষ্টি করে এবং এর বহিস্থাংশের বস্তুসমূহকে শূন্যে নিক্ষেপ করে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কেন্দ্রীয় অংশ খুবই ছোট এবং উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন নিউট্রন তারকার সৃষ্টি করে। যখন তারকা সুপারনোভায় পরিণত হয়, তখন এর উজ্জ্বলতা ১০৮ গুণ বৃদ্ধি পায়, যা মাত্র কয়েকদিন বিদ্যমান থাকে।

"তোমাদের জন্য (আল্লাহ) অধীনস্থ করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজি তাঁর হুকুমের অধীন। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা জ্ঞানী।"
সূরা নহল, আয়াত : ১২

www.pathagar.org

তারকা, গ্যালাক্সি ও সূর্য

STARS, GALAXIES AND SUN

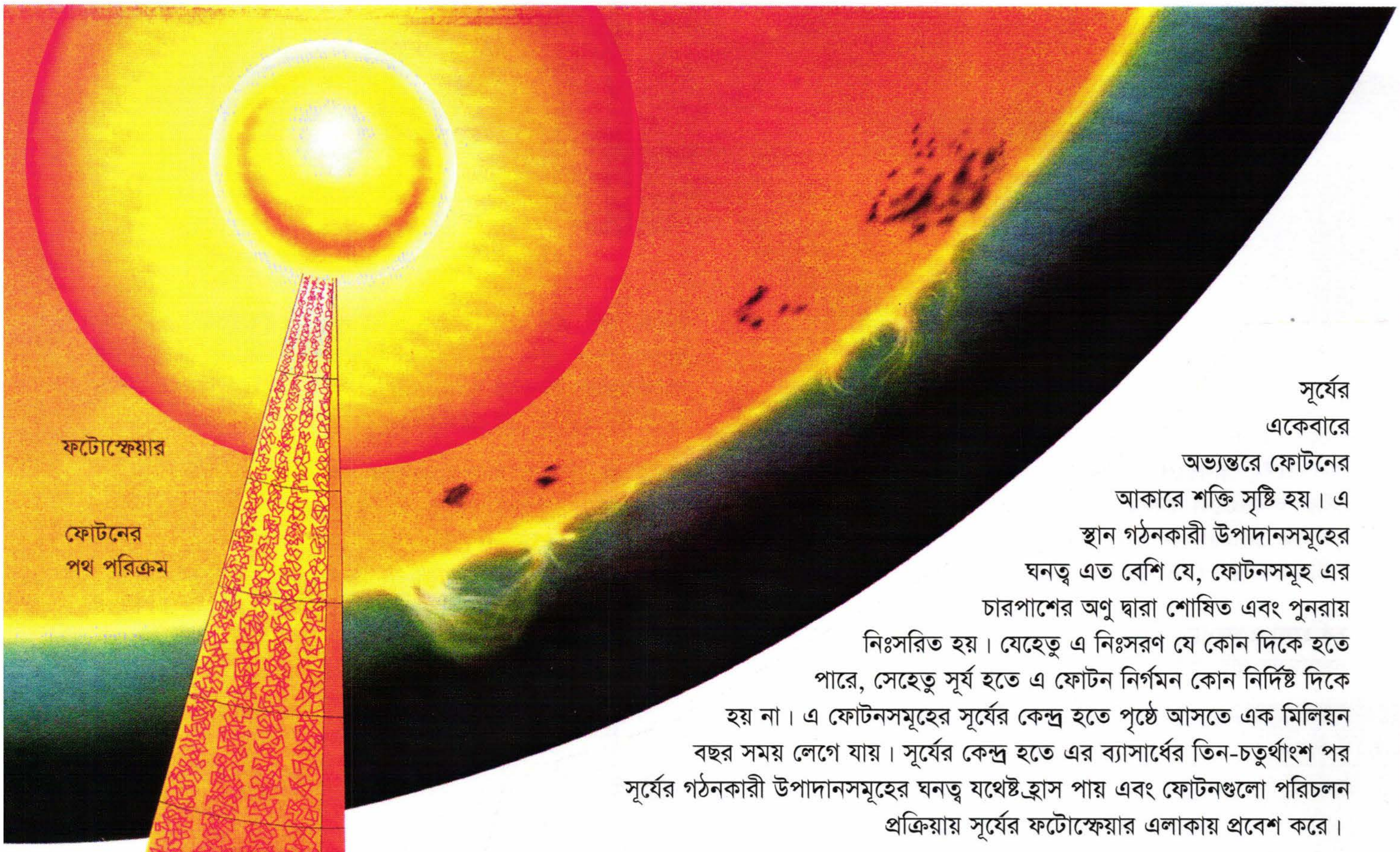

সূর্যের একেবারে অভ্যন্তরে ফোটনের আকারে শক্তি সৃষ্টি হয়। এ স্থান গঠনকারী উপাদানসমূহের ঘনত্ব এত বেশি যে, ফোটনসমূহ এর চারপাশের অণু দ্বারা শোষিত এবং পুনরায় নিঃসরিত হয়। যেহেতু এ নিঃসরণ যে কোন দিকে হতে পারে, সেহেতু সূর্য হতে এ ফোটন নির্গমন কোন নির্দিষ্ট দিকে হয় না। এ ফোটনসমূহের সূর্যের কেন্দ্র হতে পৃষ্ঠে আসতে এক মিলিয়ন বছর সময় লেগে যায়। সূর্যের কেন্দ্র হতে এর ব্যাসার্ধের তিন-চতুর্থাংশ পর সূর্যের গঠনকারী উপাদানসমূহের ঘনত্ব যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ফোটনগুলো পরিচলন প্রক্রিয়ায় সূর্যের ফটোস্ফেয়ার এলাকায় প্রবেশ করে।

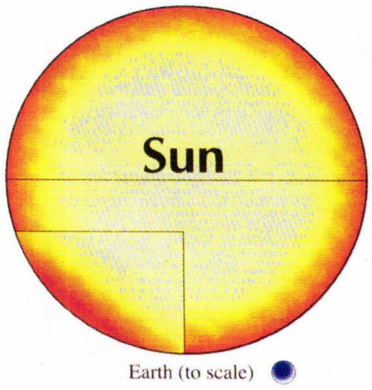

হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্পাইরাল গ্যালাক্সি M১০০ এর ছবিটি পাশে দেখানো হয়েছে। এর মাঝে অবস্থিত হলো অতি পুরাতন পপুলেসন II গোত্রের একটি তারকা। বাইরের বাহুগুলো পপুলেসন ও তারকার সমন্বয়ে গঠিত।

সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ এবং সৌরজগতের বেশির ভাগ ভর এ সূর্যই বহন করছে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের (যা ফটোস্ফেয়ার নামে পরিচিত) তাপমাত্রা এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা হতে অনেক কম। সূর্যের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা যেখানে ১৫,০০০,০০০ K সেখানে এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাত্র ৬০০০ K

www.pathagar.org

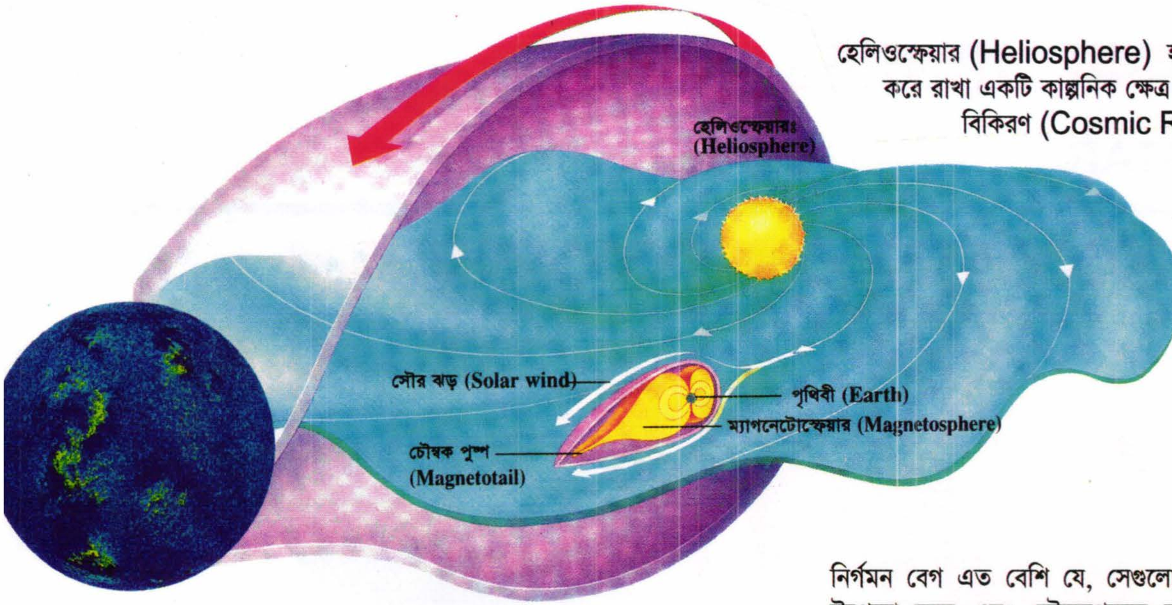

হেলিওস্ফেয়ার (Heliosphere) হলো সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রকে আবদ্ধ করে রাখা একটি কাল্পনিক ক্ষেত্র। এটি সৌরজগৎকে মহাজাগতিক বিকিরণ (Cosmic Radiantion) হতে রক্ষা করে।

এ চিত্রটি সূর্যের ফটোস্ফেয়ারের বিভিন্ন স্থানের পোলারিটিকে প্রদর্শন করছে। হলুদ বর্ণের স্থানগুলো ধনাত্মক পোলারিটি বিশিষ্ট এবং গাঢ় নীল বর্ণের স্থানগুলো ঋণাত্মক পোলারিটি বিশিষ্ট। এ এলাকাতেই সৌর কলঙ্কগুলো দেখা যায়। এ এলাকার তাপমাত্রা চতুর্স্পার্শ্বের তুলনায় ১০০০ K কম বলে এদের চতুর্স্পার্শ্বের তুলনায় কালো প্রতীয়মান হয়। সৌর কলঙ্কের আকৃতিও আবার পরিবর্তিত হয়।

সূর্য হলো প্রকৃতপক্ষে একটি বিস্ফোরক বস্তু। এর বিস্ফোরণ হতে নির্গত পদার্থসমূহ প্রতি সেকেন্ডে ৩ মিলিয়ন টন বেগে মহাশূন্যে নির্গত হয়। এ নির্গমন বেগ এত বেশি যে, সেগুলো সূর্যের মহাকর্ষজনিত বাধাকেও উপেক্ষা করে এবং সৌরজগতের বাইরেও নির্গত হয়। এ নির্গত পদার্থসমূহকে সৌরঝড় বলে। সৌরঝড়ের অন্তর্গত উপাদানসূহ চৌম্বক ধর্ম বিশিষ্ট এবং এগুলো গ্রহসমূহের চৌম্বকক্ষেত্রকে বিনষ্ট করে।

অধিকাংশ গ্রহেরই নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটোস্ফেয়ার (Magnetosphere) আছে। এ চৌম্বকক্ষেত্রের অভ্যন্তরের চৌম্বক বলের শক্তি সূর্যের চৌম্বক বলের চেয়েও বেশি। এটি গ্রহের ম্যাগনেটোস্ফেয়ার সৌরঝড়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং গ্রহের ম্যাগনেটোস্ফেয়ার সূর্যের বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়ে চৌম্বক পুচ্ছের সৃষ্টি করে।

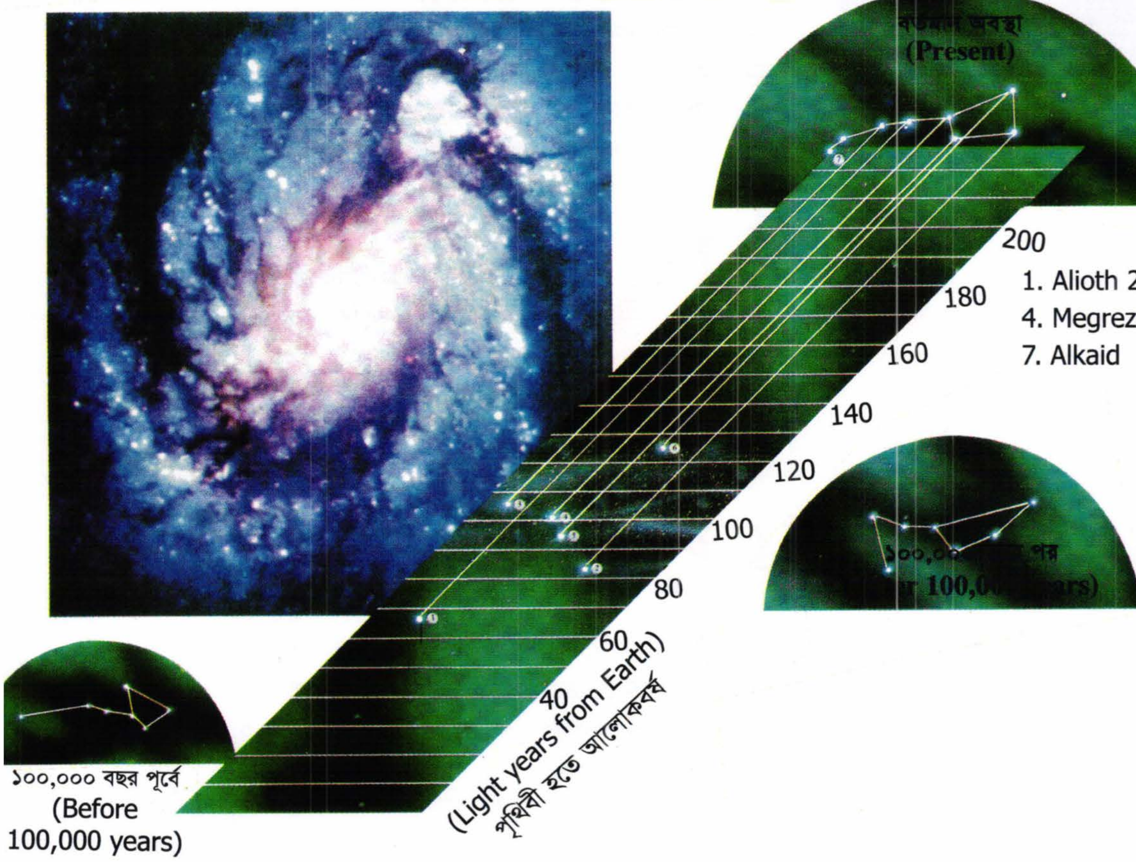

1. Alioth 2. Merak 3. Mizar
4. Megrez 5. Phekda 6. Dubhe
7. Alkaid

কোন একটি তারকার অবস্থানের পরিবর্তন অনেক সময়ের ব্যবধানে বোঝা যায়। নীচে বামে আজ থেকে ১০০,০০০ বছর পূর্বে সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকৃতি দেখানো হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এর আকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ তারকামণ্ডলের বর্তমান আকৃতি উপরে চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। আজ থেকে ১০০,০০০ বছর পর এর আকৃতি হবে উপরের চিত্রের ন্যায়।

www.pathagar.org

বৈচিত্র্যময় তারকারাজি

VARIETIES OF STARS

দৈত্য ও বামন তারা

তারাসমূহকে কেবল বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বারা শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। যদিও তাপমাত্রার মাধ্যমে তারাগুলোকে আলাদা করা যায়, কিন্তু তার মাধ্যমে তারার আকার নির্ণয় করা যায় না। হাইড্রোজেন তারার ব্যাসার্ধ সৌর ব্যাসার্ধের এক দশমাংশ হতে শুরু করে ১০০ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আকৃতি সৌর ব্যাসার্ধের ১০০০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। নক্ষত্রসমূহের ভর সৌরভরের ০.০৮ গুণ হতে ১০০ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। একই তাপমাত্রার কিন্তু ভিন্ন আকারের দুটি তারার উজ্জ্বলতা ভিন্ন হয়, যা তাদের বর্ণালী বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন বলে প্রতীয়মান হয়। এ পার্থক্যকে পাঁচটি উজ্জ্বলতার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শ্রেণী ১ এর তারাদের বলে অতিদানব (Supergiant) তারা, শ্রেণী ২ এর তারাদের উজ্জ্বল দানব, শ্রেণী III এর তারাদের দানব (Giant) তারা, শ্রেণী IV এর তারাদের উপদানব (Subgiant) তারা, এবং V এর তারাদের প্রধান ধারার তারা (main sequence) বলে। বর্ণালী শ্রেণীর G.K.M শ্রেণীর যেসব তারা হাইড্রোজেন দহন করে, তারা প্রধান ধারার তারার অন্তর্ভুক্ত। সূর্য প্রধান ধারার G2 শ্রেণীর একটি হলুদ বামন তারা। প্রধান ধারা কথাটি উৎপত্তি হয় Hertzsprung-Russel চিত্র হতে, যা জ্যোতির্বিদগণ তারার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য উদ্ভাবন করেন। এতে তাপমাত্রার সাপেক্ষে তারার ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করা হয়েছে। চিত্রটির ৫৮০০° তাপমাত্রার রেখা ১ সৌর উজ্জ্বলতা রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেখানে সূর্যের অবস্থান। ৫৮০০° হলো সূর্যের আলোকমণ্ডল (Photosphere) এর তাপমাত্রা। এ চিত্র হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ তারা S আকৃতির বক্ররেখার ওপর অবস্থান করে। এ বক্ররেখা নীচের ডানপার্শ্বের সর্বনিম্ন উজ্জ্বলতার লাল বামন তারা হতে শুরু করে সূর্যের অবস্থানের মধ্য দিয়ে উপরের সর্বডানে অধিক উজ্জ্বলতার নীল তারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ ধারাকে প্রধান ধারা বলে, যাতে অধিকাংশ তারা জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে, এ প্রধান ধারা মাঝারী হাইড্রোজেন তারার সঞ্চার পথ। তারার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রধান ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যখন তারার হাইড্রোজেনের গলন বন্ধ হয়ে হিলিয়ামের গলন শুরু হয়, তখন তারার শক্তিতে পরিবর্তন ঘটে, যা তার বাহ্যিক আকার ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস পায়। তখন তারাটি Hertzsprung-Russel চিত্রের সর্বোচ্চ ডানের চতুর্থাংশে লাল দানব তারা এলাকায় অবস্থান করে। যখন তারার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন তা সর্বনিম্ন বাম চতুর্থাংশ শ্বেত বামন তারাদের বা, তারার অবশেষ অংশের সাথে বিরাজ করে।

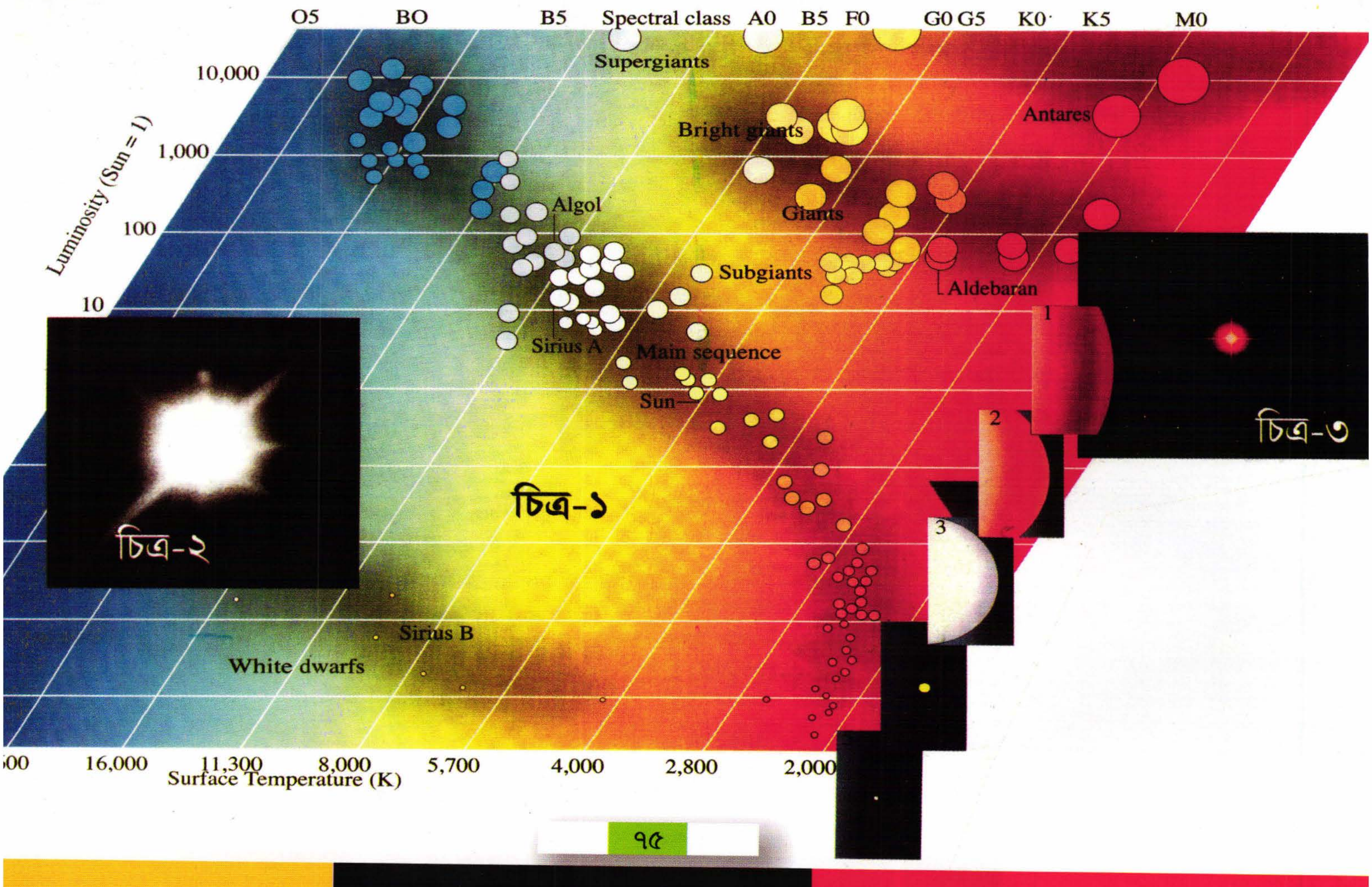

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

www.pathagar.org

চিত্র-১ ঃ রাতের আকাশে দেখা যায় এরূপ সকল তারার ঔজ্জ্বল্য Hertzsprung-Russel চিত্রে দেখানো যায়। এটি তারার উজ্জ্বলতা শ্রেণীর সাথে ঔজ্জ্বল্যের লেখচিত্র। অধিকাংশ স্থায়ী ও মাঝবয়সী তারা উপরে বামদিক হতে নীচে ডানদিক পর্যন্ত S আকৃতির বক্ররেখার উপর অবস্থিত। এদের প্রধান ধারার তারা বলে। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাসমূহের অবস্থান চিত্রের নীচের দিকে, লাল বামন তারাগুলো প্রধান ধারার অংশবিশেষ, সাদা বামন তারাগুলো হালকা ও অধিক ঘনত্বসম্পন্ন কেন্দ্রবিশিষ্ট, যারা তারার জীবনের শেষভাগে এসে বিস্ফোরণ করেছে।

চিত্র-২ ঃ আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারা লুব্ধক (Sirius) মৃগব্যাধ (Canis major) মণ্ডলে অবস্থিত একটি উজ্জ্বল সাদা তারা, যেখান থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে ৮.৭ আলোকবর্ষ সময় লাগে। পৃথিবী হতে দূরত্বের হিসেবে এটি ৬ষ্ঠ নিকটবর্তী তারা। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি যুগল তারা যার অন্যটি শ্বেত বামন তারা। লুব্ধকের উজ্জ্বলতা সূর্য অপেক্ষা ২৬ গুণ অধিক।

চিত্র-৩ ঃ বৃশ্চিক তারামণ্ডলের পারিজাত (Antares) একটি লাল অতি দানব তারা, যার অবস্থান চিত্রের উপরের ডান কোনায়। এরা আকাশের বৃহত্তম তারাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ৫০০ গুণ এবং উজ্জ্বলতা ৩০,০০০ গুণ। কিন্তু আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা মাত্র ৩০০০K, এসব তারার ঘনত্ব খুব কম।

তারাসমূহের আকৃতি, ভর ও তাপমাত্রার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। সূর্যকে প্রামাণ্য ধরে তারাসমূহের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়। একই তাপমাত্রার তারাসমূহের পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলে নির্গত শক্তি সমান। উজ্জ্বলতা আকৃতির সাথে বৃদ্ধি পায়। পারিজাত এবং আলদাবরান সূর্য অপেক্ষা বহত্তর এবং উজ্জ্বলতর তারা। আলদাবরান সূর্য অপেক্ষা ২৫ গুণ বৃহত্তর এবং ২০০ গুণ উজ্জ্বলতর কিন্তু শীতলতর। পারিজাত সূর্য অপেক্ষা অর্ধেক উষ্ণ, যার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩০০০K । সূর্যের সাথে প্রধান ধারায় মায়াবতী (algol) একটি B শ্রেণীর তারা, যা সূর্য অপেক্ষা ৭ গুণ বড়, কিন্তু ১০০ গুণ উজ্জ্বলতর এবং উত্তপ্ত (১০,০০০K)। লুব্ধক পৃথিবীর সমান আকৃতির একটি সাদা বামন তারা। এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত (১০,০০০K), কিন্তু সূর্য অপেক্ষা ১০০০ গুণ কম উজ্জ্বল।

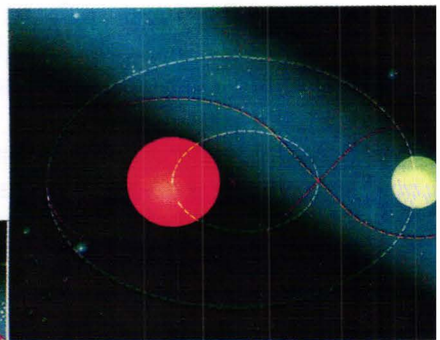

প্রথম অবস্থায় তারাকযুগলে প্রতিটি তারকাই এদের সাধারণ কেন্দ্রীয় ভরের (Common center of mass) চতুর্দিকে আবর্তন করে। এ তারকা দুটির প্রতিটি মহাকর্ষীয় বলক্ষেত্রের সীমানাটি Roche lobe নামে পরিচিত। যে বিন্দুতে দুটি তারকার সীমানা রেখা মিলিত হয়, সেখানে মহাকর্ষীয় বলে প্রভাব শূন্য থাকে।

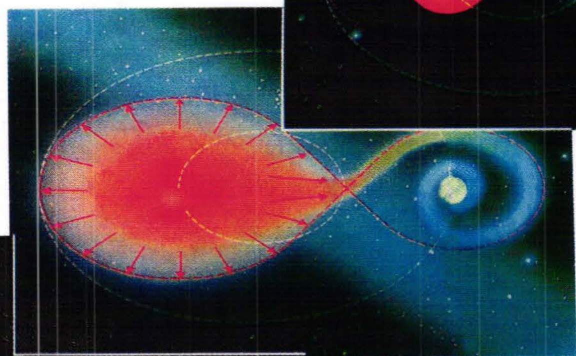

জীবনকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে, তারকা যুগলের যে তারকাটির ভর বেশি, সেটি লাল দানব (Red giant) তারকায় পরিণত হয় এবং এর Roche বৃত্তকে পূর্ণ করে। তারকা ঝড়ের মাধ্যমে কিছু পদার্থ উক্ত তারকা হতে নির্গত হয়ে ছোট তারকাটির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে চক্রাকারে ছোট তারকার দিকে ধাবিত হয় এবং এতে ধীরে ধীরে ছোট ছোট তারকাটির ভর বৃদ্ধি পায়।

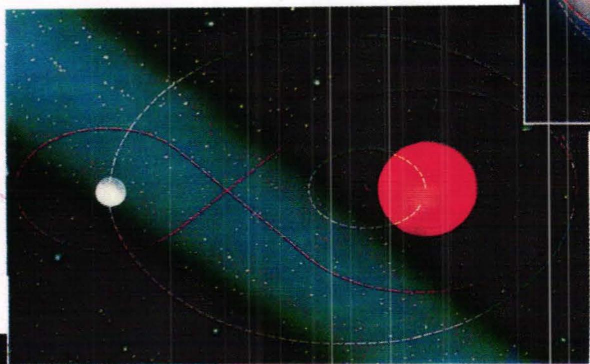

তৃতীয় পর্যায়ে লাল দানব তারকা তার বিবর্তন চক্র সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ে এটি শ্বেত বামন অথবা নিউট্রন তারকাতে পরিবর্তিত হয়। অপর ছোট তারকাটি যা এ সময়ে প্রধান ধারায় রয়েছে, তার ভর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকার কারণে এর বিবর্তনের হার অনেক বেড়ে যায়।

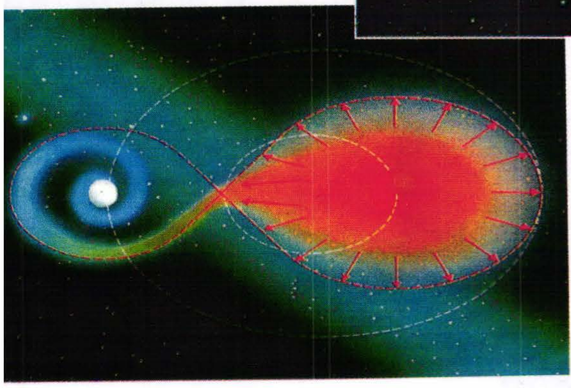

চতুর্থ পর্যায়ে, ছোট তারকাটিও লাল দানব তারকায় পরিণত হয়। এ তারা যুগলের অপর তারকাটির মতই এ নতুন সৃষ্ট লাল দানব তারকাটিও অনেকগুণ প্রসারিত হয়ে এর Roche বৃত্তকে পূর্ণ করে এবং এর কিছু কিছু উপাদান নির্গত করে, যা অপর তারকার দিকে ধাবিত হয়। এরপর কী হবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রথম তারকাটি কী অবস্থায় আছে। পূর্বের তারকাটি যদি একটি শ্বেত বামন হয় তবে এ প্রক্রিয়ায় একটি নোভা সৃষ্টি হবে। আর পূর্বের তারকাটি একটি নিউট্রন নক্ষত্র হলে X-ray বিস্ফোরণ ঘটবে।

www.pathagar.org

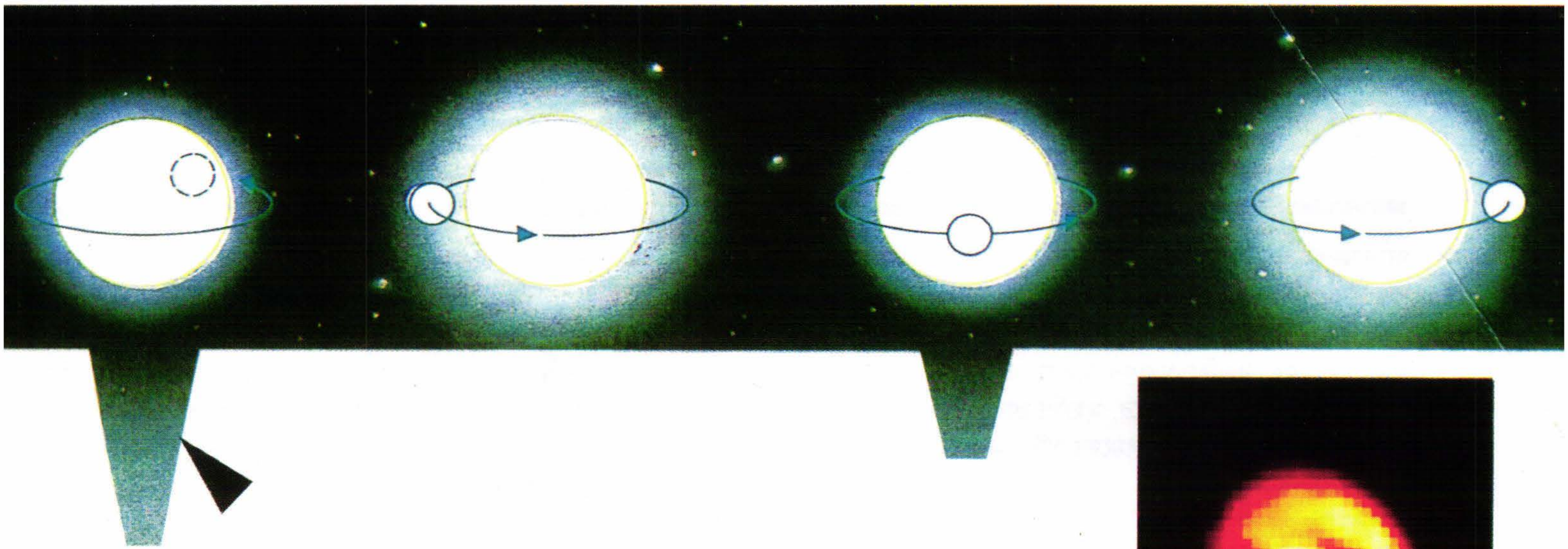

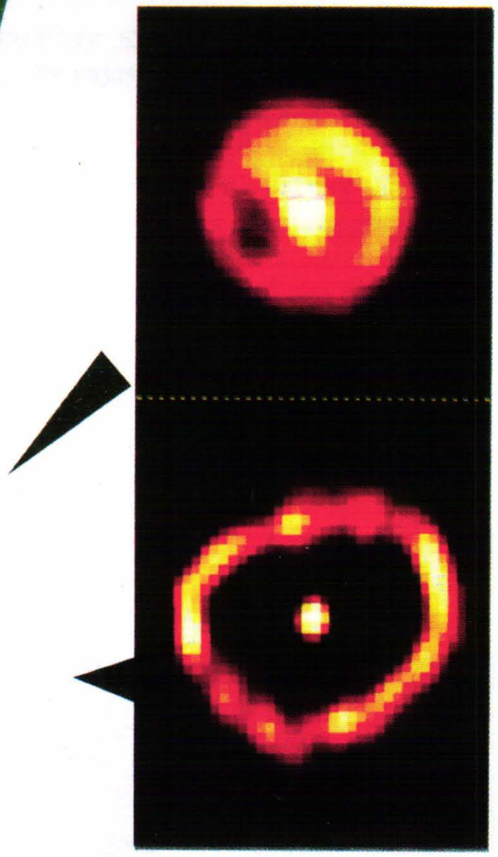

☐ গ্রহণসৃষ্টিকারী তারকাযুগলে (Eclipsing Binary) তারকা দুটি এভাবে অবস্থান করে যে, এরা পারস্পরিক গ্রহণের (Mutual Eclipse) সৃষ্টি করে। ফলে এ তারকাযুগল হতে নির্গত আলোর উজ্জ্বলতা পরিবর্তিত হয়। তারকাযুগলের তারকা দুটি একটির সাপেক্ষে আরেকটি পাশাপাশি থাকলে এদের উজ্জ্বলতা সর্বাধিক হয়। কিন্তু যখন একটি তারকা অপরটির সামনে চলে আসে (এমনকি ছোট তারকাটি বড়টির সামনে এলেও), তখন তারকাযুগলের উজ্জ্বলতা সর্বাধিক হ্রাস পায়।

☐ এ নোভাটি Cygni নামে পরিচিত। এটি ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উৎপন্ন হয়। নোভাটি পৃথিবী হতে ১০,৪৩০ আলোকবর্ষ দূরে Cygnus নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত। এ ছবিটি ১৯৯৩ সালের মে মাসে হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে তোলা। নোভাটি সীমানার কাছাকাছি একটি রিং তৈরি হয়েছে, যা বিস্ফোরণে সৃষ্ট গরম গ্যাসসমূহকে নির্দেশ করে।

☐ দ্বিতীয় চিত্রটি প্রাথমিক বিস্ফোরণের তিন মাস পর তোলা। নোভাটির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সীমানা ৭৪ থেকে ৯৬ বিলিয়ন মাইল প্রসারিত হয়েছে।

"(আল্লাহ) তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন নক্ষত্ররাজি- যেন তোমরা স্থলে ও সমুদ্রপথে অন্ধকারে চলতে তাদের সাহায্যে দিশা পেতে পার। আমরা বিস্তারিতভাবে নির্দেশনাবলী ব্যক্ত করেছি জ্ঞানীদের জন্য।

সূরা আল-আনয়াম, আয়াত : ১৯৭

www.pathagar.org

মহাবিস্ফোরণ
THE BIG BANG

গ্যালাক্সীগুলো সর্বদা একে অপর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। ধারণা করা হয়, সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিশ্বের সকল পদার্থ ও শক্তি এক সাথে অতি ক্ষুদ্র স্থানে পুঞ্জীভূত অবস্থায় ছিল। মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হয়।

ধারণা করা হয়, মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সংঘটিত হয়েছিল বিস্ফোরণের প্রথম এক সেকেন্ডেরও অতি কম সময়ে। প্রশ্ন আসতে পারে, মহাবিস্ফোরণের আগে কী ছিল? প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, মহাবিস্ফোরণের সাথে সাথে সময়ের সৃষ্টি। মহাবিস্ফোরণের পূর্বে সময়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং মহাবিস্ফোরণের আগে কী ছিল তা প্রশ্ন করাই অযৌক্তিক।

সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে এ বিশ্বজগৎ সম্প্রসারিত হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির ক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেছেন।

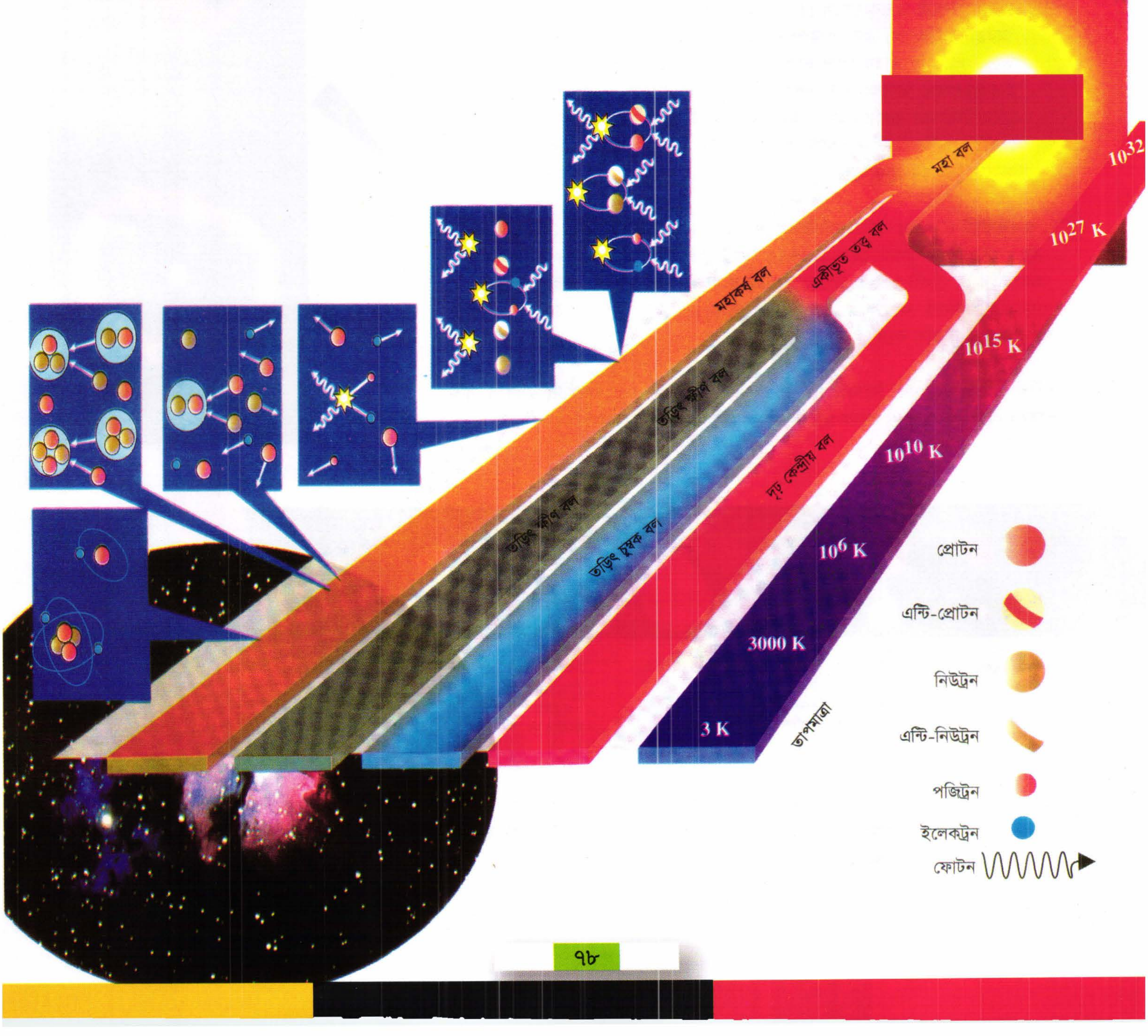

www.pathagar.org

সৃষ্টির একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, মহাবিস্ফোরণের ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময় পরও স্থান (Space) এবং সময় (Time) সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিল। জগতে বর্তমানে বিদ্যমান সকল বল একই সাথে মহাবল (Super Force) হিসেবে ছিল। এ সময়কাল প্লাঙ্ক সময় (Planck Time) হিসেবে পরিচিত। পদার্থবিদ্যার তত্ত্বসমূহের সৃষ্টিও এ সময়ে, এ জন্যই এ সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলো কখনোই বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

১০$^{-৩৫}$ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে স্থান (Space) এর যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে এবং সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে ১০^{২৭}K-এ নেমে আসে। এ সময়ের মধ্যে আলাদা বল হিসেবে মহাকর্ষ বলের (Gravity) সৃষ্টি হয় এবং একীভূত তত্ত্ব বল (Grand Unified Theory Force) আলাদা হয়ে দৃঢ় কেন্দ্রীয় বল (Strong Nuclear Force) এবং তড়িৎ ক্ষীণ বলের (Eletroweak Force) সৃষ্টি করে। সাথে সাথে কোয়ার্ক (Quark), লেপটন (Lepton) এবং এদের বিপরীত কণা (Anti Particle) তৈরি হয়।

১০$^{-১২}$ সেকেন্ড সময়ে তড়িৎ ক্ষীণ বল (Electroweak Force) ভেঙে তড়িৎ চুম্বক বল (Electromagnetic Force) এবং ক্ষীণ কেন্দ্রীয় বল (Weak Nuclear Force) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বল প্রকৃতির চারটি মৌলিক (Fundamental) বলে আলাদা হয়ে পড়ে এবং এদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা ভাবে বোঝা যায় । কণা এবং এদের বিপরীত কণার সৃষ্টি (Creation) এবং ধ্বংস (Annihilation) একই সাথে চলতে থাকে এবং লেপটন (Lepton), নিউট্রিনো (Neutrino) এবং ইলেকট্রন (Electron) বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের অতি উচ্চ তাপমাত্রা কোয়ার্ককে বড় কণা সৃষ্টিতে বাঁধা প্রদান করে বলে এ সময়ে কোয়ার্ক তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে পৃথকভাবে অবস্থান করে।

১০$^{-৬}$ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে কোয়ার্ক আর নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে অবস্থান করতে পারে না বলে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রোটন (Proton) এবং নিউট্রন (Neutron) সহ মেসন (Meson) কোয়ার্কের বিপরীত কণাও একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ (প্রতি বিলিয়নে একটি) ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে অবস্থান করে এবং এ অবশিষ্ট কণাই বর্তমান বিশ্বজগতের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছে। এ প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ ফোটনেরও (Photon) সৃষ্টি হয়।

প্রথম সেকেন্ড সময় শেষে তাপমাত্রা ১০^{১০}K -তে নেমে আসে। ৫ সেকেন্ড পর নিউট্রিনো (Neutrino) এবং বিপরীত নিউট্রিনো (Anti Neutrino) এর সাথে অপর বস্তুকণার সংস্পর্শ বন্ধ হয়ে যায়। ১০ সেকেন্ড সময়ে প্রোটন এবং নিউট্রন ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস (Deuterium Nuclei) সৃষ্টি করে। মহাবিস্ফোরণের ১ থেকে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে দৃঢ় কেন্দ্রীয় বল (Strong Nuclear Force) তার প্রাধান্য স্থাপন করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (Helium Nuclei) তৈরি করে। এ সময়ে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের আপেক্ষিক অনুপাত নির্ধারিত হয়ে যায়।

মহাবিস্ফোরণের মোটামুটি ৩০০,০০০ বছর পর, বিশ্বজগতের তাপমাত্রা ৩০০০K-তে নেমে আসে। ফলে তড়িৎ চুম্বক বল নিউক্লিয়াসকে ধরতে সহায়তা করে। ফলশ্রুতিতে প্রথমবারের মত ফোটন (Photon) কোন বস্তুর সাথে সংঘর্ষ ব্যতীত দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়। এটি কসমিক বিকিরণের জন্ম দেয়। যেহেতু কসমিক বিকিরণ চাপ বিশ্বজগতের গঠন উপাদানসমূহ হতে আলাদা হয়ে পড়ে, সেহেতু পরমাণুসমূহ মহাকর্ষীয় বলকে অনুভব করে এবং একত্রিত হয়ে বিশ্বজগতের উপাদানসমূহ সৃষ্টি করে।

মহাবিস্ফোরণ যা থেকে আমাদের এ বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তা সংঘটিত হয়েছিল আজ থেকে ১০-১৫ বিলিয়ন বছর আগে। স্টিফেন হকিং একজন সহযোগী বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে সম্প্রতি 'বিগব্যাং' -এর অব্যবহিত আগের অবস্থার একটি গাণিতিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'Hick's Field' নামক তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের সাহায্যে এ অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়।

"এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই"
সুরা আল-বাকারা : ২

www.pathagar.org

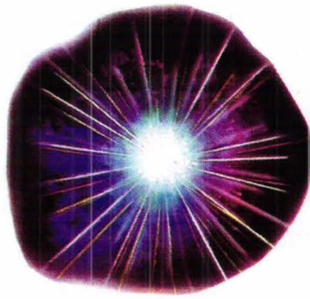

গ্যালাক্সীপুঞ্জ
(Cluster of Galaxies)

পৃথিবীর সৃষ্টি ঃ প্রায় ১৩০০ কোটি বছর আগে "বিগ ব্যাং" বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করে। 'সিঙ্গুলারিটি' Singularity নামক অসীম ঘনত্বের বিন্দু অবস্থা হতে মহাবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে গ্যালাক্সি সৃষ্টি করে। গ্যালাক্সিগুলোর অভ্যন্তরে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান নীহারিকা ঘনীভূত হয়ে তৈরি হয় নক্ষত্র। সূর্যের মত কিছু নক্ষত্রের চারপাশে গঠিত হয় পৃথিবীর মত গ্রহ।

ছায়াপথ
(Milkyway)

তারকাপুঞ্জ
(Cluster of Stars)

পৃথিবী
(Earth)

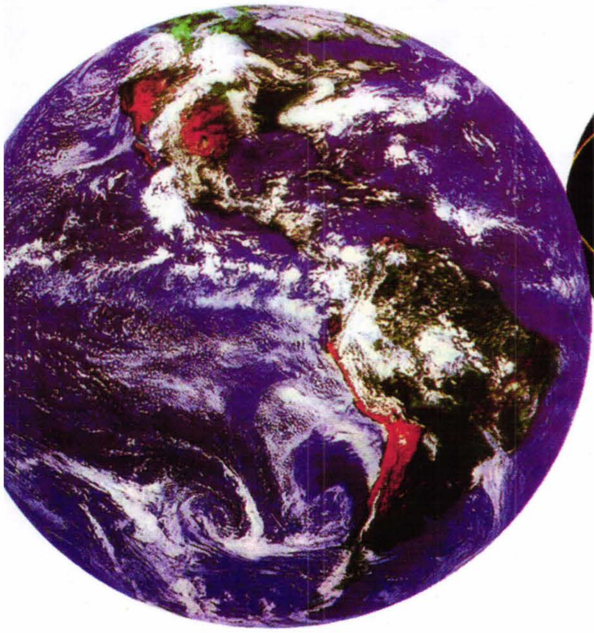

সৌরজগৎ
(Solar System)

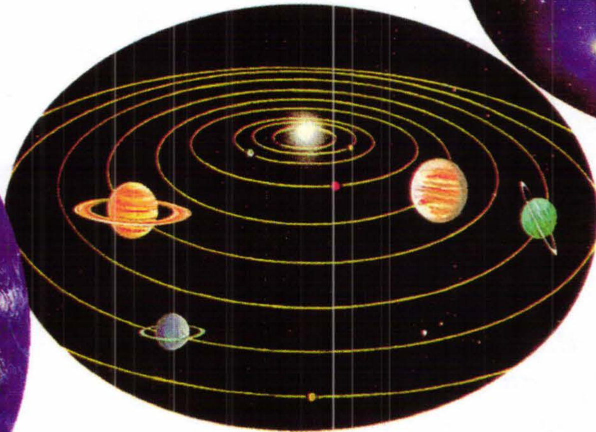

"আকাশমন্ডলী, আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি ক্ষমতাবলে।
নিশ্চয়ই আমি তাকে সম্প্রসারিত করেছি।"
সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭

মহাজাগতিক বস্তু	ব্যাপ্তি (১ আলোকবর্ষ=৯,৪৬১ কি.মি.)
পৃথিবী	৬৪০০ কি.মি.
সৌরজগৎ	০.১ আলোকবর্ষ
মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি	১ লক্ষ আলোকবর্ষ
মহাবিশ্ব	২৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ

www.pathagar.org

মহাবিশ্বের পরিণতি
THE FATE OF THE UNIVERSE

যদি প্রশ্ন করা হয়, "এ মহাবিশ্বের পরিণতি কী?" প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। আমাদের এ মহাবিশ্ব সদা সম্প্রসারণশীল। ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের এ সম্প্রসারণ হলো আদি মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) ফলাফল। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, "এ সম্প্রসারণ কি চলতেই থাকবে?" এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিশদ জানতে হবে।

মহাবিশ্বের সামগ্রিক ভর নির্ণয় একটি খুব কঠিন কাজ। আর আমাদের মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এটি নির্ণয় অতি জরুরি। মহাবিশ্বের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এ মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্বকে একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের (সঙ্কট ঘনত্ব বা Critical Density) সাথে তুলনা করা হয়। এ সঙ্কট ঘনত্বের মান হল ১০$^{-৩০}$ থেকে ১০$^{-২৯}$ গ্রাম/সি সি।

ঘনত্বের মান সঠিকভাবে নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন বলে মহাবিশ্বের স্বরূপ নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে গ্যালাক্সিসমূহে মহাবিশ্বের বক্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

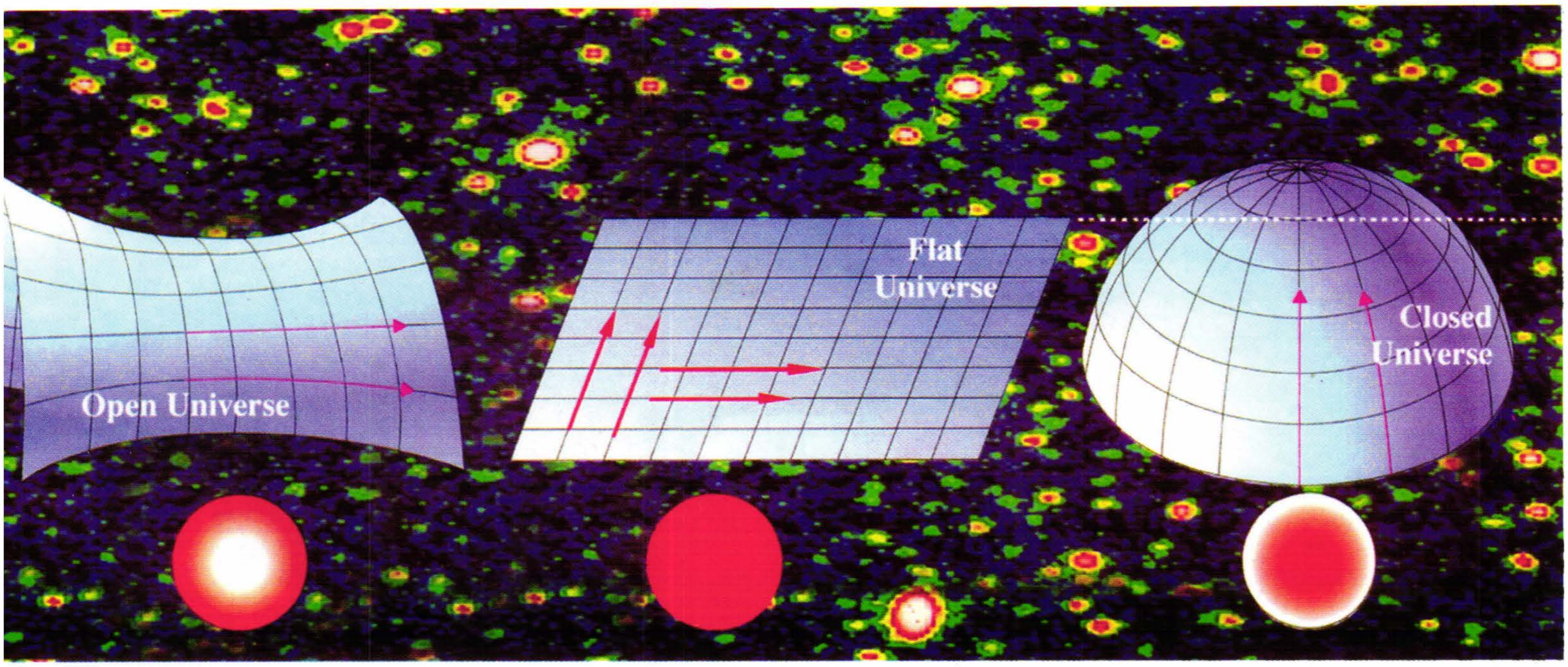

Open Universe: খোলা মহাবিশ্বে স্থানের (স্থান-কালের) আকৃতি হবে অধিবৃত্তীয় বা ঘোড়ার জিনের মত। এক্ষেত্রে সমান্তরাল রেখাসমূহ ক্রমে দূরে সরে যায়। খোলা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের চেয়ে কম হবে বলে বর্ণনা করা হয়। খোলা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সর্বদা চলতেই থাকবে এবং এদের ক্ষেত্রে দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহকে নিকটবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের তুলনায় অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট মনে হবে।

Flat Universe : সমান মহাবিশ্বে সমান্তরাল রেখাসমূহ চিরকালই সমান্তরাল থাকবে এবং গ্যালাক্সীসমূহে বস্তুর বণ্টন একই মনে হবে। এক্ষেত্রে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের সমান হবে এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অসীম (Infinite) কোন সময়ে গিয়ে শেষ হবে।

Closed Universe : বদ্ধ মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি অর্ধগোলক পৃষ্ঠের মতো। এক্ষেত্রে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হয় এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এক সময় থেমে যাবে। বদ্ধ মহাবিশ্বে দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহকে নিকটবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের তুলনায় কম ঘনত্ববিশিষ্ট মনে হবে।

বর্তমানে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এ মহাবিশ্ব হয়তো তা সমতল এবং অসীম সময় পর্যন্ত এর সম্প্রসারণ চলতে থাকবে এবং এর পর থেমে যাবে।

www.pathagar.org

এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। বস্তুসমূহ তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের কোয়ান্টা বা ফোটন প্রতিফলিত বা নির্গত করে বলে আমরা বস্তুসমূহকে দেখতে পাই। প্রশ্ন উঠতে পারে, "এমন কোন বস্তু আছে কিনা, যা এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি?" জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা- এরকম বস্তুর অস্তিত্ব আছে এবং শুধু অস্তিত্বই নয় বরং তা আমাদের পরিচিত বস্তুসমূহকে পরিমাণে ছাড়িয়ে যায়। ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের ৯০ শতাংশ এ অনাবিস্কৃত বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত! এ অদৃশ্য বস্তুসমূহ "কৃষ্ণবস্তু" নামে পরিচিত। এসব অনাবিস্কৃত "কৃষ্ণ বস্তুর" প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব হতে পারে।

আমাদের এ মহাবিশ্ব সমতল বা উন্মুক্ত যা-ই হোক না কেন, অনন্তকাল পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু তাই এটি মনে করা ঠিক নয় যে, গ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিগুলোর অস্তিত্ব অনন্তকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। মহাবশ্বের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে এর মধ্যে কী পরিমাণ বস্তু অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে তার ওপর। এ বিশ্বজগতের সকল নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিগুলো এদের চারপাশে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে সর্বদা তাপ বিকিরণ করে চলছে। ধারণা করা হয়, এভাবে তাপ বিকিরণ করতে করতে এক সময় এদের মৃত্যু ঘটবে। আজ থেকে অনেক অনেক কাল পরে, মোটামুটি দশ হাজার কোটি বছর পর নক্ষত্রগুলো তাদের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছাবে। নক্ষত্রের তিনটি চূড়ান্ত অবস্থা হতে পারে। এগুলো হলো- শ্বেত বামনত্ব (White Dwarf), নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron Star) এবং কৃষ্ণ বিবর (Black Hole)।

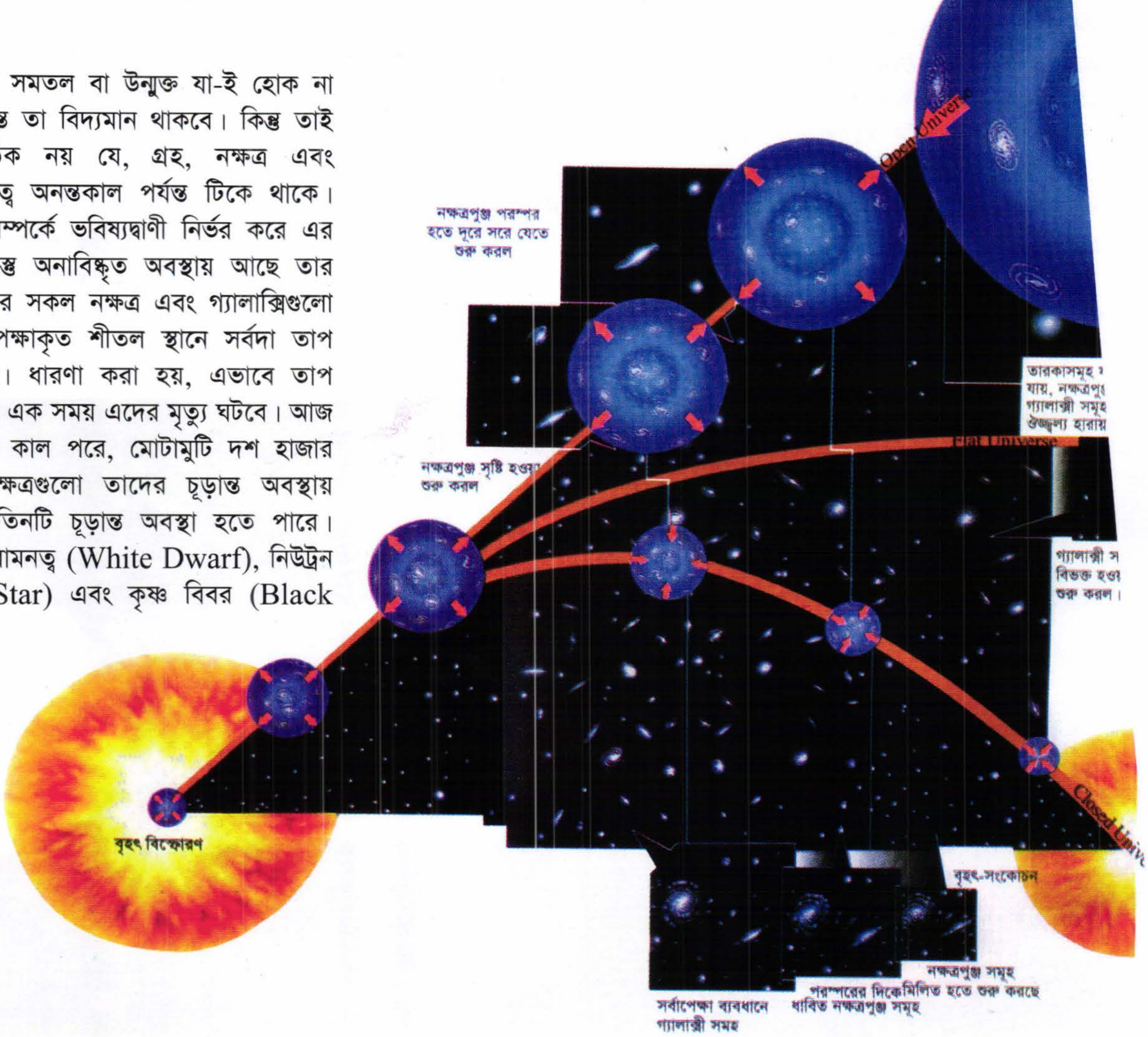

এগুলো ব্যতীত ছোট ছোট পদার্থের টুকরো যেমন- গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ইত্যাদি অবস্থান করবে। এরা সকলেই আকর্ষণ বলের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে পরস্পরের সাথে একত্রে থাকবে। দলগুলো এক অপরের থেকে অনেক দূরে দূরে থাকবে এবং পরস্পর থেকে আরো দূরে সরে যেতে থাকবে। সময়ের সাথে সাথে অধিকাংশ নক্ষত্র এ দলগুলো হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলো একত্রে বিরাট কৃষ্ণ বিবরে (Black Hole) পরিণত হবে। ধারণা করা হয়, এ কৃষ্ণ বিবরও চিরস্থায়ী হবে না। বরং হকিং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় (Hawking Radiation Process) কৃষ্ণ বিবরের ভিতরের বস্তুসমূহ কৃষ্ণ বিবর থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। এ প্রক্রিয়ার ফলে কৃষ্ণ বিবরের ভর হ্রাস পেতে থাকবে এবং সাথে সাথে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সবশেষে, কৃষ্ণ বিবরের সর্বশেষ বস্তুটিও বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং এতে হয়তোবা প্রচন্ড একটি বিস্ফোরণ ঘটবে। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পর এ বিশ্বজগৎ তাপমাত্রার সাম্যাবস্থায় পৌছাতে পারে। তখন বিশ্বজগতে শুধুমাত্র উপ-আণবিক (Sub-Atomic) কণাসমূহ অবস্থান করবে। সকল কণা একই তাপমাত্রায় থাকবে এবং আর কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না। আর যদি কোন পরিবর্তনই সাধিত না হয়, তবে সময়ের অস্তিত্বও বোঝা যাবে না। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা, এ অবস্থার পর মহাবিশ্বের পুনর্জন্ম হবে। সে জগৎ হয়তো হবে আমাদের বর্তমান জগৎ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ।

"সেদিন (রোজ কিয়ামতে) আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়।"
সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৪

www.pathagar.org

আল কুরআনে নবী ও রাসূলগণ

১ হযরত আদম (আ)

হযরত আদম (আ)কে স্বয়ং আল্লাহপাকের নির্দেশনায় জান্নাতের মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়। তিনিই প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। আদম শব্দটির অর্থ পৃথিবী। কেননা পৃথিবীর মাটি থেকে আদমকে (আ) পয়দা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন--" *আল্লাহ আদম (আ)কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে হও আর এমনি সে হয়ে গেল।*" (আল ইমরান, আয়াত: ৫৯)। শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত সকল ধর্মের মানুষ পবিত্র একটি পাহাড়কে আদমের (আ) পাহাড় বলে, যেখানে আদম (আ) পবিত্র জুম্মার দিনে অবতরণ করে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, "*আমি (আল্লাহ) বললাম যে, তোমরা সকলেই এখান (বেহেশত) থেকে নেমে যাও--।*" (বাকারা: ৩৮)। সেই পাহাড়ে আজও আদম (আ) এর পদচিহ্ন কালের সাক্ষী হয়ে আছে। ইংরেজিতে পাহাড়ের সেই শৃঙ্গকে Adams Peak এবং স্থানীয় ভাষায় 'চুজ' বলে। আদম (আ) তাঁর সঙ্গীনী হাওয়া (আ) এর অনুসন্ধানে পক প্রণালীর দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে তৎকালীন ভারতবর্ষে

আদম (আ)-এর পদচিহ্ন

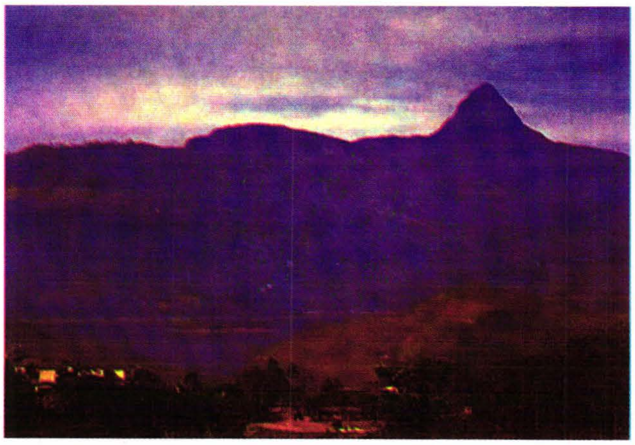

আদম (আ) -এর পাহাড়

পক প্রণালীর দ্বীপপুঞ্জসমূহকে বিশ্ব মানচিত্রে আজও এডাম'স ব্রীজ বা আদমের সেতু বলা হয়। হাওয়া (আ) আজকের আরবের জিদ্দায় অবতরণ করেন। তিনি হলেন মানবজাতির আদি মাতা, সে হিসেবে তাকে দাদীও বলা যায়। সেখান থেকেই অবতরণস্থলের নাম দাদী বা আরবিতে জিদ্দাতুন থেকে জিদ্দা রাখা হয়েছে। আদম (আ) ও বিবি হাওয়া-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে মক্কার অদূরে আরাফাতের 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে। আদম (আ) এর বংশধরের সংখ্যা ছিল চার হাজার।

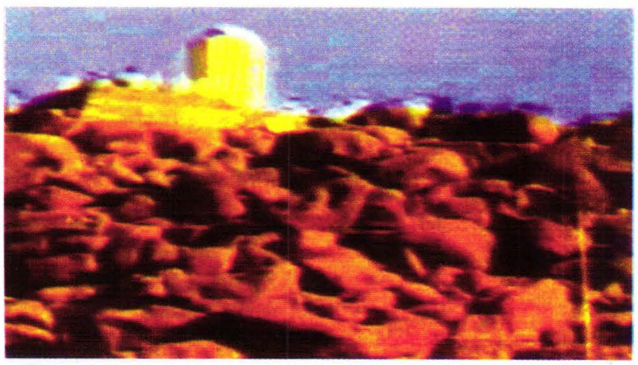

জাবালে রহমত

২ হযরত ইদ্রিস (আ)

হযরত ইদ্রিস (আ) মিশরের আনাপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিব্রু ও সুরিয়ানি ভাষায় তাঁর নাম খনুক এবং আরবি ভাষায় আখনুক। ইদ্রিস তাঁর লকব। আরবি দরস শব্দ থেকে ইদ্রিস শব্দের উৎপত্তি। তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, " ...আর স্মরণ কর এই কিতাবের ইদ্রিস (আ) এর কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।" (সূরা মারিয়াম : ৫৬-৫৭ আয়াত) তিনি একটি আংটি পরতেন। সেই আংটিতে লিখা ছিল "আল্লাহর প্রতি ঈমানের সহিত ধৈর্য অবলম্বনে বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়।"

www.pathagar.org

তার কোমরবন্ধের ওপর লিখিত ছিল "প্রকৃত ঈদ ফরজসমূহ আদায় করার মধ্যে নিহিত। দ্বীনের পূর্ণতা শরিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট আর মানবতার পূর্নতাই দ্বীনের পূর্ণতা।" সে সময় ৭২টি ভাষা প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তাঁর উপর ৩০টি ছহীফা নাযিল করেন। গ্রীক পণ্ডিতগণ তাঁকে হিপোক্রেটিস বলেন। এই হিপোক্রেটিসই ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। তিনি সপ্তাহে ৩ দিন লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং ৪ দিন বিদেশ সফর করতেন। তিনি কলম আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতি চালু করেন। তাঁর স্মরণীয় বাণী হল, 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই আত্মার জীবন।'

৩ হযরত নূহ (আ)

হযরত নূহ (আ) ফোরাত ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী চৌদ্দ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের অধিবাসী সুমেরীয় মূর্তিপূজকদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। সুমেরীয় মূর্তিপূজকরা নূহ (আ) এর কথায় সাড়া না দিয়ে প্রকাশ্যে খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়। নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার তকতা দিয়ে বিশাল জাহাজ নির্মাণ করেন। যার প্রতিটি তকতায় এক একজন নবীর নাম লেখা ছিল। নূহ (আ)এর জাহাজের দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত, প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। যা ছিল ৩ তলা বিশিষ্ট। ৮০ জন ঈমানদার নারী ও পুরুষ এবং প্রতিটি প্রজাতির এক জোড়া প্রাণী নিয়ে প্লাবনের পূর্বে জাহাজে উঠেছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩২ সালে বর্তমান ইরাকের উর শহরের গুরপাক নামক স্থানকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম প্লাবন শুরু হয় এবং সবকিছু নিচে তলিয়ে যায়। দীর্ঘ দিন পরে এই নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে থামে।

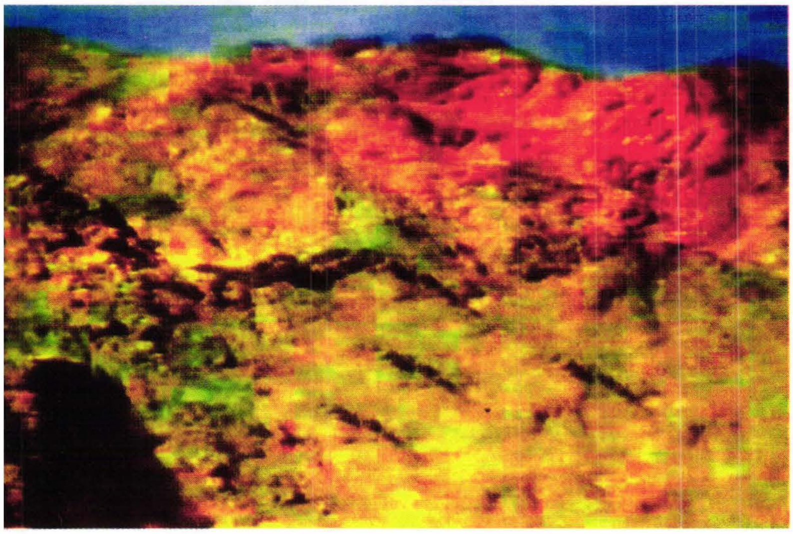

জুদি পাহাড়

জুদি পাহাড় যা নূহ (আ) এবং তাঁর সময়কার প্লাবনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জুদি পাহাড় আরমেনীয় আরারাত পর্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এটা ৩৮০০ ফুট উঁচু। জুদি পাহাড় কুর্দিস্থান, তুরস্ক এবং আরমেনিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন, "-- হে পৃথিবী, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো এবং নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে থামল এবং বলা হলো জালিম সম্প্রদায় দূর হয়ে গেলো।" (সূরা-হূদ আয়াত : ৪৪) প্লাবনের পর নূহ (আ)এর তিন পুত্র জীবিত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁদের বংশধরগণই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

৪ হযরত হূদ (আ)

হযরত হূদ (আ) আজ থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নূহ (আ) এর পুত্র শামের বংশধর বনী আদম গোত্রকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান করেন। বর্তমানে তাঁর জন্মস্থানের নাম আহকাব বা উবার নগরী। হূদ (আ) এর কবরস্থান হাজরা মাউতের কাসিরে আহমার অর্থ্যাৎ লাল টিলার চূড়ায় অবস্থিত। আদ জাতির রাজধানী ছিল ইয়ামান। বনী আদ গোত্রকে আমালিকা সম্প্রদায়ও বলা হয়। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আদ জাতিকে তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "--আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে।" (আল-হাক্কা : ৬) আদ শব্দের অর্থ উচ্চ। হূদ (আ) এর সময়কালীন স্বৈরাচারী বাদশা শাদ্দাদকে তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

৫ হযরত সালেহ (আ)

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে 'হিজর' নামক স্থানে হযরত সালেহ (আ) জন্মগ্রহণ করেন। হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সামুদ জাতির বাসস্থান ছিল। তিনি সাম নবীর বংশীয় সামুদ বাদশার গোত্র সামুদ জাতির নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাঁর সময় বিশ্বাসীর সংখ্যা ছিল চার হাজার। সামুদ শব্দের অর্থ স্বল্প পানি।

এই জাতি পানি সঙ্কটে জর্জরিত ছিল। আল্লাহ সামুদ জাতির পানি পান করার লক্ষ্যে একটি কূপ দান করেছিলেন। সামুদ জাতি সালেহ (আ)এর নিকট যখন মু'জেজা দাবি করলো, তখন আল্লাহর হুকুমে পাথুরে পাহাড় থেকে একটি উটনী বের হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রসব করতঃ বাচ্চাকে দুধ পান করাতে শুরু করলো। এই মুজেজা দেখে কিছু লোক দ্বীন গ্রহণ করলো আর কিছু লোক নবীকে জাদুকর বলে আখ্যা দিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, " -- আমাকে কেউ নিষেধ করেনি তবে শুধু এ কারণে পাঠাইনি যে তাদের লোকরা সে সবকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, সামুদকে আমি উটনী এনে দিলাম আর তারা তার ওপর জুলুম করল। আমি নিদর্শন তো এ জন্যই পাঠাই যে লোকেরা তা দেখে ভয় করবে।" (বনি ইসরাইল: ৫৯)

সামুদ গোত্র খুব শক্তিশালী ছিল। তারা পাহাড় খনন করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করত। বর্তমানে এলাকাটি সৌদি আরবের 'ময়দানে সালেহ' নামে পরিচিত। সামুদ জাতির লোকেরা নিষিদ্ধ উট জবাই করার অপরাধে আল্লাহ তাদেরকে বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন।

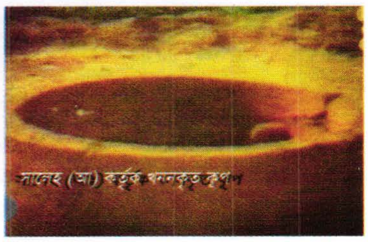

সালেহ (আ) কর্তৃক খননকৃত কূপ

www.pathagar.org

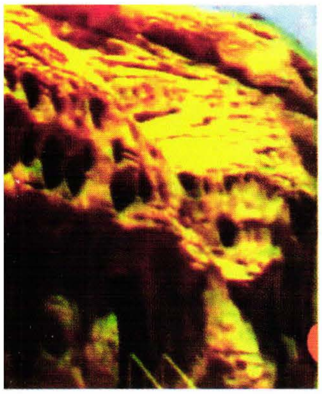

সামুদ জাতির ধ্বংসস্তূপ

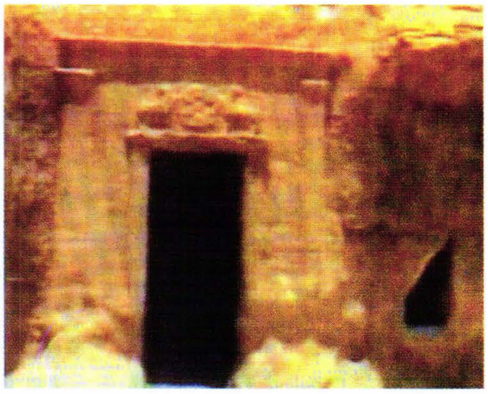

সামুদ জাতির বাড়িঘর

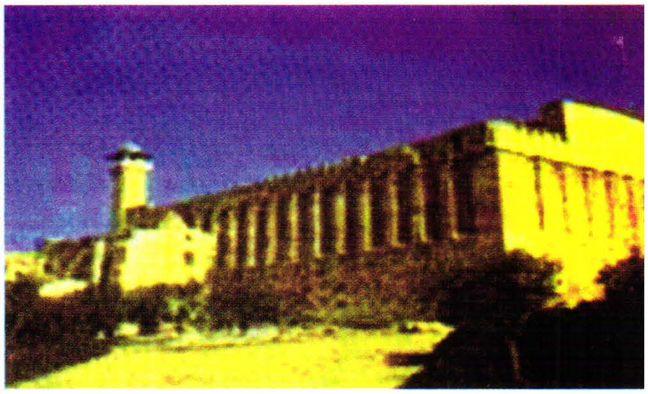

ইব্রাহিম (আ)-এর কবর

৬ হযরত ইব্রাহীম (আ)

আল কুরআনে বর্ণিত নবীদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ) ষষ্ঠতম। তাঁর পিতা অগ্নিপূজক আজর ছিল নমরুদের মন্ত্রী। ইরাকের নাসিরিয়া থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার এবং বাগদাদ থেকে ৩৯৬ কিলোমিটার দূরে 'উর' নামক স্থান যা প্রাচীন বাবেল শহর নামে পরিচিত। এখানে একটি বিধ্বস্ত দোতলা বাড়ি, যেখানে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ) প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে ইব্রাহিম (আ)-এর সময়ে এই নগরীতে ৪০ ফুট উঁচু ১১৮০টি মন্দির ছিল।

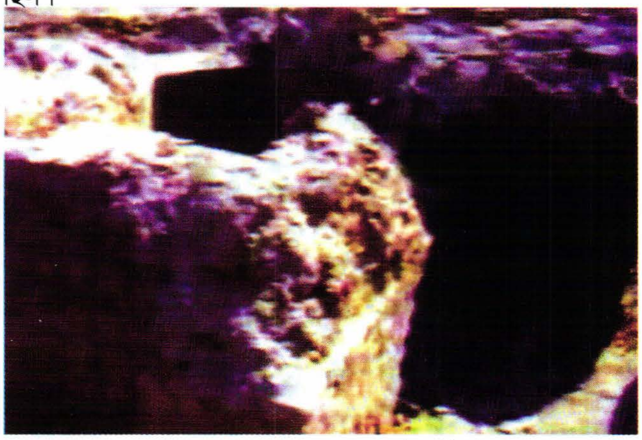

ইব্রাহিম (আ) এর আবাস

বাবেল শহরের ম্যাকফেলা গুহায় তাঁর কবর রয়েছে। হিট্রিদের কাছ থেকে তিনি গুহাটি ক্রয় করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে শিশু পুত্রসহ বিবি হাজেরাকে মক্কা উপত্যকায় নির্বাসন দান করেন। ইব্রাহীম (আ) ফিলিস্তিনে ফিরে গিয়ে দেখেন সারার গর্ভের হযরত ইসহাক এর জন্ম হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) সম্মিলিতভাবে কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর নাম কুরআনের ২৫টি সূরায় ৬৯ বার আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

তনি ১৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির পিতা। এছাড়া ইব্রাহিম (আ)-এর বংশে মানবজাতির অসংখ্য নেতা জন্মগ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন "---আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করতে চাই, তিনি ইব্রাহিম (আঃ) বললেন আমার সন্তানদের প্রতিও কি এই ওয়াদা? তিনি (আল্লাহ) উত্তরে বললেন আমার এ প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য নহে।" (সূরা বাকারা : ১২৪)

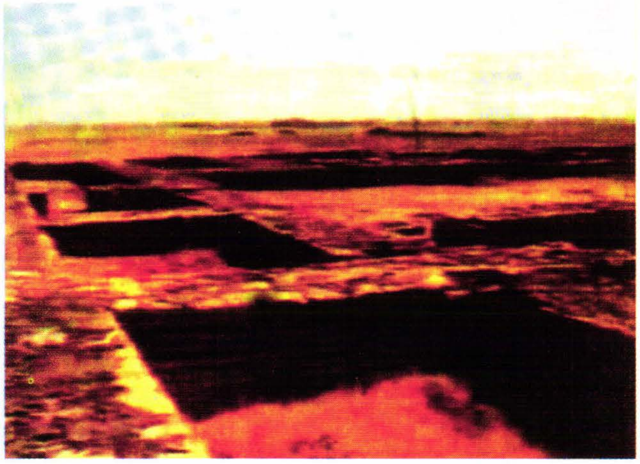

নমরুদ প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ

ইব্রাহিম (আ)-এর সময় রাষ্ট্রপ্রধান ছিল নমরুদ। নমরুদের রাজ্য ছিল বাবেল, ইরাক ও কলোনী অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। অতঃপর আল্লাহর গজব মশা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নমরুদ মৃত্যুবরণ করে। তাকে এই কবরে দাফন করা হয়।

নমরুদের মন্দির

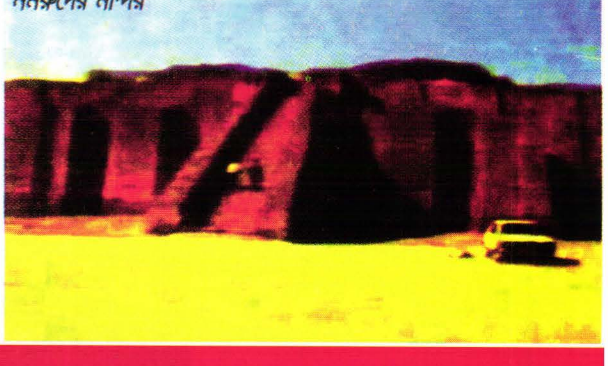

www.pathagar.org

৭ হযরত লুত (আ)

লুত শব্দের অর্থ জড়িয়ে যাওয়া, এঁটে যাওয়া। লুত (আ) ইব্রাহিম (আ)-এর একান্ত প্রিয়ভাজন ও অন্তরঙ্গ ছিলেন বলেই তার নাম লুত হয়। প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে লুত (আ) বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্রাহিম (আ)-এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি সামুদ গোত্রের নিকট প্রেরিত হন। তাঁর গোত্রের লোকেরা সমকামিতা (Sodomy), বণিকদের সম্পদ লুন্ঠনসহ যাবতীয় অপকর্মে লিপ্ত থাকত। কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তোমরা কি ঐ সমস্ত লোক নও যে তোমরা পুরুষদের সাথে অপকর্ম করছ, ডাকাতি করছ, নিজেদের মজলিসসমূহে এবং পরিবার পরিজনের সম্মুখে অশ্লীল কার্য করছ।" (সূরা আন কাবুত : ২৯)

মৃত সাগর

এই সমকামিতার অপরাধে এবং ফেরেশতাদের সাথে খারাপ আচরণের কারণে আল্লাহ সামুদ গোত্রের বস্তিসহ জমিনকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। এই সাগর ৮৩ কিলোমিটার লম্বা, ১৮ কিলোমিটার প্রস্থ এবং ১০০০ ফুট গভীর। অতিরিক্ত লবণের কারণে পানির ঘনত্ব অত্যধিক বেশি যার ফলে কোন মানুষ পানিতে ডোবে না।

৮ হযরত ইসমাঈল (আ)

ইব্রাহিম (আ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ) আজ থেকে প্রায় তিন হাজার নয়শত দশ বছর আগে আজকের ফিলিস্তিনের হেবরুনে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিম (আ) আল্লাহর নির্দেশে শিশু পুত্রসহ বিবি হাজেরাকে মক্কা উপত্যকায় নির্বাসন দান করেন। ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- "আর ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুত- প্রত্যেককেই আমি সারাবিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি"। (সূরা আনআম: আয়াত ৮৬)

নির্বাসনে মশকের সঞ্চিত পানি শেষ হওয়ার পর হযরত হাজেরা ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে পানির সন্ধানে সাতবার সায়ী করেন যা বর্তমানে হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হঠাৎ হাজেরা (আ) দেখলেন একজন ব্যক্তি জিব্রাইল (আ) মাটিতে আঘাত করছেন। অতঃপর পানি বের হওয়া শুরু হলো। হাজেরা (আ) পানি সংগ্রহ করে পাথর দিয়ে বাঁধ দিলেন, যা জমজম কূপ হিসেবে পরিচিত। জমজম শব্দের অর্থ শক্ত করে বাঁধ দেয়া। ইসমাঈল (আ) ১৩৭ বছর জীবিত ছিলেন।

৯ হযরত ইসহাক (আ)

ইব্রাহিম (আ)-এর যখন একশো বছর এবং বিবি সারাহ-এর বয়স যখন ৯০ বছর তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একজন সন্তানের শুভ সংবাদ দেন। সে সন্তানের নামই ইসহাক (আঃ)। ইসহাক (আ)-এর দু'ছেলে, তারা হলেন ইয়াকুব এবং ইশু। তিনি ১৮০ বছর জীবিত ছিলেন এবং কেনানে মৃত্যুবরণ করেন।

১০ হযরত ইয়াকুব (আ)

ইয়াকুব (আ) কেনান অর্থাৎ আজকের ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি হলো ঈসরাইল। ইব্রানী ভাষায় ইসরা অর্থ গোলাম এবং 'আইল' অর্থ আল্লাহ। অর্থাৎ ঈসরাইল অর্থ 'আল্লাহর বান্দা'। তাঁর পিতা হযরত ইসহাক (আ) এবং মাতা রহীল বিনতে লাবান। ইয়াকুব (আ) ১২ সন্তানের জনক ছিলেন। রাতবীন, শামাউন, লাওয়া, ইয়াহুদ, দাইসাফার, যালুবুন, ইউসুফ, বেনইয়ামীন, দান, নাফতালা, যাদ ও আষার। বেনইয়ামীনকে ইহুদী নাছারা বেঞ্জামিন এবং ইউসুফ (আ)-কে জোসেফ বিকৃত নামে ডাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্বন্ধে বলেন, "---এবং আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকুব, আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎ কর্মপরায়ণ।" (আম্বিয়া :৭২) ইয়াকুব (আ) ১৪৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং ফিলিস্তিনের হেবরুনে তাঁকে দাফন করা হয়।

১১ হযরত ইউসুফ (আ)

ইউসুফ (আ) ছিলেন ইয়াকুব (আ) এর ১১তম সন্তান। একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন ১১টি গ্রহ তাঁকে সিজদা করছে। উক্ত ঘটনা ইয়াকুব (আ)-কে বলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর ভাইয়েরা ঘটনাটি জেনে গেলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে Douthan নামক স্থানে এক অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল। মিশরগামী বাণিজ্য কাফেলা কূপের ভেতর বালতি নিক্ষেপ করলেই ইউসুফ (আ) সেটা ধরে ফেললেন এবং বালতিসহ তিনি উপরে উঠে আসেন। তৎক্ষণাৎ তারা এ ফুটফুটে কিশোরকে মিশরের বাজারে নিয়ে গেলে মিশরের বাদশা আজিজ তাঁকে দাস রূপে ক্রয় করে নেন।

ইউসুফ (আ) এর নহর

www.pathagar.org

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, " একটি যাত্রীদল এলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠালো। সে তার ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠলো কী সুখবর! এ যে এক কিশোর অতঃপর তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। তারা যা করতে ছিল আল্লাহ সেসব বিষয়ে অবহিত ছিলেন"।
(সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১৯)

এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আজিজের গৃহে তিনি ৬ বছর অবস্থান করার পর তাঁর স্ত্রী জুলেখা কর্তৃক অপবাদ রটনার প্রেক্ষিতে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে বাদশার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণে তিনি কারামুক্ত হয়ে রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অতঃপর খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০৬ অব্দে পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ রামাসিস নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। ইউসুফ (আ) ১১০ বৎসর বয়সে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন।

১২ হযরত আইয়ুব (আ)

আইয়ুব (আ) খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-১৩০০ সনের মধ্যে দক্ষিণ আরবের আওজ আইল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "আর তাঁর আওলাদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুণ।" (সূরা আনয়া : ৮৪)। আইয়ুব (আ) আদওয়ান বংশীয় আরব ছিলেন। তাঁর জামানা ছিল ইয়াকুব (আ) এবং মুসা (আ)-এর মধ্যবর্তীকালে। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর অসুস্থ থাকার পর ১৪০ বছর বয়সে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন। আইয়ুব (আ) ২১০ বছর জীবিত ছিলেন।

১৩ হযরত শুয়াইব (আ)

শুয়াইব (আ) খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৬০০ সালের মধ্যে মাদায়েনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্রাহিম (আ)-এর ছেলে মাদায়েনের বংশধর। রাসূল (সা) তাঁকে 'খতিবুল আম্বয়া' বা নবীদের মাঝে 'শ্রেষ্ঠ বক্তা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মাদায়েনের জনগণের সুবিধার জন্য তিনি একটি কূপ খনন করেন। এই কূপের পানি থেকে জনগণ উপকৃত হত। তিনি মাদায়েন ও আইকা সম্প্রদায়ের নবী হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হন।

মুসা (আ)-এর শ্বশুর ছিলেন শুয়াইব (আ)। মাদায়েনবাসী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আমি মাদায়েনবাসীদের প্রতি তা দর ভ্রাতা শুয়াইব (আ)কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।"
-সূরা আন-কবুত : ৩৬

১৪ হযরত মুসা (আ)

মুসা (আ) ৩২০০ বছর পূর্বে মিশরের সিনাই উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। মুসা শব্দের অর্থ মূশা যার অর্থ নাজাত দানকারী। তিনি বনি ইসরাঈলকে ৪০০ বছরের গোলামী থেকে নাজাত দান করেছিলেন। জন্মের পর থেকে তিনি আল্লাহর কুদরতে ফেরাউন দ্বিতীয় রামাসিসের ঘরে লালিত-পালিত হন। তিনি নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনের নিকট আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যান। ফেরাউন দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং মু'জিযা দাবি করলে তিনি তার হাতের লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং সাথে সাথে তা বিশাল অজগরে পরিণত হয়।

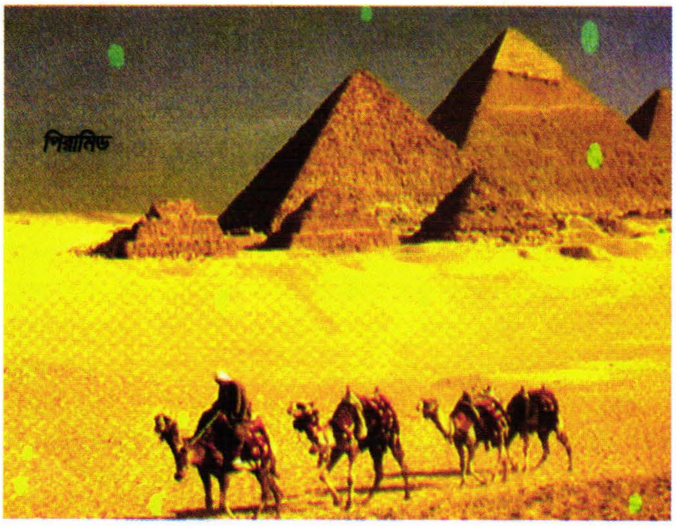

www.pathagar.org

মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে মুসা এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর জুলুম নির্যাতন করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১২৩৫ সালে মূসা (আ) তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। ফেরাউন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মুসা (আ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করে লোহিত সাগরের দিকে রওয়ানা হয়। মুসা (আ) হাতের লাঠি সাগরে নিক্ষেপ করলে বারোটি রাস্তা তৈরি হয়। মুসা (আ) তাঁর সাথীদের নিয়ে সাগর অতিক্রম করেন। কিন্তু ফেরাউন সাগরের মাঝামাঝি আসা মাত্র সঙ্গী সাথীদের সলীল সমাধি ঘটে। মিশরের জাদুঘরে আজও ফেরাউনের লাশ রক্ষিত আছে।

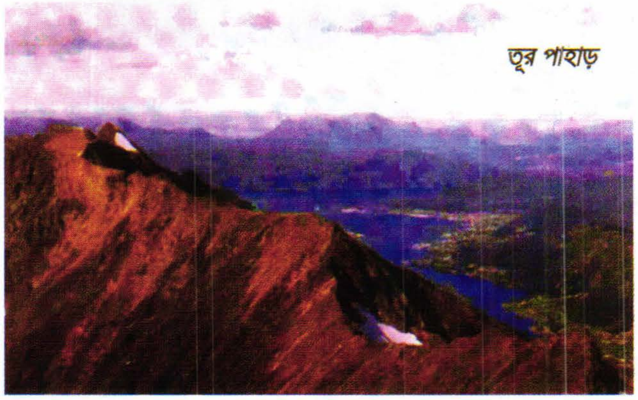
তুর পাহাড়

মূসা (আ) পাহাড়ে আল্লাহতায়ালার সাথে কথা বলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তাঁকে আমি আহবান করেছিলাম তুর পাহাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁকে নিকটবর্তী করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে।" (মারিয়াম, ৫২-৫৩) সমুদ্র সমতল থেকে তুর পাহাড়ের উচ্চতা ৮২৬ মিটার। তুর পাহাড়ে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে তাওরাত নামক আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হন। সমুদ্র অতিক্রম করে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বাইতুল মাকদাস রওয়ানা হন। মরুভূমিতে পানির অভাব হলে হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলে আল্লাহর নির্দেশে পানির ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হতে শুরু করে, যা আজও প্রবহমান।

১৫ হযরত হারুন (আ)

হারুন (আ) ছিলেন মূসা (আ)-এর ভাই। তিনি ছিলেন ইব্রাহিম (আ)-এর সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি মূসা (আ)কে সাহায্যকারী ও প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- আমি তো মূসা (আ)কে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারুনকে তাঁর সাহায্যকারী করেছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম।" (সূরা আল-ফারকান, ৩৫-৩৬ আয়াত) মুসা (আ) যখন চল্লিশ দিন এতেকাফের জন্য গমন করেন তখন হারুন (আ)কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। সিনাই উপত্যকায় থেকে তিনি বনী ইসরাঈলীদের রাফিদিনে পৌছেন। এ জায়গা থেকে হারুন (আ) আল-মারখাওতে যান যেখানে মান্নাহ ও সালওয়া নাজিল হয়েছিল। হারুন (আ) মূসা (আ)-এর ৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ হযরত যুলকিফ্‌ল (আ)

কুরআন মজীদে যুলকিফ্‌ল নামটি দু'বার উল্লেখ হয়েছে। দু'বারই অন্যান্য নবীদের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উল্লেখ হয়েছে সূরা সোয়াদে এভাবে ঃ "ইসমাঈল, আল ইয়াসা আর যুলকিফ্‌ল- এর কথা স্মরণ করো। এরা সবাই ছিলেন উত্তম মানুষ।"

যুলকিফ্‌ল ছিলেন বনি ইসরাঈলের একজন নবী। কেউ কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন আইয়ুব (আ)-এর পুত্র। "যুলকিফ্‌ল" শব্দের অর্থ ভাগ্যবান। এটি ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর মূল নাম ছিল 'বিশর'। তিনি বাইশ বছর যাবৎ বনি ইসরাঈলীদের মাঝে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন।

১৭ হযরত ইলিয়াস (আ)

ইলিয়াস (আ) জর্দানের জিলিয়াদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হারুন (আ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে- "নিঃসন্দেহে ইলিয়াছ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা বায়ালকে ডাকছো অথচ সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিহার করছো? সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের এবং পূর্ব-পুরুষদেরও প্রভু।" (সূরা আস-ছাফ্‌ফাত; আয়াত ১২৩-১২৬)। পবিত্র কুরআনে তাঁর নাম ৩ বার এসছে। ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারকদের মতে ৪ জন নবী এখনো জীবিত আছেন যারা হলেন ইদ্রিস (আ), খিজির (আ), ইলিয়াস (আ) ও ঈসা (আ) । ইলিয়াস (আ) সিমেটিক জাতিকে হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর জাতি ইলিয়াস (আ)-এর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তাঁর সম্প্রদায়ের ওপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে, এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ইলিয়াস (আ)কে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে ফলে আল্লাহ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যান বলে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়।

১৮ হযরত আল ইয়াসা (আ)

আল ইয়াসা হলেন আল-ইসবাত ইবনে আদি ইবনে সাওতালম ইবনে আফ্রাছিম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম খলিল (আ) । বলা হয় আল ইয়াসা' (আ) ছিলেন ইলিয়াছ (আ) এর চাচাত ভাই (ইবনে কাসির)। তাঁর পিতার নাম ছিল সাফাত। কথিত আছে ইলিয়াছ (আ) যখন কাসিউন পাহাড়ে সংগোপনে অবস্থান করছিলেন, তখন আল ইয়াসা' (আ) তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। তাঁর জীবনের আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঃ আরীয়ার পানি ছিল ব্যবহারের অনুপযোগী। আল ইয়াসা' (আ) সেই পানিতে লবণ নিক্ষেপ করলে পানি নির্মল ও সুপেয় হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.org

১৯ হযরত দাউদ (আ)

দাউদ (আ) ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াকুব (আ) এর ১২ পুত্রের মধ্যে ইয়াহুদার বংশধর ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা ও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। যখন তিনি যাবুর কিতাব পাঠ করতেন তখন আকাবা উপসাগরের মাছ, আকাশের পাখি, বনের পশু স্থির হয়ে আল্লাহর কিতাব শুনতো। আকাবা উপ-সাগরের তীরে বসে তিনি প্রতি শনিবার যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। দাউদ (আ) ঐ এলাকার মানুষকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা শনিবারে বাঁধ দিয়ে মাছ আটকে রেখে অন্যদিন ধরতো। ফলে আল্লাহর গজবে তারা বানরে পরিণত হয়।

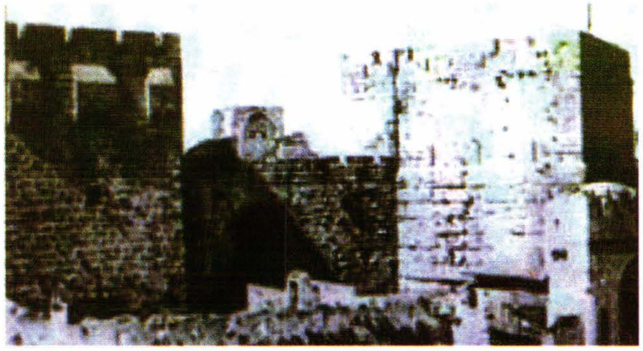

দাউদ (আ)-এর টাওয়ার

পবিত্র রমজান মাসের ১২ তারিখ তাঁর ওপর যাবুর কিতাব অবতীর্ণ হয়। তিনি পশু-পাখির ভাষা বুঝতেন। হযরত দাউদ-ই (আ) প্রথম যিনি একাধারে রাসূল এবং সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'হে দাউদ, ভূ-পৃষ্ঠে আমি তোমাকে আমার খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।' (সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ২৬) তিনি মূসা (আ)এর শরিয়ত পুনঃজীবিত করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে তিনি শরহম উবারফ নামে পরিচিত। তাঁর সময়ে Demography শাস্ত্রের আর্বিভাব ঘটে, তিনিই প্রথম পৃথিবীতে মানুষ গণনা বা আদমশুমারী শুরু করেন। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রীয় Treasury গঠন করেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির প্রচলন শুরু হয়। জেরুজালেমে একটি উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করেন যেখানে উঠলে মরু সাগর এবং জর্দান নদী দেখা যেত।

২০ হযরত সুলাইমান (আ)

সুলাইমান (আ) খ্রিষ্টপূর্ব ১০৩৫ অব্দে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দাউদ (আ)এর সুযোগ্য পুত্র। বায়তুল মাকদাস যা সুলাইমান (আ) পুনঃনির্মাণ করেন। বায়তুল মাকদাসের দৈর্ঘ্য ৬০ হাত এবং প্রস্থ ২০ হাত, উচ্চতা ৩০ হাত ছিল। সুলাইমানকে আল্লাহতায়ালা জীনকে বশীভূত করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আর বশীভূত করে দেয়া হয়েছে অবাধ্য জ্বীনকে, যে সর্বপ্রকার কর্ম সমাধানকারী, ইমারাত নির্মাণকারী এবং সমুদ্রে ডুবুরী রূপে।" (সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৩৭)

মাসজিদুল আকসার পুনঃ নির্মাণে ৩০,০০০ শ্রমিক সাত বছর যাবৎ পরিশ্রম করেন। তাঁর শাসনকালে খনি বিদ্যার সূচনা হয়।

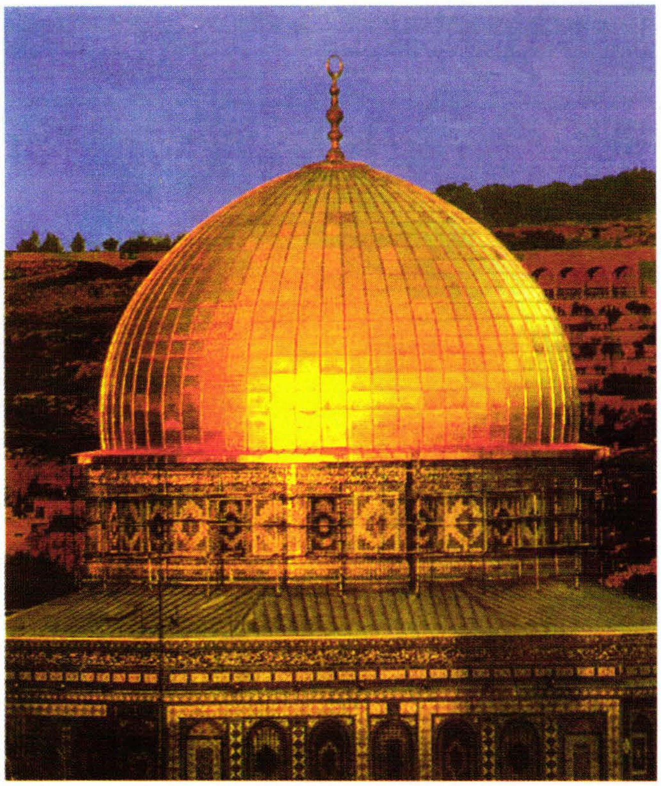

মসজিদুল আকসা

২১ হযরত ইউনুস (আ)

ইউনুস (আ) ইরাকের নিনেয়া শহরে যার বর্তমান নাম মসুল, বাগদাদ থেকে ৩৯৬ কিঃ মিঃ উত্তরে ফোরাত নদীর তীরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আসতাহ। তিনি ২৮ বছর বয়সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পান। নিনেয়াবাসী যখন ইউনুস (আ)-এর কথা অমান্য করে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল এবং পয়গাম্বরের কথায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তখন তিনি বদদোয়া করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিলেন।

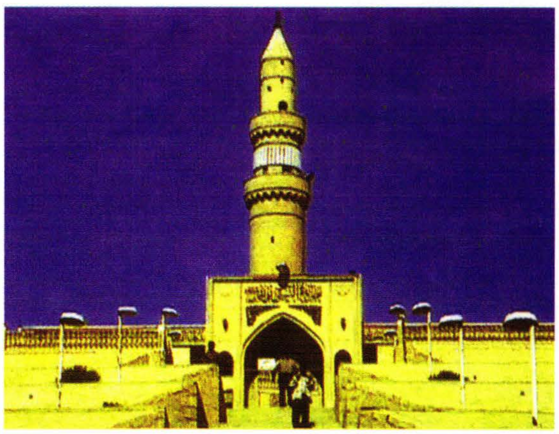

ইউনুস (আ)-এর মসজিদ

www.pathagar.org

যাবার কালে ফোরাত নদীর তীরে নৌকায় উঠার পর প্রচণ্ড ঝড় তুফান শুরু হলো। তখন যাত্রীরা লটারীর সাহায্যে ইউনুস (আ) নবীকে দায়ী করে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর হুকুমে নদীর মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে মাছের পেটে তিনি জীবিত আছেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে এস্তেগফার ও তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। আর আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। পরে মাছ তাঁকে মুখ দিয়ে উগরিয়ে নদীর তীরে ফেলে দিল। তিনি সেখানে একখানা কুঠুরি নির্মাণ করে কিছু দিন বসবাস করেন এবং আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় মসুলে ফিরে যান। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন পাকে বলেনঃ "আর ইউনুস অবশ্যই প্রেরিত পুরুষদের অন্যতম।"- সুরা আস সাফফাত : ১৩৯

২২ হযরত যাকারিয়া (আ)

যাকারিয়া (আ) প্রায় ২১০০ বছর পূর্বে ফিলিস্তিনে বনি ইসরাঈল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) এর বংশধর ছিলেন, তার স্ত্রী ইশা বা আল ইয়শ হারুন (আ) এর বংশীয় ছিলেন। ইয়াহইয়া (আ) এর পিতা এবং নবী ঈসা (আ) এর খালু যাকারিয়া রায়তুল মাকদাসের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং নবী ঈসা (আ) এর মাতা মারইয়ামের লালন পালন করতেন। যাকারিয়া (আ) সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন– "আরো দান করেছি যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (সূরা আনয়াম, আয়াত : ৮৫) ইয়াহুদীদের আক্রমণের মুখে তিনি একটি বৃক্ষের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু তার জামার একটি অংশ বাইরে থাকায় আল্লাহর দ্বীনের শত্রুরা গাছটি করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করলে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন।

২৩ হযরত ইয়াহইয়া (আ)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, "হে যাকারিয়া আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করছি এক পুত্রের, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। পূর্বে আর কারো জন্য এ নাম নির্ধারিত করিনি।" (সুরা মরিয়াম, আয়াত : ৭) যাকারিয়া (আ)-এর দোয়ার বরকতে বন্ধ্যা মাতার গর্ভে খ্রিষ্টপূর্ব ১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াহইয়াহ (আ)। তিনি ঈসা (আ)-এর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময় নির্জনে খোদার প্রেমে কান্নাকাটি করে কাটাতেন। তিনি ইয়ারদান নদীর তীরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ইয়াহইয়া (আ) মানুষকে ৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন- ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, ২. সালাত আদায় করা, ৩. রোজা পালন করা, ৪. অধিক পরিমাণ আল্লাহর যিকির করা, ৫. দান সাদকা করা।

২৪ হযরত ঈসা (আ)

বায়তুল লাহম, যেখানে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা আরবি শব্দ। হিব্রু ভাষা Joshuna এর অর্থ হলো ত্রাণকর্তা। গ্রীক ভাষায় বলা হয় Christ। মাসীহ তাঁর উপাধি। এর অর্থ স্পর্শ করা। কারণ ঈসা (আ) রুগ্‌ণ রোগীকে স্পর্শ করা মাত্রই সুস্থ হয়ে যেত। ঈসা (আ) মারাইয়ামের গর্ভে আল্লাহর কুদরতে পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা (আ)এর ৫টি মুজেজা ছিল ঃ

১। তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন।
২। মাটির তৈরি পাখিকে ফুঁ দিলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ে যেত।
৩। অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ফুঁ দিলে আল্লাহর কুদরতে ভাল হয়ে যেত।
৪। মানুষ তাদের ঘরে যে খাদ্য খেতো তা বলে দিতে পারতেন।
৫। ঈসা (আ)এর সঙ্গীদের অনুরোধে আল্লাহর কুদরতে আকাশ থেকে খাদ্য ভরা পাত্র নাজিল হত।

তিনি ৩০ বছর বয়সে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁর ওপর ইনজিল কিতাব নাজিল হয়। বনি ইসরাঈলগণ তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁকে ঊর্ধ্ব জগতে নিয়ে যান।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)

মানবতার বন্ধু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আরবের মক্কা নগরীতে মাতা আমিনার কোলে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। ৫ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ-মা হালিমার কাছে থাকেন। অতঃপর পিতৃব্য আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। মক্কায় শান্তির জন্য ১৭ বছর বয়সে হিলফুল ফুযুল নামক শান্তি সংঘ গঠন করেন। অতঃপর ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন।

কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে প্রথম পর্বে ১৬ জন মুসলমান আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন এবং দ্বিতীয় দফায় আরো হিজরত করেন ৮৩ জন মুসলমান। এ সময় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা কুরাইশ নেতা উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমবারের মত মুসলমানেরা কাবা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করেন। ৪৭ বছর বয়সে শিয়াবে আবুতালিবের অবরোধ জীবন শুরু হয় এবং ৪৯ বছর বয়সে সমাপ্তি ঘটে। তিনি নবুওয়াতের ১০ম বর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন। তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং নির্মম নির্যাতন করে। ৫১ বছর বয়সে নবুওয়াতের ১২ বর্ষে আকাবা নামক স্থানে ১২ জন মদীনাবাসী বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ৫২ বছর বয়সে আয়েশা (রা) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

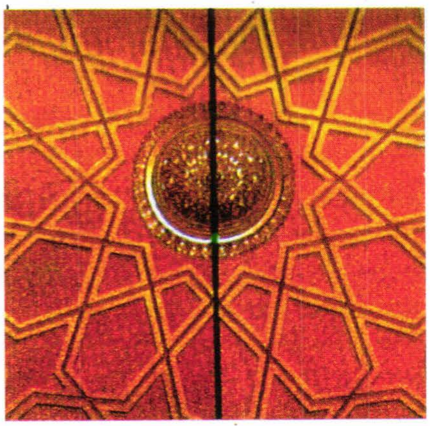

মসজিদে নববীর ভেতরের কারুকাজ

www.pathagar.org

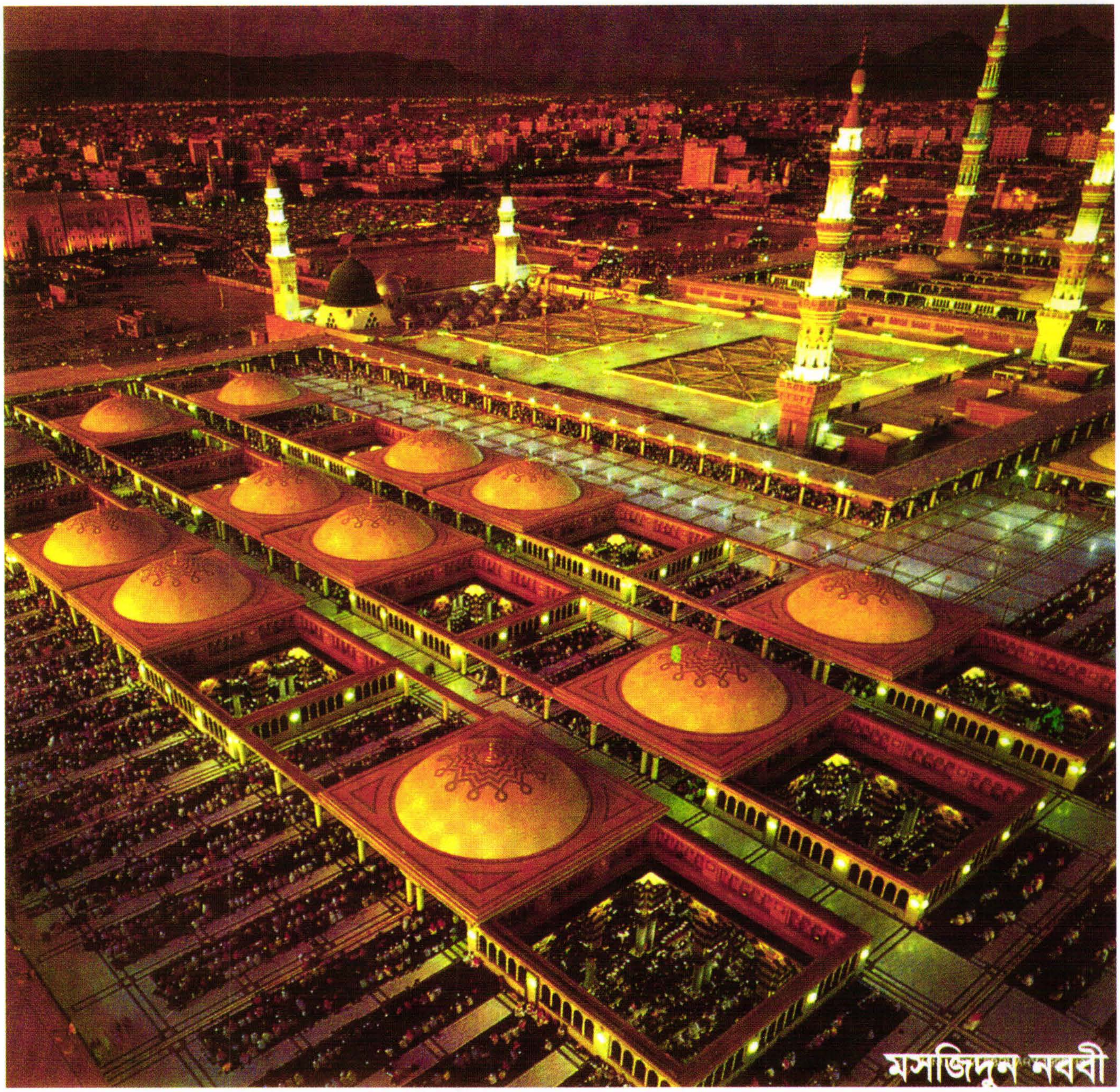

অতঃপর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা) মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে আল্লাহর হুকুমে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আবুবকর (রা)কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে ওঠেন। বানুনা উপত্যকায় বনী সালেম পল্লীতে ১০০ জন সাহাবী নিয়ে সর্বপ্রথম জুমার নামাজ আদায় করেন।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে কাফিরদের সাথে ১৭ রমজান বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে রাসূল (সা) কাফিরদরে মুকাবেলায় বিজয় লাভ করেন। ৩য় হিজরি ১১ শাওয়াল বিখ্যাত ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং রাসূল (সা)এর চাচা হামযা (রা) সহ ১৭ জন মুসলিম সৈনিক শাহাদত বরণ করেন। ৪ হিজরিতে সফর মাসে 'বীর মাউনা' নামক স্থানে ৬৮ জন ইসলাম প্রচারক সাহাবীকে কাফিররা নির্মমভাবে হত্যা করে।

মহানবী (সা)কে হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে রবিউল আউয়াল মাসে বনু নাযিল গোত্রকে মদীনা প্রজাতন্ত্র থেকে বহিষ্কার করা হয়। ষষ্ঠ হিজরিতে তিনি হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ১৫ শত সাহাবী নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করেন। এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফিররা বাধা প্রদান করে। সেখানে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ৮ম হিজরিতে যায়িদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে সিরিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। জামাদিউল আউয়াল মাসে সিরিয়ার খ্রিষ্টান নেতা শোরাহবীলের বাহিনীর সাথে 'মুতা' নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শাহাদাত বরণ করেন।

www.pathagar.org

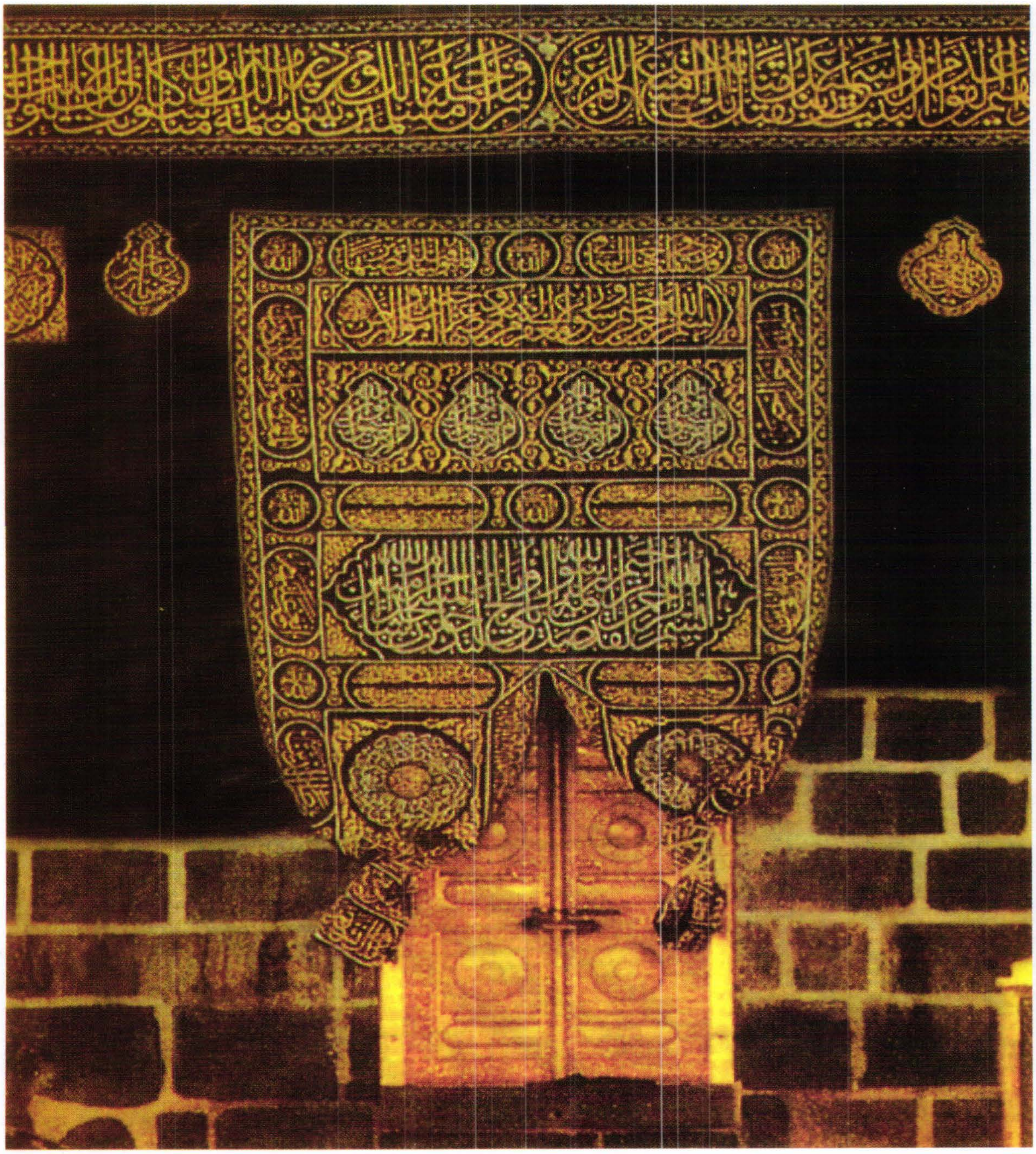

কাবার ভেতরের কারুকাজ

৮ম হিজরি (২০ রমজান) ৬২ বছর বয়সে ১০ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে মহানবী (সা) বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে মহানবী (সা) ইন্তেকাল করেন। ১৪ রবিউল আউয়াল রাসূল (সা)এর দাফন সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.org

ইসলামের

বিকাশ, প্রচার, প্রসার

ইসলাম

'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আরবি ধাতু 'সিলমুন' থেকে ('সিলমুন' অর্থ- আপস, সন্ধি, মাথানত করা, সমর্পণ করা, আনুগত্য); যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা। এটা মূল ইহুদি এবং মূল খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মৌলিক বিশ্বাস 'একত্ববাদ এবং 'অহি' (ঐশীবাণী) প্রবর্তন বিশ্বাসের ধারাবাহিকতার পূর্ণাঙ্গ ক্রমধারা মাত্র। ইব্রাহিম (আ)-কে কুরআন শরীফে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে আখ্যা দেয়ায় 'তৌরাত' (Old Testament) এবং 'ইঞ্জিল' (New Testament) এর মূল সুরের একটি অনুরণন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং এটা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মানবহিতৈষী সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা।

সুলাইমানী মসজিদ (১৫৫০-৫৭ খ্রিঃ), ইস্তাম্বুল তুরস্ক। মসজিদের প্রাঙ্গণটি ধারণ করে আছে ৪টি মাদ্রাসা, ১টি চিকিৎসা শিক্ষায়তন, হাসপাতাল এবং প্রথম সুলাইমান ও তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিস্তম্ভ।

জিন্নাহ মসজিদ, ত্রিনিদাদ, ক্যারিবীয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা

মহানবী ও শেষনবী

মহানবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) (৫৭০-৬৩২ খ্রিঃ) ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মানবীয় গুণে গুণান্বিত। অহি নাজিলের ক্রমধারায় তাঁর উপর সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন' এর প্রথম অহি নাজিল হয় ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। অক্ষর জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বশক্তিমান কর্তৃক প্রেরিত ওহী মস্তিষ্কে ধারণ করে, পরে তা তাঁর অনুসারীদের (সাহাবী) নিকট প্রচার করতে থাকেন। জীবদ্দশায় তিনি প্রথম মদীনা এবং পরে মক্কা ও তার আশেপাশে কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করেন বিখ্যাত আরব ইতিহাস বিশারদ Prof. Philip K. Hilti তার History of the Arabs গ্রন্থে প্রায় ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন মহানবীর আগমন-পূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর– যাকে আইয়্যামে জাহেলীয়র বা অন্ধকারের যুগ বলা হয়। তাঁর উপসংহারের শেষ তিনটি পঙক্তি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিধায় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়– 'দক্ষিণ আরবের দীর্ঘদিনের সুসংগঠিত জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের ক্রমধারা ভঙ্গুর কিংবা বিনাশের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বল্গাহীনতার জন্য প্রচণ্ড নৈরাজ্য ও অরাজকতা বিরাজ করতে থাকে'। তাঁর সর্বশেষ পঙক্তিটি হচ্ছে– "The stage was set, The moment was phychological, for the rise of a great religious and national leader." মোদ্দাকথা মুহাম্মদ (সা)এর উত্থান শুধু ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্যই নয় বরং একটি জাতীয় প্রয়োজনের জন্যও আবশ্যকীয় ছিল। তাঁর ইন্তেকাল (৬৩২ খ্রিঃ) এর অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম পূর্বদিকে সুদূর মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিমে এশিয়া, আফ্রিকা হয়ে উত্তরে ইউরোপের স্পেন এবং উত্তর-পূর্বে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

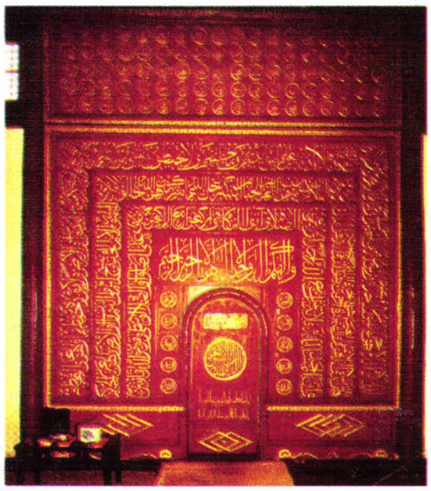

অপরূপ ক্যালিগ্রাফিমণ্ডিত মসজিদের মেহরাবটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়

www.pathagar.org

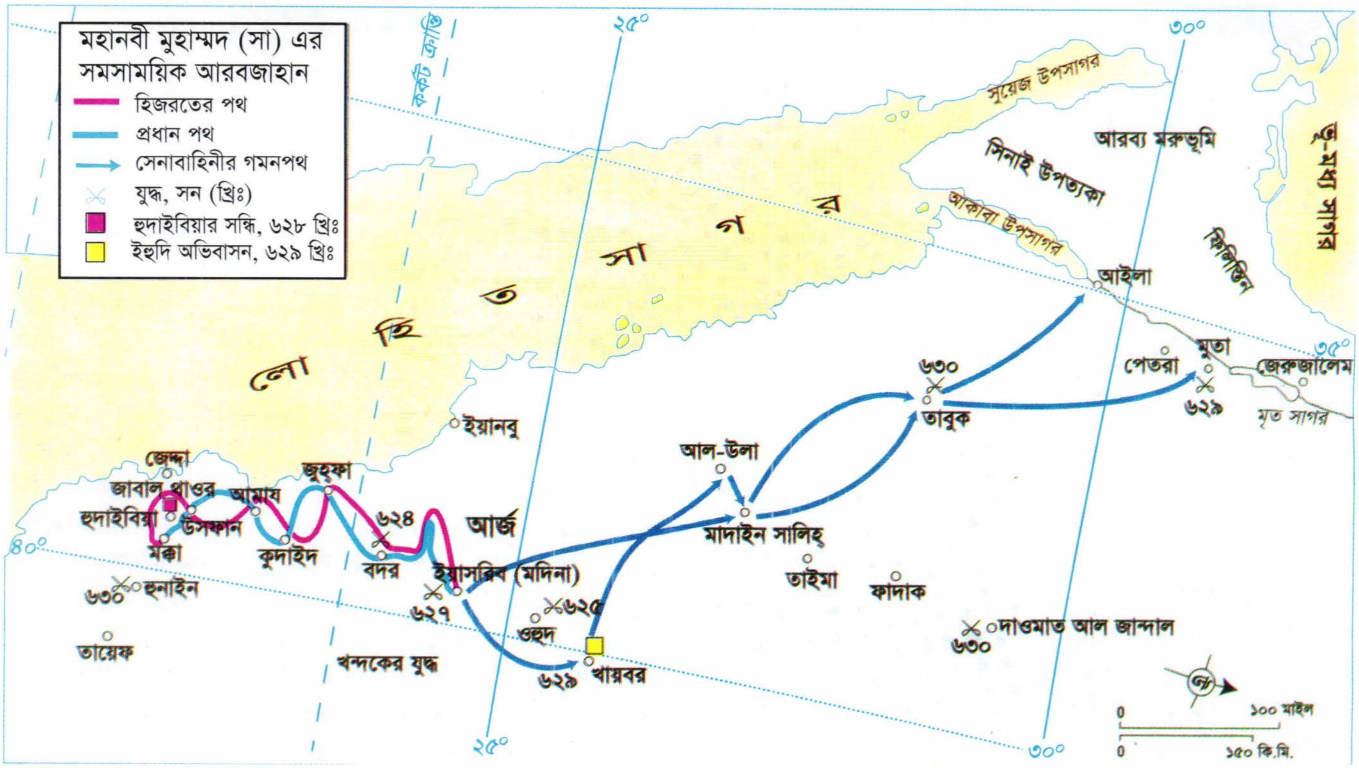

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম

বর্তমান বিশ্বের মানচিত্রে মুসলমান ও ইসলামী সংস্কৃতির পদচিহ্নের বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচীন আফ্রো-ইউরেশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চল থেকে শুরু করে বর্তমানে ইসলামের বিস্তৃতি আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করছে। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মানুষ এই ধর্মের অনুসারী যা সমগ্র বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর এক পঞ্চমাংশের বেশি (২৩.৫%)। বর্তমান বিশ্ব মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা OIC ভুক্ত দেশের সংখ্যা মোট ৫৭টি, পর্যবেক্ষক আছে ৩টি রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘসহ ৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। পরিসংখ্যান মতে (২০০১) সেখানে বসবাসকারী মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০০ মিলিয়ন। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১২৭ মিলিয়ন। ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১২১ মিলিয়ন। চীনে প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মুসলিম বসবাস করে যদিও কাগজে-কলমে এই সংখ্যা প্রায় ১৭ মিলিয়নের কাছাকাছি।

মহাদেশ	২০০৩ সালের জনসংখ্যা	২০০৩ সালের মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার
আফ্রিকা	৮৬১.২	৪১৪.২৬	৪৮.১
এশিয়া	৩৮৩০.১	১০১০.৬৫	২৬.৩৯
ইউরোপ	৭২৭.৪	৫১.১৯	৭.০৪
উত্তর আমেরিকা	৩২৩.১	৬.৬২	২.০৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৫৩৯.৭৫	১.৬৪	০.৩
অস্ট্রেলীয় এলাকা	৩২.২৩	০.৩৫	১.০৯
বিশ্ব জনসংখ্যা	৬৩১৩.৭৮	১৪৮৪.৭১	২৩.৫২

'অমর সারস' মসজিদ (১২৭৫ খ্রিঃ), ইয়াংজু, চীন

হুয়াই শেং শি মসজিদ (১০-১১ শতাব্দী), কেন্টন (জুয়ানজু), চীন। মহানবী (সা)এর মামা এবং বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবী ওয়াক্কাস (রা) প্রথমে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এটি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.org

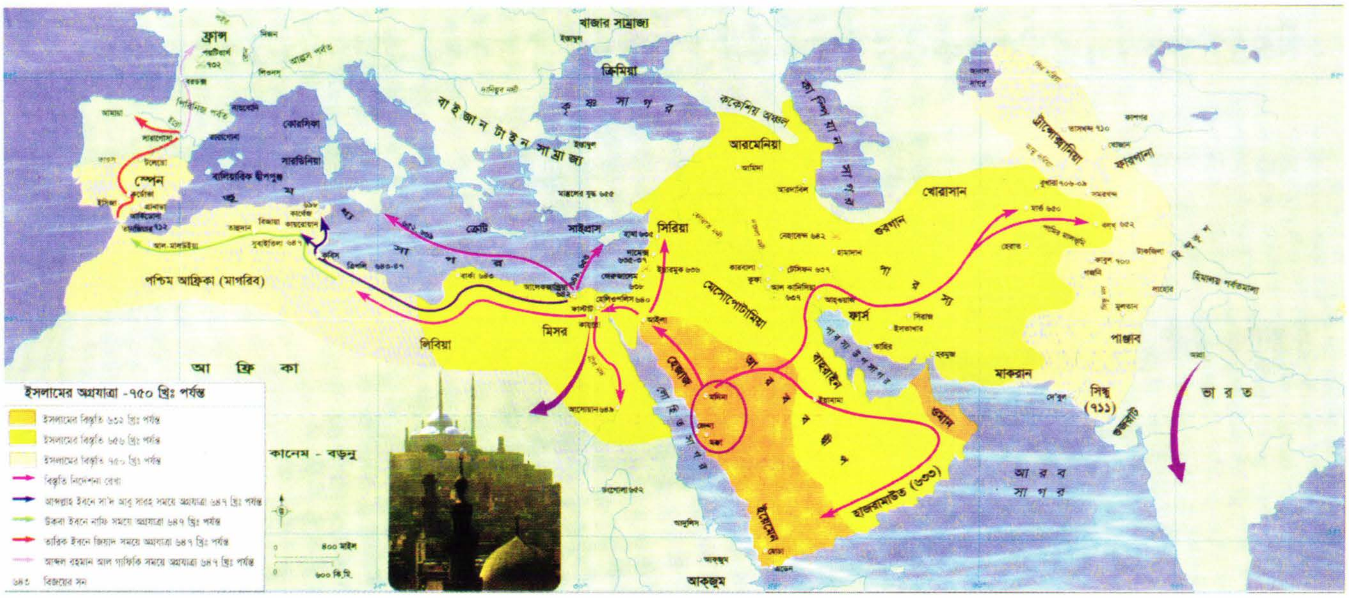

ইসলামের বিকাশ, প্রসার ও বিজয়ের একটি সারসংক্ষেপ

গতানুগতিক সার্বজনীন ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনগ্রাহ্য একটি গতিশীল, বহুমুখী ও বহুমাত্রিক জীবনাচার হিসেবে বিশ্বজনীনতার গৌরবে ভাস্বর হয়ে আছে। তাই আজও এই ধর্মের জয়যাত্রা দেদীপ্যমান আলোক শিখার মতো প্রোউজ্জ্বল হয়ে আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূলতঃ ধর্মীয় প্রচারাভিযাত্রী এবং বণিক সম্প্রদায়ের চারিত্রিক মাধূর্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সহমর্মিতামূলক আচরণে আকৃষ্ট হয়ে অনারব বিশ্বে ইসলাম ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। পরবর্তীতে মুসলিম বিজয়ী বীরেরা একের পর এক রাজ্য জয় করে ইসলামকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোভুক্ত করেন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

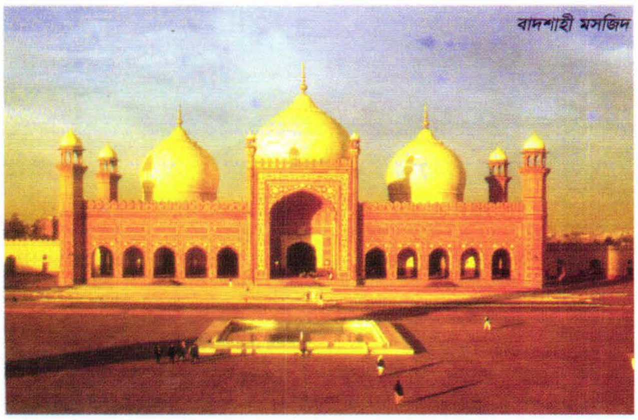

বাদশাহী মসজিদ, ১৬৭৩ খ্রিঃ, লাহোর দুর্গের পাশে, পাকিস্তান। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত। মসজিদের গম্বুজগুলি ও জলাধারের বেষ্টনী মার্বেল পাথরে নির্মিত।

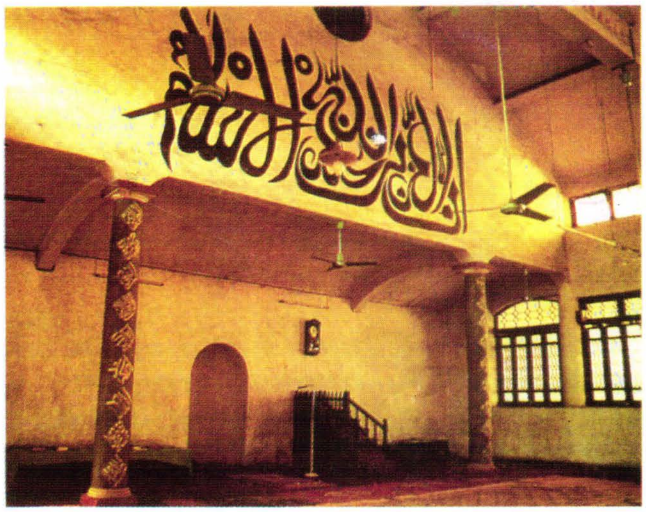

হুয়াই শেং শি মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশের একটি আকর্ষণীয় ক্যালিগ্রাফি

www.pathagar.org

বিশ্বে মহাদেশভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

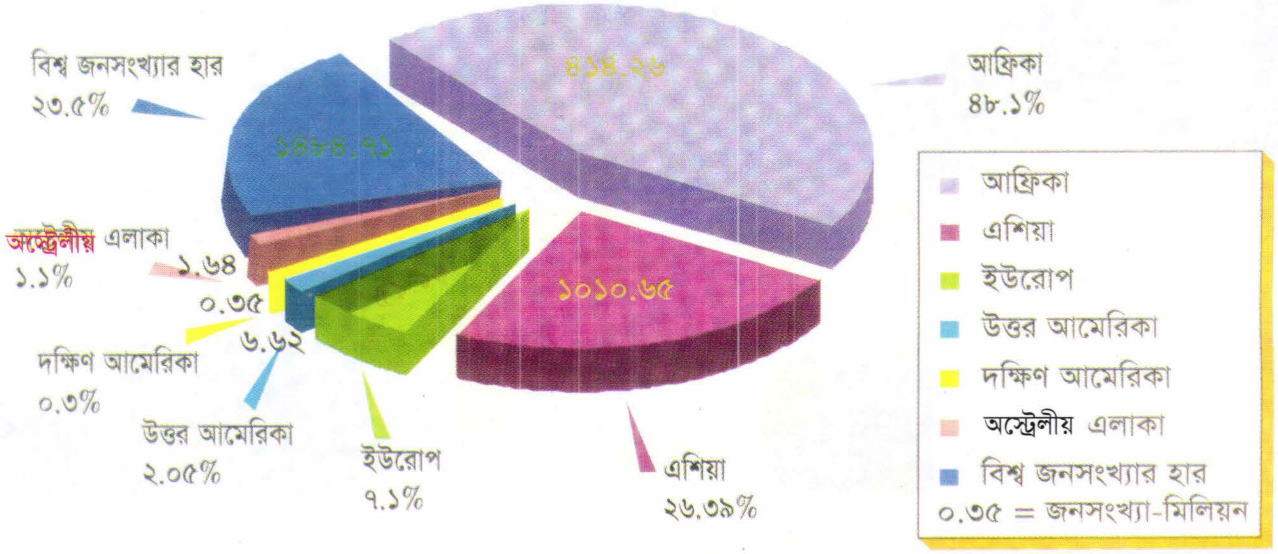

তথ্য উৎস : Islamic Population web

বড় মসজিদ, করডোভা, স্পেন; এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রহমানের সময়কালে। নবম ও দশম শতাব্দীতে এর সংস্কারণ কার্য সাধনের সময় কিছু নতুন স্তম্ভের সংযোজন করা হয়।

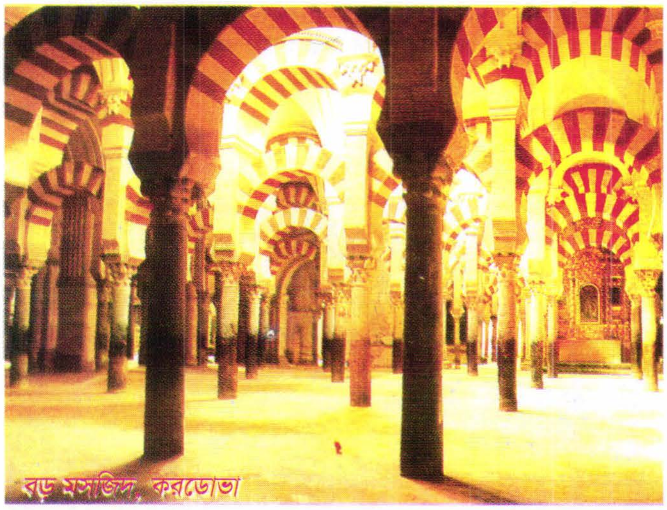
বড় মসজিদ, করডোভা

মুসলিম সেনাপ্রধান এবং বিজয়ীরা বিজিত এলাকার সামাজিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে অক্ষত রেখেই স্থানীয় মুসলিম গভর্নর নিয়োগ করে, তাঁদের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। যদিও ক্রমেই স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, স্থানীয় জনগণকে কখনো বাধ্য করে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়নি। বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে ইসলামকে সাদরে বরণ করার কারণসমূহের অন্যতম ছিল প্রশাসকদের বাৎসল্য, গণমুখীতা, মুক্তমন, মানবিকতা, সহমর্মিতামূলক আনুকূল্য, নাগরিক সুবিধা প্রদান, অন্য

মতি মসজিদ (১৬৪৬-৫৩ খ্রিঃ), আগ্রার লালকেল্লা, ভারত। মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের সম্মানে এ মসজিদ নির্মিত হয়।

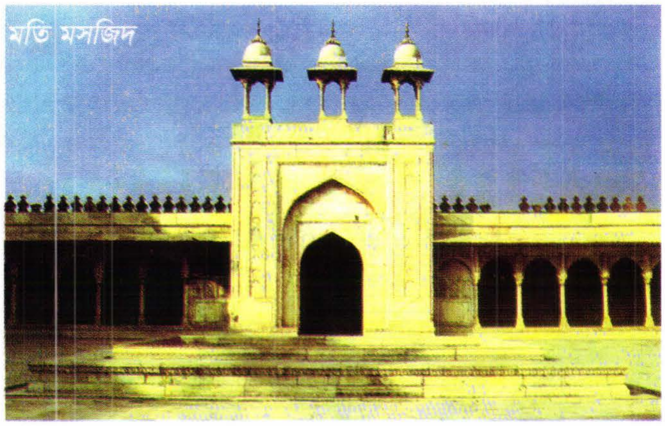
মতি মসজিদ

কৃষ্টি-সভ্যতা ও ধর্ম পালনকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিজিত এলাকায় প্রশাসক, সুফী ও ধর্মীয় ইমামগণ সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার হস্ত প্রসারিত রেখেছিলেন এবং যারাই 'জিজিয়া' প্রদান করতো তাদেরকে পূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হতো। ফলে দেখা যায়, ইসলামের বিজিত কোন এলাকাতে কখনো গণ-বিক্ষোভ, গণ-অসন্তোষ কিংবা গণ-বিদ্রোহ কোনটাই হয়নি।

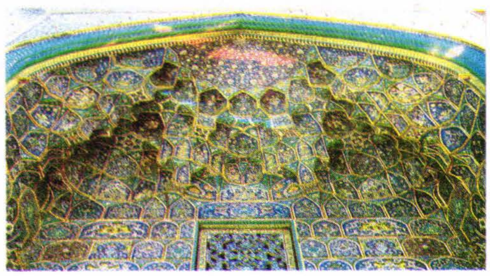

www.pathagar.org

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী যার সংখ্যা প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন। এ অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দুটি প্রধান বিষয় ছিল- ব্যবসায়ীদের ভূমিকা এবং ধর্ম প্রচারক সুফী সম্প্রদায়ের মানবীয় কার্যকলাপ। যদিও আরবের উষর মরুভূমিতে ৭ম শতাব্দীতে ইসলাম উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তা আবির্ভূত হয়েছিল ইরান, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়া থেকে বিস্তৃতির মাধ্যমে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড আরবীয়দের দ্বারা (৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দী) পর্যন্ত শুধু নিয়ন্ত্রিতই ছিল না বরং এক্ষেত্রে তাঁরা একচ্ছত্র আধিপত্য করে চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে স্থানীয় শাসকবৃন্দ এবং সম্ভ্রান্ত জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেন এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র অঞ্চল ইসলাম প্রধান হয়ে উঠে। তথ্য-প্রমাণাদিতে দেখা যায়, উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় প্রধানত দুটি মূল ধারায় অর্জিত হয়। প্রথমতঃ মুসলিম সামরিক শক্তি এই উপমহাদেশে আগমনের পূর্বে ধর্মপ্রচারক ও আরবীয় বণিকগণের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম পথে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উত্তর দিক থেকে ইসলামের ব্যাপক প্রসার বিকাশ ঘটে সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে।

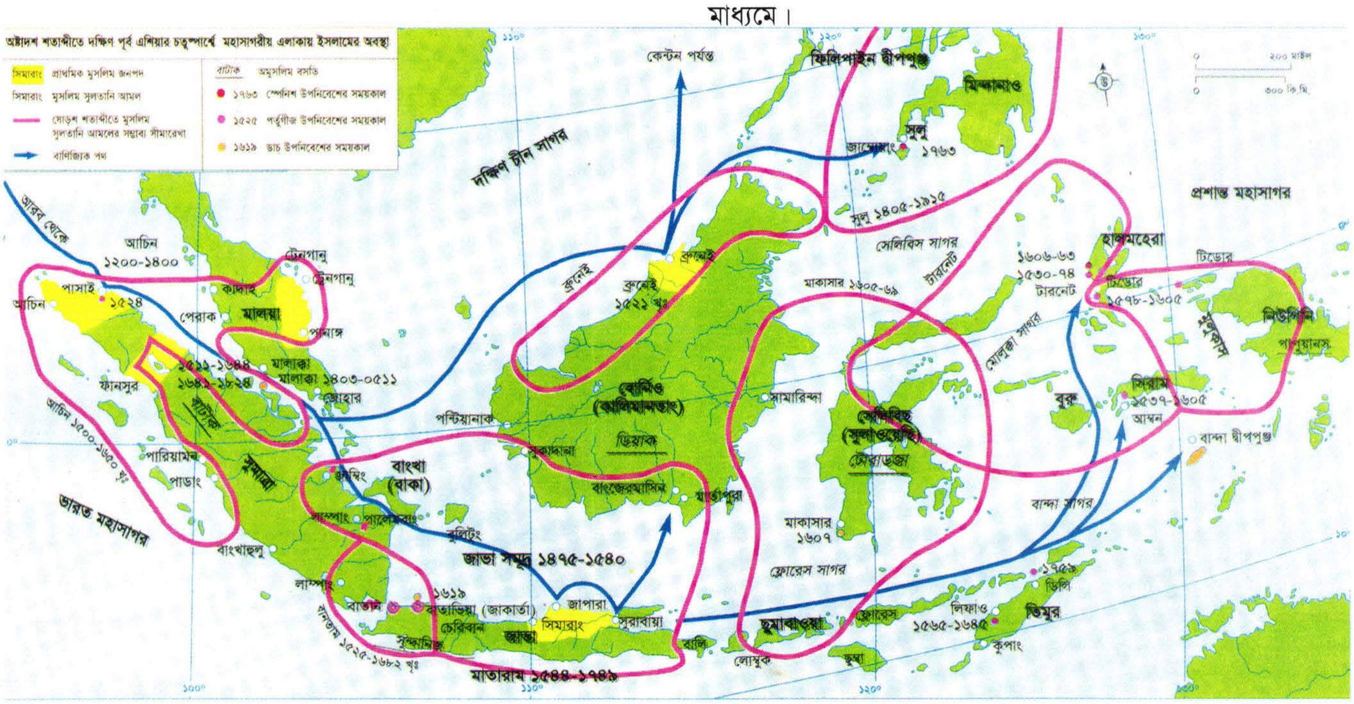

জামে মসজিদ (১৮৯৭ খ্রিঃ), কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া। লাল ইট ও সাদা মার্বেলের কারুকাজ মসজিদটিকে সুশোভিত করেছে

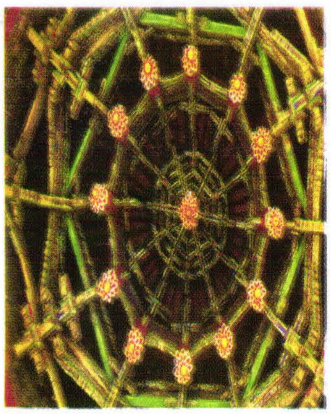

চীনের হুই মিনার মসজিদের গম্বুজের কাঠের খিলানের দৃষ্টিনন্দন কারুকাজ খোদাইকর্ম এবং বর্ণিল রং-এর ব্যবহার চিত্তাকর্ষক চৈনিক শিল্পকে প্রতিবিম্বিত করেছে

www.pathagar.org

ভারতবর্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত মুসলমান হওয়া প্রথম রাজা হচ্ছেন চেরর রাজ্য (মালাবারা/কেরালা) এর রাজা 'চেরুমান পেরুমাল'। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বর্ণনা থেকে জানা যায়, ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে মিনায় অবস্থানরত যে সন্ধ্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা) অবিশ্বাসীদের ব্যাপক দাবির চাপে চাঁদকে অঙ্গুলী নির্দেশে দ্বিখণ্ডিত করে পুনরায় একত্রিত করেন রাজা চেরুমান ঐ সময় কয়েকজন সহচরসহ আশ্চর্যান্বিত হয়ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর তিনি রাজ জ্যোতিষীকে এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করার নির্দেশ দেন।

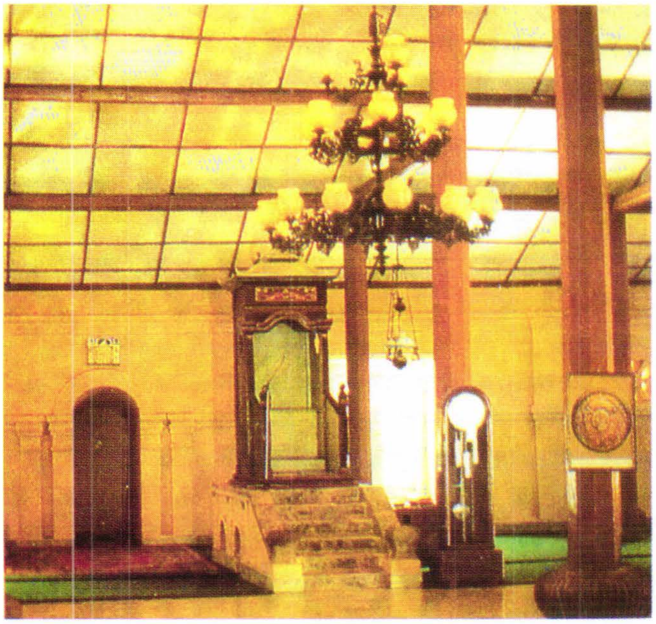

রাজকীয় (Royal) মসজিদ আগুং-এর অভ্যন্তরীণ অংশ বিশেষ

জ্যোতিষী গণনান্তে রাজাকে জানালেন যে, আরবে একজন মহামানব ঐশী বাণী নিয়ে এসেছেন- তিনিই এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। বিস্মিত রাজা চেরুমান নৌ- পথে গিয়ে আরবের অনুচরসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত পেরুমাল নামেরই আরবীকরণ হচ্ছে ইতিহাস উদ্ধৃত রাজা 'চেরামল মালিক', রাসূল (সা)এর মক্কী জীবনে যার ইসলাম গ্রহণ আরবে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

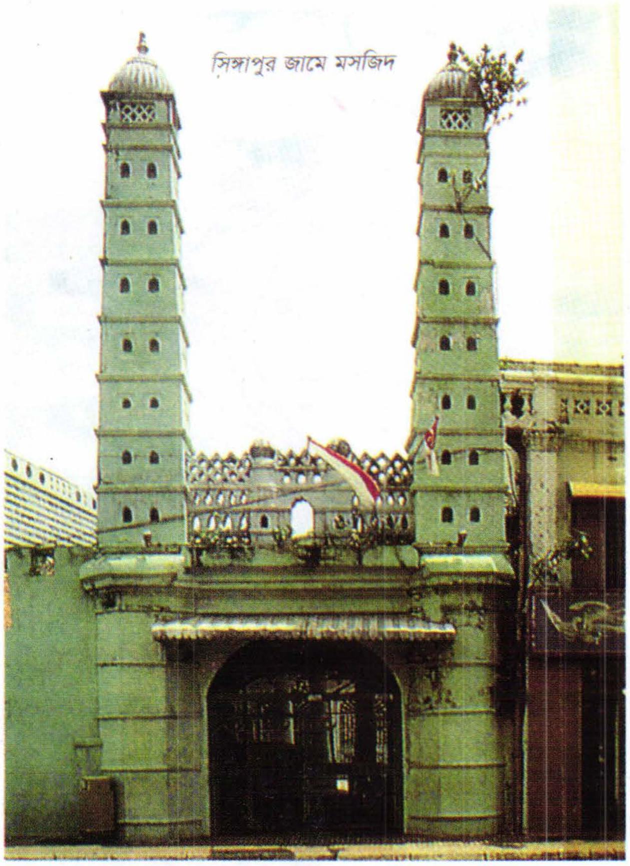

জামে মসজিদ (১৮৩০-৫৫ খ্রিঃ), সিঙ্গাপুর; মসজিদটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জোড়া মিনারের স্থানীয় ও ভারতীয় স্থাপত্যকর্মের অপরূপ মিশ্রণ

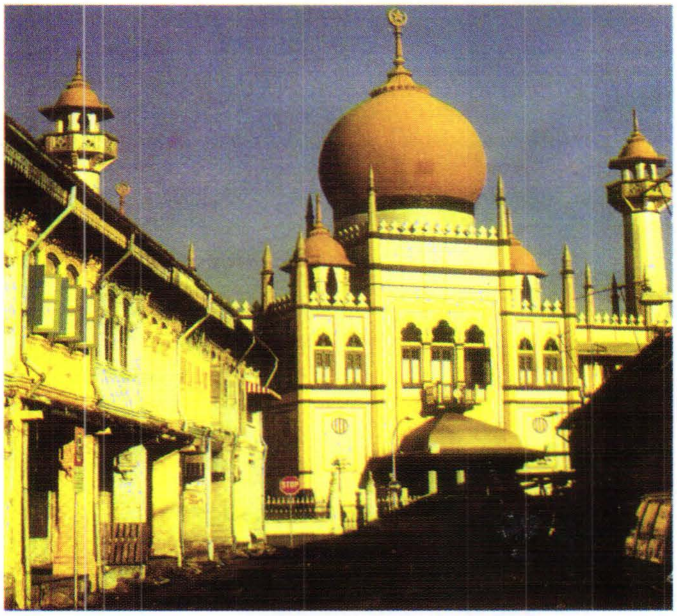

সিঙ্গাপুরের সুলতান মসজিদ। মসজিদটি প্রথমে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এবং পরবর্তীতে ১৯২৪-২৮ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত হয় মোঘল স্থাপত্য কলায়

www.pathagar.org

রাজকীয় (Royal) মসজিদ আগুং (১৫৬৫ খ্রিঃ), বানাতেং পশ্চিম জাভা, ইন্দোনেশিয়া। বাতিঘর সদৃশ্য মিনারের জন্য মসজিদটি বিখ্যাত। এর স্থাপত্য কলায় ডাচ প্রভাব স্পষ্ট।

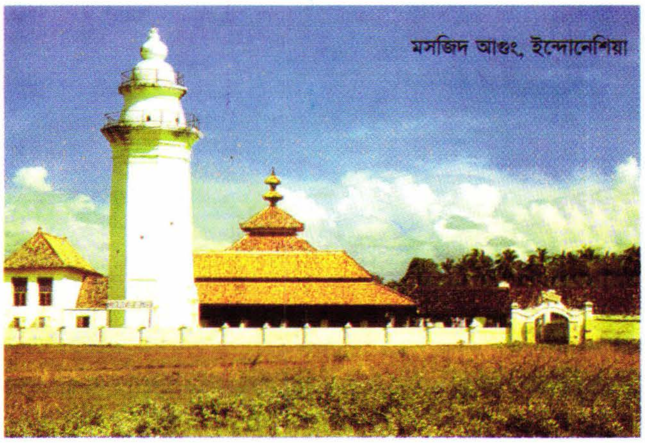

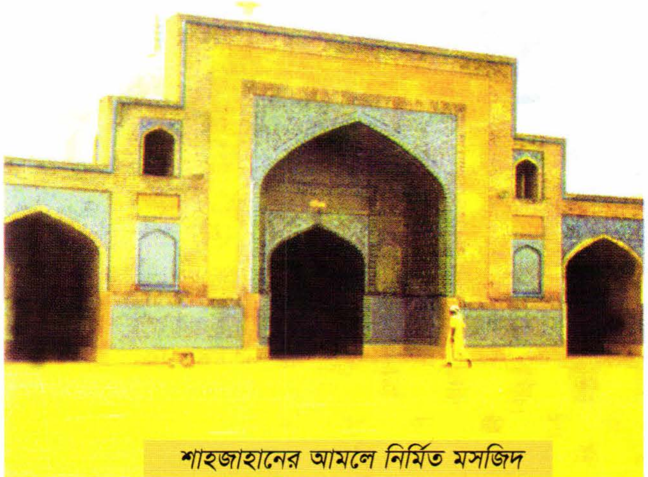

শাহজাহানের আমলে নির্মিত মসজিদ

সিন্ধু ও পারস্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের প্রতিফলনে ইট ও টাইলসের ব্যবহারে নির্মাণশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় সম্রাট শাহজাহানের আমলে (১৬৪৪-৪৭) নির্মিত মসজিদ।

রাজার মৃত্যু সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়- (১) রাজা মক্কা থেকে ফেরার পথে 'সফর' কিংবা 'শহর' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন- কিন্তু এর পরপরই চেররাজ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং ঐ রাজ্যের রাজধানী 'কর্ণক্লোর' বা ক্রাঙ্গানূর'-এ প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। (২) রাজা নিজে ফিরে এসে প্রথম মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং তাঁর ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তবে সমসাময়িককালে ঐ রাজ্যে পর পর ১০টি মসজিদ নির্মিত হয়- এ বিষয়ে উভয়ই একমত।

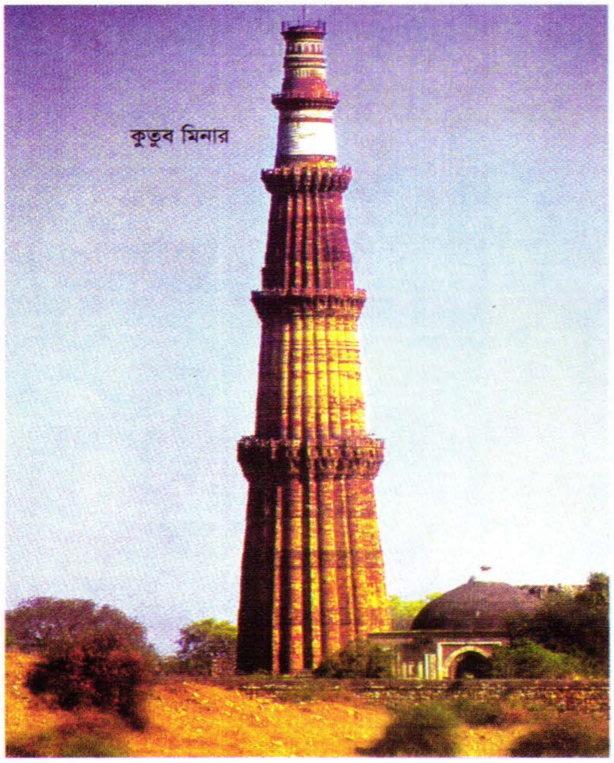

কুতুব মিনার (১১৯৯ খ্রিঃ), দিল্লি, ভারত। ইসলামের বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ কুতুবউদ্দিন আইবেক এই মিনারটি স্থাপন করেন। মিনারটির উচ্চতা ছিল ৭২.৫ মি.।

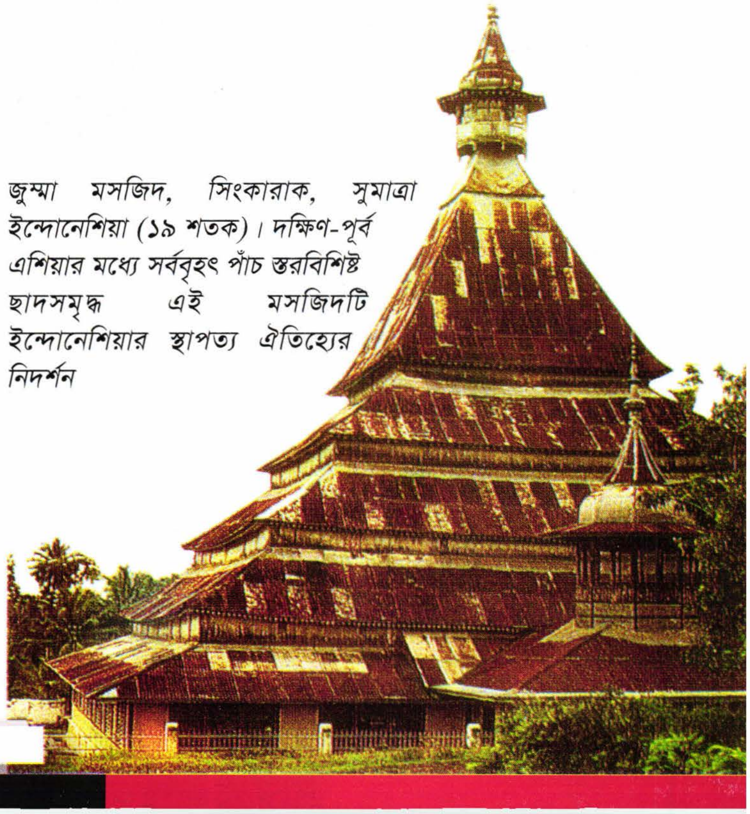

জুম্মা মসজিদ, সিংকারাক, সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়া (১৯ শতক)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ছাদসমৃদ্ধ এই মসজিদটি ইন্দোনেশিয়ার স্থাপত্য ঐতিহ্যের নিদর্শন

www.pathagar.org

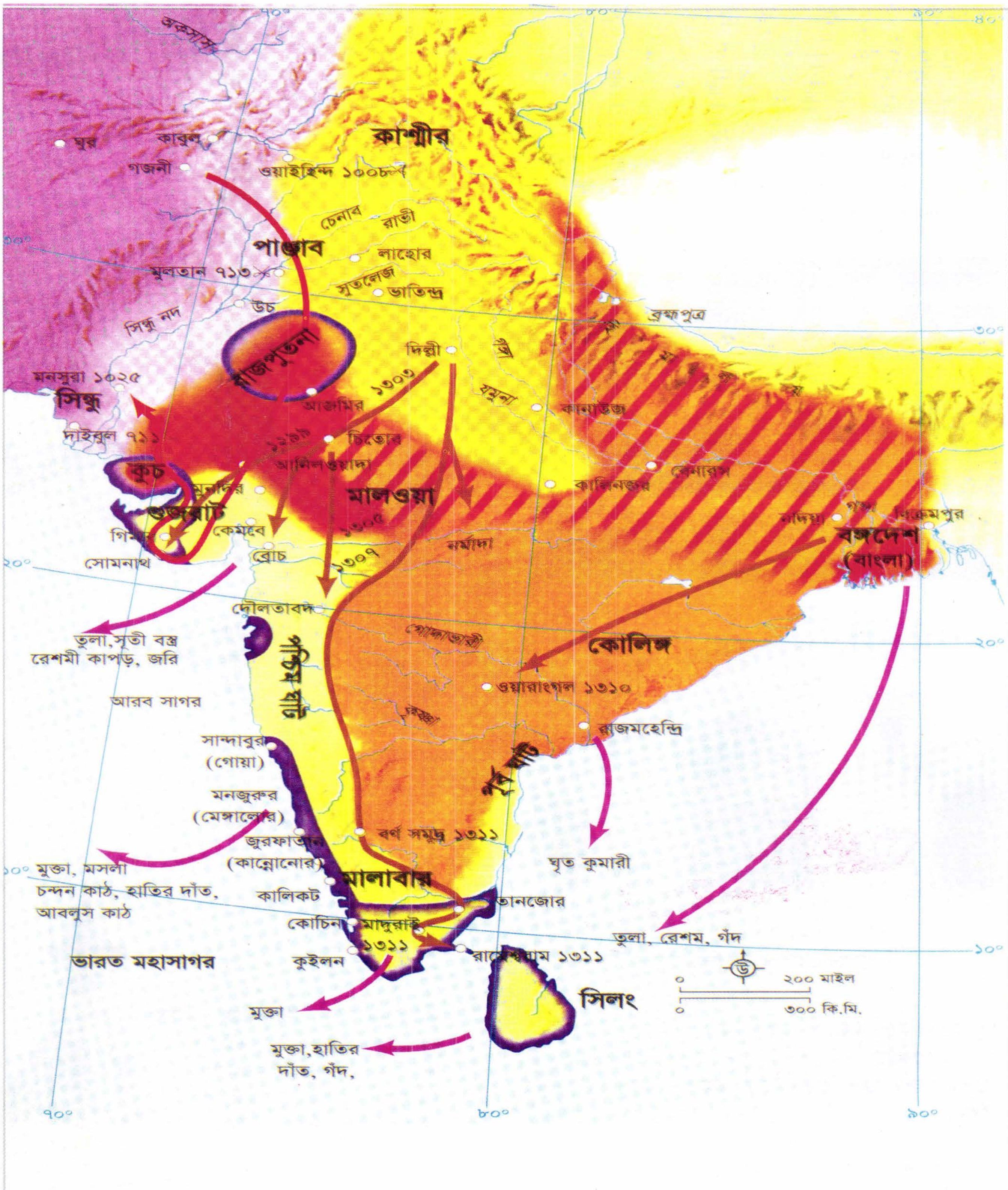

দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম শাসন

- উমাইয়্যা খিলাফতের পূর্ব সীমানা (৭১৩-৭৫০ খ্রিঃ)
- আব্বাসিয়া খিলাফতের পূর্ব সীমানা (১০০০-১০২৭ খ্রিঃ)
- সুলতান মাহমুদের বিজয় অভিযান (১০০৪-২২ খ্রিঃ)
- মামলুক বংশ (১১৫০-১২১৫ খ্রিঃ)
- খলজী বংশের সাম্রাজ্য (১২৯০-১৩২০ খ্রিঃ) এবং তুঘলক বংশের রাজ্য সীমানা
- খলজী বংশ (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ)
- তুঘলক বংশ (১৩২০ খ্রিঃ)
- আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক আক্রমণের পথ এবং অধিকৃত অঞ্চল (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ)
- বাণিজ্য পথ

www.pathagar.org

লালবাগ কেল্লার মসজিদ, ঢাকা। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে নবাব শায়েস্তা খান মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে রাজা দাহিরের রাজত্বকালে (৭১২ খ্রিঃ) মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের তদানীন্তন শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণ ও জয় করেন। এসময়ে মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন উমাইয়া বংশের আল ওয়ালিদ। পরবর্তীতে প্রায় তিন শতাব্দী পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের অন্তর্কলহ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে (১০০০-১০২৭ খ্রিঃ পর্যন্ত) মোট সতের বার ভারতবর্ষে আক্রমণ চালান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবকে গজনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে (১১৯২ খ্রিঃ) মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লি ও আজমীর দখল করেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেককে দিল্লির শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। ১৩শ শতাব্দীতে কুতুব উদ্দিন আইবেকের দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পরেই ইসলামের অবস্থান ভারতে দৃঢ় হয়। তার সময়কালেই সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বিহার ও বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন (১২০৪-০৫ খ্রিঃ)। সপ্তদেশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের প্রচার অবারিত ধারায় প্রসারিত হতে থাকে।

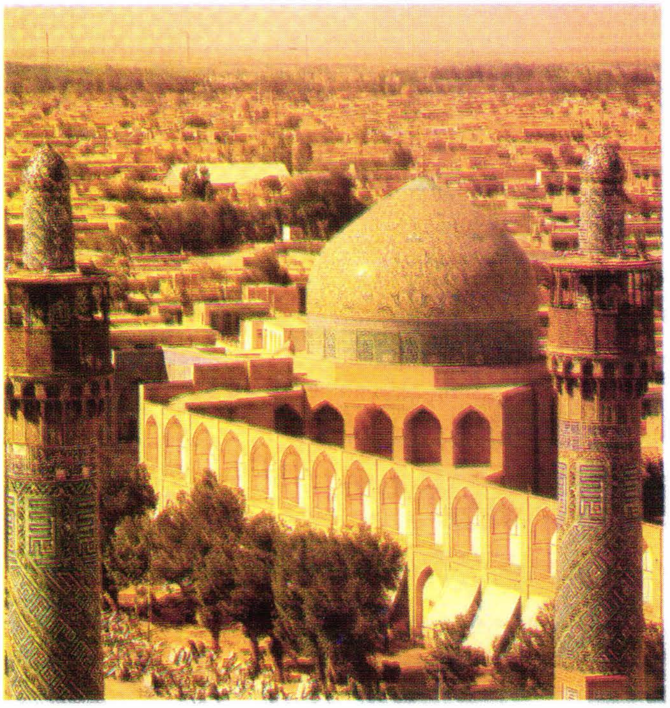

লুতফুল্লাহ্ মসজিদ (১৫৮৮-১৬২৯ খ্রিঃ), ইসফাহান, ইরান। প্রথম আব্বাসের সময়কালে নির্মিত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চতুষ্পার্শ্বে মহাসাগরীয় এলাকায় ইসলামের অবস্থা

সিমারাং প্রাথমিক মুসলিম জনপথ

সিমারাং মুসলিম সুলতানি আমল

ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলিম সুলতানি আমলের সম্ভাব্য সীমারেখা

বাণিজ্যিক পথ

বাটাক অমুসলিম বসতি

১৭৬৩ স্পেনিশ উপনিবেশের সময়কাল

১৫২৫ পর্তুগিজ উপনিবেশের সময়কাল

১৬১৯ ডাচ্ উপনিবেশের সময়কাল

www.pathagar.org

আফ্রিকা ও ইউরোপে

ইসলাম

আরব উপদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন আফ্রো-ইউরোপ এলাকায় ইসলাম

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ওফাত (৮ জুন, ৬৩২ খ্রিঃ) হলে মুসলিম জাতি দলনেতাহীন না হয়ে তাঁর নিদের্শিত 'শূরায়ী' বা পরামর্শভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে মহাবনী (সা) সফল হয়েছিলেন। চারজন সুনিয়ন্ত্রিত খলিফা-খোলাফায়ে রাশেদীনসহ আরও অনেক আনুগত্যশীল, নিবেদিতপ্রাণ ও একনিষ্ঠ অনুসারী (সাহাবা)দের দ্বারা। আরব জাহানের বাইরে রাজ্য বিজয় শুরু হয় এই খলিফাদের শাসনামলেই (৬৩২-৫৬ খ্রিঃ) প্রাথমিকভাবে মূলত বিক্ষিপ্ত উপজাতীয় অভিবাসন এর মাধ্যমে।

তবে বিশেষ করে ২য় খলিফা উমর ইবনে আল খাত্তাব (৬৩৪-৪৪ খ্রিঃ) এর আমলে বিভিন্ন বিজিত এলাকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত নেতৃত্ব কিছুটা বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে এবং উমাইয়া বংশ (৬৬১-৭৫০ খ্রিঃ) আবির্ভূত হয় কুরাইশ বংশের আভিজাত্য থেকে। 'খোলাফায়ে রাশেদীন' মক্কা এবং মদিনায় স্থায়ী হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু উমাইয়া বংশ তাদের শাসনকেন্দ্র দামেস্কে সরিয়ে নেন।

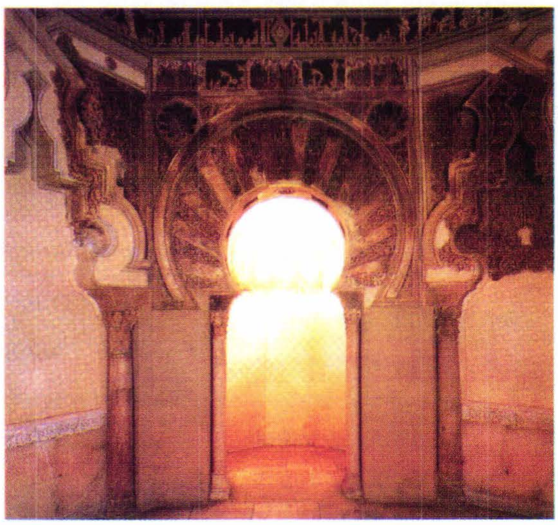

প্রাসাদ মসজিদের মিহরাব, যারাগোযা (স্পেন)

www.pathagar.org

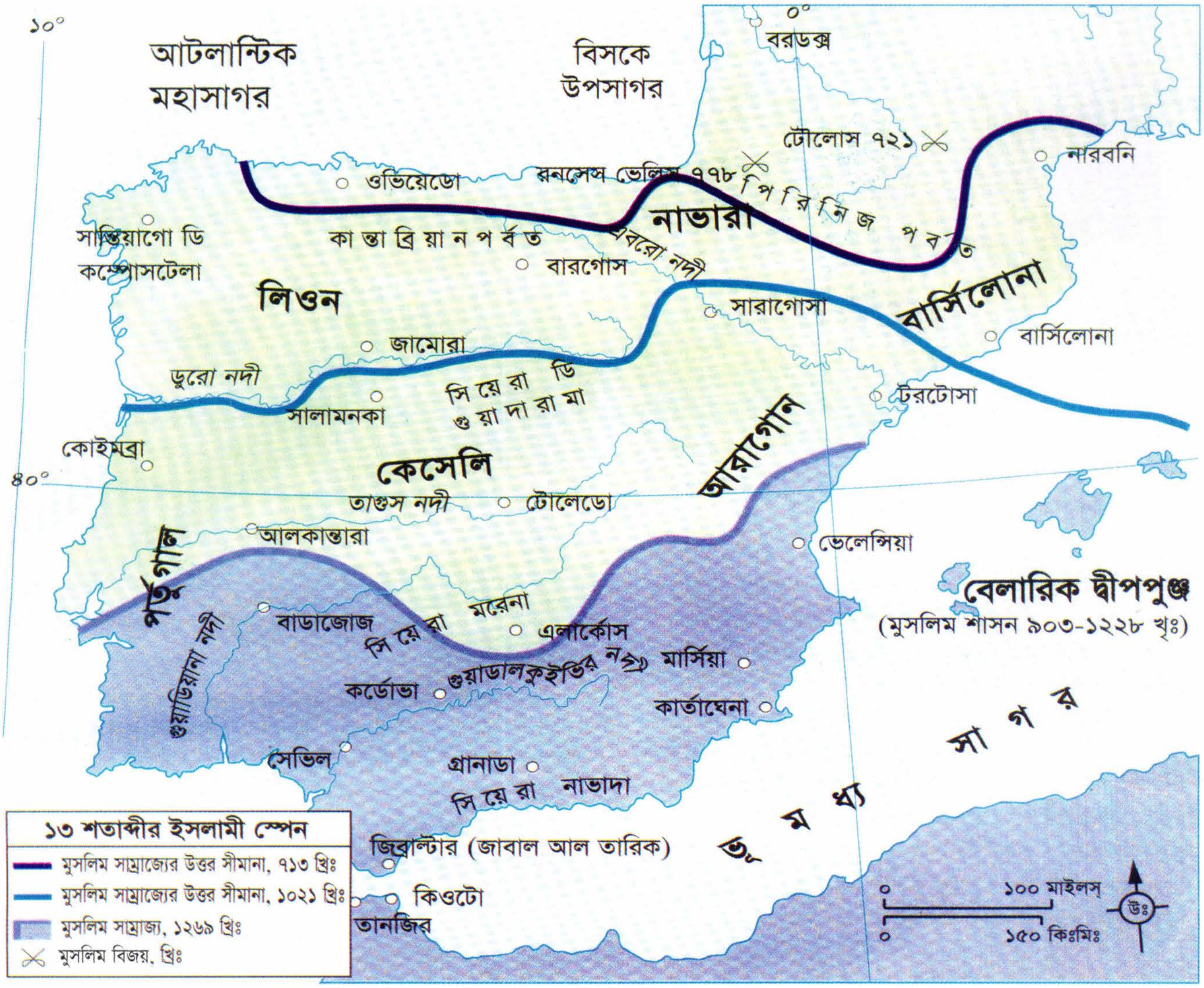

তাঁদের পরবর্তী আব্বাসীয় শাসকগণ-যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম আরব কেন্দ্রীক ছিলেন, বাগদাদে একটি নতুন রাজধানী গড়ে তুলেন। দজলা (Tigris), ফোরাত (Euphrates) বিধৌত বাগদাদ ছিল ইরাক, ইরান এবং সিরিয়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রধান কেন্দ্র।

যদিও ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সম্ভবত কোন সুসংগঠিত মুসলিম সৈন্যদলের (Regimented Cantonment Type) আবির্ভাব হয়নি, কিন্তু সংগঠিত হওয়ার পরপরই এই সৈন্যদল সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং খালিদ ইবনে-আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে পূর্বদিকে সাসানিয়ান সাম্রাজ্যে এবং উত্তর দিকে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় অভিযান শুরু করেন। ৬৩৫ খ্রিঃ কাদেসিয়ার যুদ্ধে দুর্দান্ত পারসিকদের এবং ৬৩৬ খ্রিঃ 'ইয়ারমুক' এর যুদ্ধে প্রতাপশালী 'বাইজানটাইন' বাহিনীকে পরাজিত করে ৬৪০-৪১ খ্রিঃ মিশর জয় করেন। ৬৪৬ খ্রিঃ 'হেলিও পলিশ' এবং 'আলেকজান্দ্রিয়া' বিজিত হয়। উমাইয়াদের দ্বারা মিশরের ফস্তাত নগরী গড়ে উঠেছিল ৬৪৩ খ্রিঃ এবং এরপর তাঁরা উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা করতলগত করেন। সমসাময়িক কালে সাইপ্রাস এবং সিসিলির বিরুদ্ধে নৌ অভিযান শুরু হয়েছিল এবং এসময় মুসলিমরা একটি বৃহৎ নৌ শক্তিতে পরিণত হয়। ৮ম শতাব্দীতে উমাইয়া খলীফা আল ওয়ালিদের আমলে ইসলাম আরো ব্যাপকতা লাভ করেছিল ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা থেকে স্পেন এবং ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃতির মাধ্যমে।

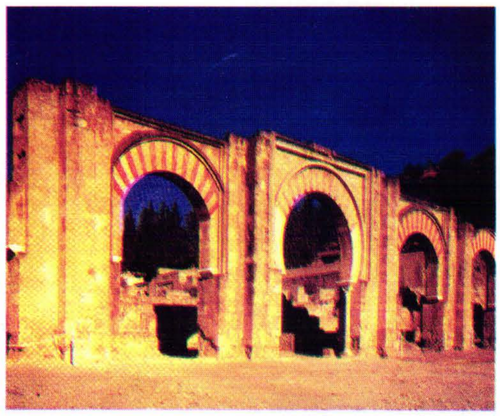

মদিনা আল-যাহ্‌রা, করডোভা (স্পেন)- খলিফা তৃতীয় আবদ্ আল-রহমানের প্রাসাদ নগরী ছিল এটি। ছবির অংশটি মদিনা আল যাহ্‌রার প্রকাণ্ড, অশ্বখুরাকৃতি খিলানের। এর পেছনেই ছিল খলিফা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বসার জায়গা, যে স্থান থেকে তারা প্যারেড দেখতেন।

www.pathagar.org

জিন্নে মসজিদ, (১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত), মপটি, আফ্রিকা। স্থানীয় ঐতিহ্যগত শিল্পকলার অনুকরণে নির্মিত।

আল-মুয়াদ সাইখ মসজিদ (১৪১৫-২১ খ্রিঃ), কায়রো, মিশর। মসজিদটি মামলুক শাসনামলে নির্মিত কারুকার্যখচিত মিনার সম্বলিত। এটি কায়রো স্মৃতিসৌধ সমন্বিত মসজিদগুলোর অন্যতম। মসজিদটির প্রাঙ্গণ তোরণবেষ্টিত।

আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও বিকাশ ঐতিহ্যগতভাবে ব্যাপক দাওয়াতী কর্মকাণ্ড, অভিবাসন (হিজরত), সামরিক বিজয় এবং বাণিজ্য দ্বারা সংঘটিত হয় মূলত চারটি ধাপে।

১ম পর্যায়টি (৭-৮ শতাব্দী) সংঘঠিত হয় উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা এবং মিশরে সামরিক বিজয়ের দ্বারা। ক্রমে এই বাণিজ্যপথ ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী বন্দরসমূহ থেকে শুরু করে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত চারণভূমি (Grass Land) এবং বৃষ্টিবিধৌত বনভূমি (Rain Forest) অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

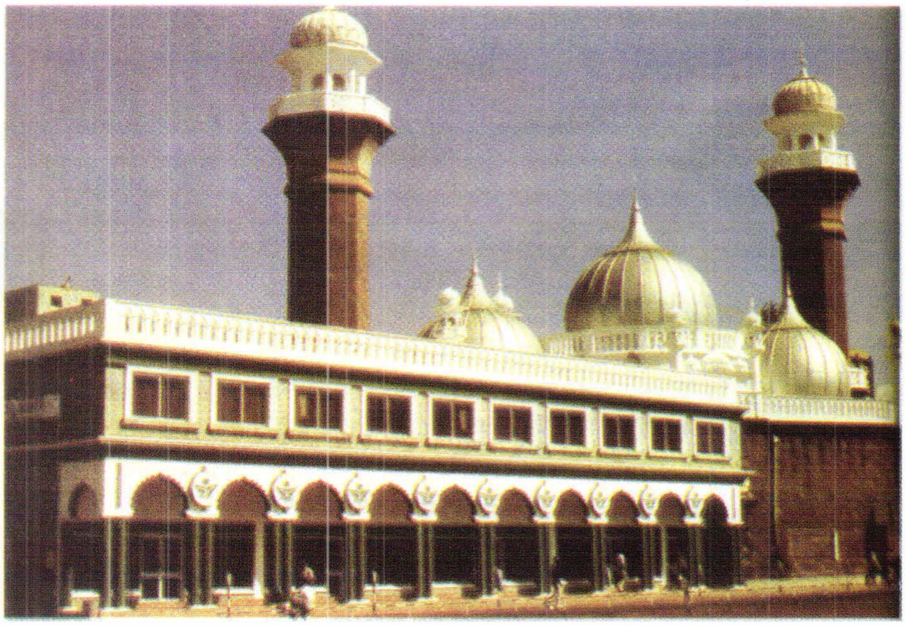

বড় মসজিদ (১৯০৯ খ্রিঃ), জিনি, মালি, আফ্রিকা। ফরাসীদের তত্ত্বাবধানে এই মসজিদটি গড়ে ওঠে।

www.pathagar.org

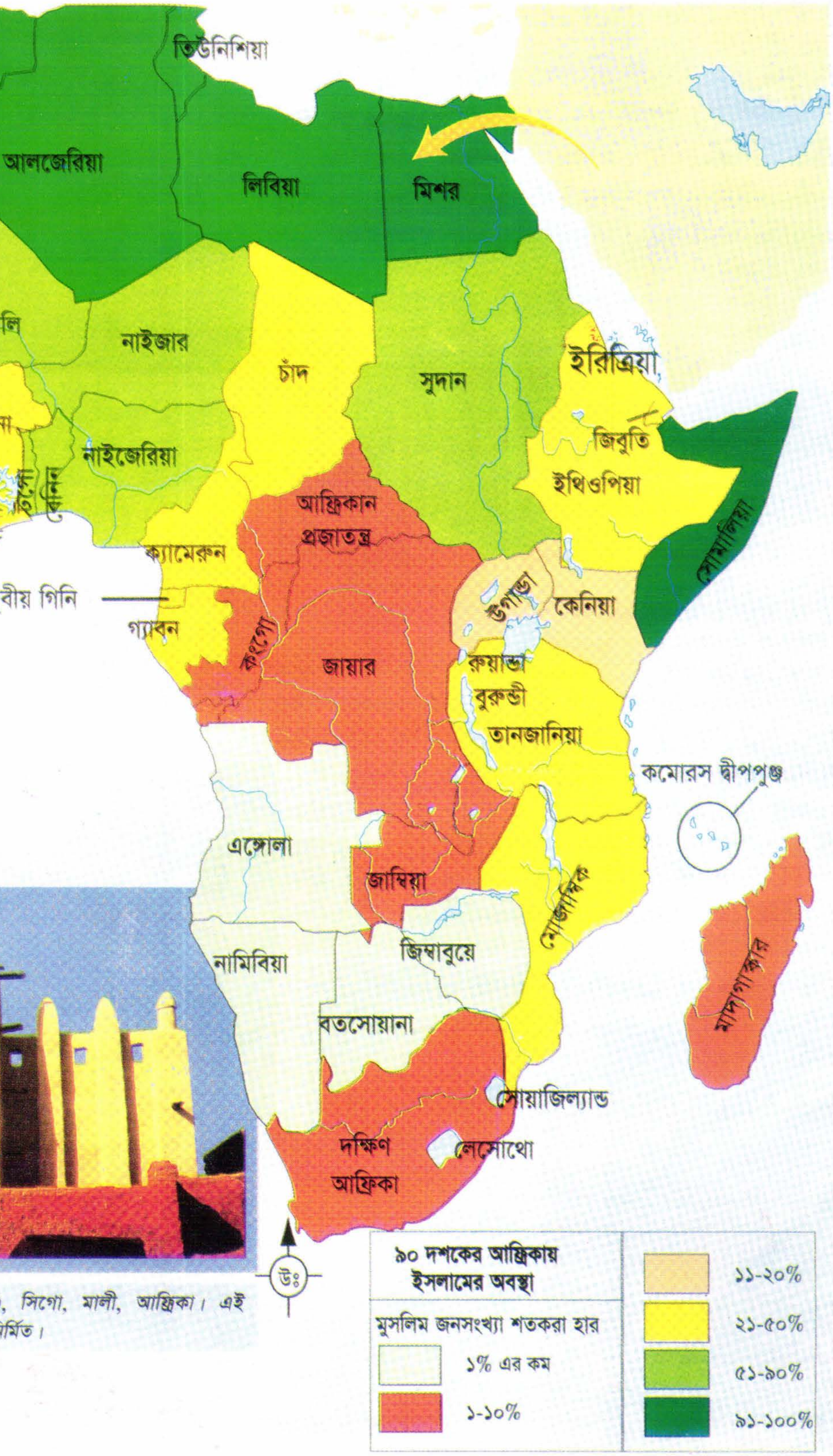

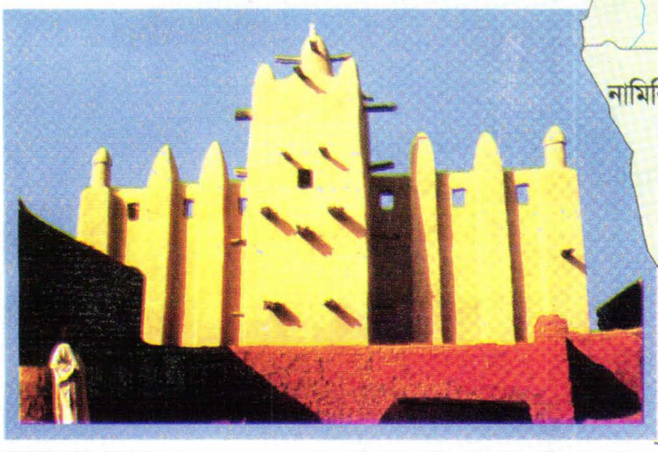

গ্রামীণ মসজিদ (১৯৬০ খ্রিঃ- পুনর্নির্মিত), সিগো, মালী, আফ্রিকা। এই মসজিদটি স্থানীয় স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত।

www.pathagar.org

১০ম শতাব্দীতে সমগ্র দক্ষিণের স্বর্ণ ব্যবসা, উত্তরের লবণ ব্যবসা এবং ক্রীতদাস, শীতবস্ত্র ও বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর যাবতীয় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী ঘানা সাম্রাজ্য মুসলিমদের করদভূক্ত হয়। অত্র এলাকায় বসবাসকারী প্রায় সকলেই এই ব্যবসায়ীদের প্রভাবে ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে পড়ে।

ম্যান্ডিং শিল্পকলায় নির্মিত গ্রামীণ মসজিদ (১৮ শতাব্দী), চেসা নগরী, উত্তর ঘানা

২য় পর্যায় (১১-১৪ শতাব্দী) ইসলাম সাহারার মধ্য দিয়ে পশ্চিম আফ্রিকায় ও নীলনদ দিয়ে সুদানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে পাড়ি দিতে হয়েছিল বিস্তৃত বাণিজ্যিক পথ, যা পশ্চিম এবং উত্তর আফ্রিকাকে সংযুক্ত করেছিল।

৩য় পর্যায়ে (১৬-১৮ শতাব্দী) রাজ্য গঠনে মুসলিম বণিকসহ মুসলিম পণ্ডিত এবং সুফীদের প্রভাব ছিল মূল চালিকাশক্তিস্বরূপ। এ কথার সাক্ষ্য প্রমাণ করে 'ফাঞ্জ' (Funj) এর মুসলিম সুলতান প্রতিষ্ঠিত 'কানেম-বরনু' (Kanem-Borno) সাম্রাজ্যে, যা মূলতঃ 'উলামাদের দ্বারা পরিচালিত হত।

আফ্রিকায় ইসলাম প্রসারের ৪র্থ ধাপ শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং বিশেষায়িত হয়েছিল সুফীদের দ্বারা, বিশেষ করে কাদেরিয়া এবং তিজানীয়াহ্ এর প্রভাবে।

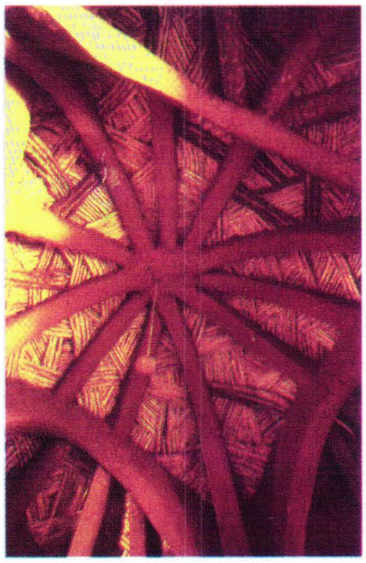

এটি ডিংগুরাইয়ার বড় মসজিদের গম্বুজ। গম্বুজটি মান্ডালা নামক পবিত্র সৃষ্টি কাঠামোতে তৈরি।

মলিন্দি মসজিদ (১৮ শতাব্দী), জানযিবার

একইসাথে ক্রমে সমৃদ্ধশালী হচ্ছিল ব্যাপক ইসলামী কর্মকাণ্ড এবং পুনরুত্থান যা একটি সংঘবদ্ধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে। ফলত ১৮০৪ সালে 'হাউজাল্যান্ড' (Hausaland) এর 'সোকোতো' (Sokoto) রাজ্যের ওসমান-ডান-ফোডিও কর্তৃক ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব সুদানে (১৮৮২-৯৬ খ্রিঃ) স্থায়ী 'মাহদীবাদী' রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে উপনিবেশবাদী শক্তিকে পরাভূত করা হয়।

বড় মসজিদ (১৮৩৯-৮৩ খ্রিঃ), ডিংগুরাইয়া, গিনি। ধর্মীয় নেতা আলহাজ ওমর এই মসজিদ স্থাপন করেন

www.pathagar.org

Calender 2000

ঘটনাবহুল বিংশ শতাব্দী

স্বাগতম একবিংশ শতাব্দী– নতুন এক সভ্যতা বিনির্মাণের শতাব্দী। মহাবিশ্বের এ ক্ষুদ্র গ্রহবাসীরা একটি শতাব্দী, একটি মহাসময় অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এ শতাব্দী ছিল মুক্তির, ছিল বিদ্রোহের, ছিল সুখ-বিলাসিতার, ছিল বেদনা-ধ্বংসলীলা আর বিভৎসতার। বিপরীতমুখী ঘটনায় ভরপুর এ শতাব্দীকে আমরা বিশ্ব ক্যানভাসে তুলে ধরার চেষ্টা করছি–

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা আর্দ্র কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

www.pathagar.org

এক মহা বিস্ময় নিয়ে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব। তমসাচ্ছন্ন ঘুমন্ত বিশ্ববাসীকে প্রাণের ছোঁয়া দেয় ইসলাম। সৃষ্টি হয় নতুন এক সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। তারপর চতুর্মুখি ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মুসলিম বিশ্ব পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে দীর্ঘকাল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জেগে ওঠে মুসলিম বিশ্ব। ধীরে ধীরে আদায় করে নিতে থাকে স্বাধীনতা, ফিরে পেতে থাকে তার হৃত গৌরব। আর বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট তো ঘোষণই করছে- আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী।

calender 2000

আরব বিশ্বের তেলকূপ

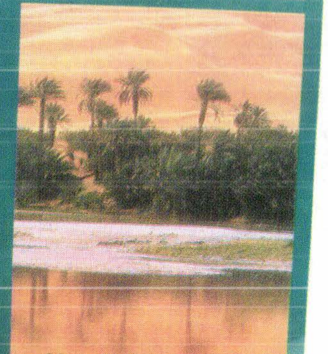

লিবিয়ার জেজান মরুভূমির একটি মরুদ্যান- মরু প্রধান আরব বিশ্বের এক বৈসাদৃশ্যিক দৃশ্য।

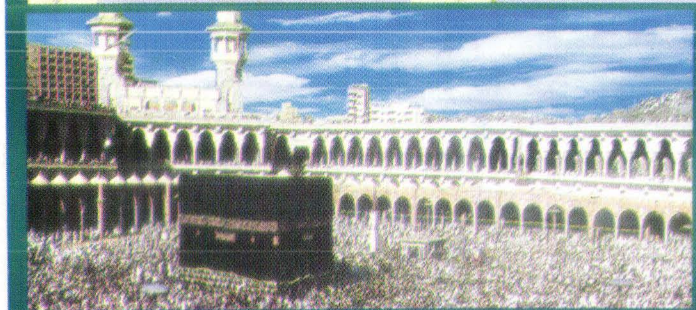

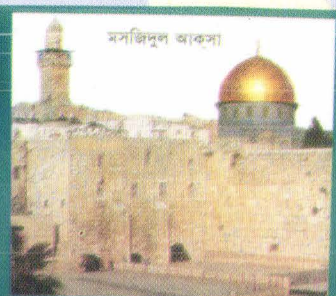

মসজিদুল আকসা

জেরুজালেম শহর তিনটি ধর্মের মানুষের কাছে পবিত্র ভূমি হিসেবে পরিচিত। মুসলিমরা মসজিদুল আকসার গম্বুজকে (Dome of rock), ইহুদীরা Western Wall কে পবিত্র মনে করে। ঈসার (আ) জন্মস্থানের কারণে খৃষ্টানদের নিকটও জেরুজালেম পবিত্র।

জিব্রাল্টার

ইসলামের ঘটনা প্রবাহ

৫৭০খৃ হযরত মুহাম্মদের (সা) জন্ম
৬১০খৃ নবুওয়াত লাভ
৬২২খৃ মদীনায় হিজরত
৬২৪খৃ বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়
৬২৮খৃ হুদাইবিয়ার সন্ধি ও ইসলামের সম্প্রসারণ
৬৩০খৃ মক্কা বিজয় ও আরব ভূখণ্ডে একক শক্তিতে পরিণত
৬৩২খৃ বিদায় হজ্ব এবং মুহাম্মদের (সা) ইন্তেকাল, আবু বকরের (রা) খিলাফত লাভ
৬৩২-৩৪খৃ রিদ্দার যুদ্ধ, ইয়ামামার যুদ্ধ, উমরের (রা) খিলাফত লাভ
৬৩৫-৪১খৃ বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য বিজয়
৬৩৬খৃ ইয়ারমুকের যুদ্ধ, সিরিয়া ও জর্ডান অধিকার
৬৩৭খৃ জেরুজালেম অধিকার
৬৩৯-৪২খৃ মিশর অভিযান ও বিজয়
৬৪৪খৃ হযরত উমরের শাহাদাত ও উসমানের খিলাফত
৬৫১খৃ কুরআন সংকলন
৬৫২খৃ গজনী, হিরাত, মাকরান, সিজিস্তান বিজয়
৬৫৬খৃ হযরত আলীর খিলাফত লাভ, উষ্ট্রের যুদ্ধ
৬৫৭খৃ সিফফিনের যুদ্ধ
৭৩২খৃ ফ্রান্সের টুর্সের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় এবং ইউরোপে ইসলামের সম্প্রসারণ রোধ
৭৫০খৃ জাবের যুদ্ধে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ও আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠা
৭৫৪খৃ আল মনসুরের ক্ষমতা লাভ
৭৬৭খৃ ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকাল
৭৮৬খৃ হারুন-অর-রশিদের সিংহাসনে আরোহণ
৮১৩খৃ আল মামুনের শাসনভার গ্রহণ
৮২৫-২৭খৃ সিসিলি, ক্রীট সহ কয়েকটি এলাকা বিজয়
৮৫৫খৃ ইমাম শাফেয়ীর ইন্তেকাল
৮৭০খৃ ইমাম বুখারীর মৃত্যু
১০০০-২৭খৃ সুলতান মাহমুদের ১৭বার ভারত অভিযান
১০৯৭-৯৯খৃ ১ম ক্রুসেড যুদ্ধে খৃষ্টানদের জেরুজালেম দখল
১১০৩-১১খৃ ইমাম গাজ্জালীর সংস্কার আন্দোলন
১১৮৭খৃ ৩য় ক্রুসেড যুদ্ধে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক জেরুজালেম পুনরুদ্ধার
১১৯২খৃ তরাইনের ২য় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয়ে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা
১২০৩-৪খৃ বখতিয়ার খলজির বিহার ও বঙ্গ জয়
১৩৬০-৭১খৃ তুর্কি সুলতান ১ম মুরাদ কর্তৃক ইউরোপের সমগ্র বলকান অঞ্চল অধিকার
১৪৫৩খৃ ২য় মুহাম্মদ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অধিকার
১৪৭৫খৃ ক্রিমিয়া ও ইতালীর [illegible] দখল
১৪৯২খৃ স্পেন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম উচ্ছেদ
১৫২১-২৬খৃ সুলতান সুলায়মান কর্তৃক বেলগ্রেড, রোডস, হাঙ্গেরী, ইটালীর [illegible] ও ভেনিসীয় দ্বীপ দখল
১৫২৬খৃ পানিপথের ১ম যুদ্ধে সম্রাট বাবরের বিজয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা
১৬০৫-২৪খৃ মুজাদ্দিদ আলফে সানীর সংস্কার আন্দোলন ও দীন-এ-এলাহীর মূলোৎপাটন
১৬৫৮খৃ আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা লাভ
১৬৭২খৃ ইউক্রেন অধিকার
১৭৫৭খৃ পলাশীর যুদ্ধ প্রহসনে ইংরেজদের বিজয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়
১৮২৬খৃ তুরস্কের জেনিসেরি বাহিনী ধ্বংস
১৮৩১খৃ বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভির শাহাদাত বরণ
১৮৫৭খৃ ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার বিদ্রোহ

www.pathagar.org

৭১০খৃ সমরকন্দ বিজয়
৭১২খৃ সিন্ধু, স্পেন, চীন সীমান্তের কাশগড় বিজয়
৭১৭খৃ উমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষমতা লাভ
১৩১০খৃ আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন
১৩২৭খৃ বিখ্যাত মুজাদ্দিদ ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যু
১৯৯৮খৃ ১ম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানে পারমানবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ

তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো, তিনি তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেনই, তা কাফেরদের নিকট যতই অপছন্দের হোক।

সূরা আস-সফ ৮

মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিখ্যাত কেন্দ্র সমরকন্দ, বোখারা মধ্য এশিয়ার অন্যতম শহর। বিখ্যাত মুসলিম গবেষক ইমাম বোখারীর স্মৃতি বিজড়িত এসব স্থান পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল। বর্তমানে স্বাধীন উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

বোখারা

তাজমহল

জিন্নাহ মসজিদ
মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ মহাদেশ আমেরিকার ত্রিনিদাদ-টোবাগোর বিখ্যাত মসজিদ।

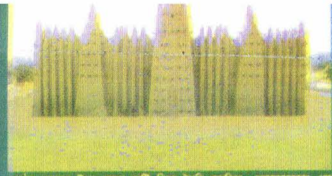

কাঠের ফ্রেমের উপর কাদা মাটি দিয়ে তৈরি মসজিদ- মুসলমানদের এক অপূর্ব নির্মাণ শৈলী। মসজিদটি মালিতে অবস্থিত। এ জাতীয় মসজিদ দেশটির প্রায় সকল শহরেই দেখা যায়। উল্লেখ্য যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব বণিকদের আগমনের ফলে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইস্তাম্বুল

বসফরাস প্রণালী দ্বারা বিভক্ত ইস্তাম্বুল শহরটি দু'টি মহাদেশে (এশিয়া-ইউরোপ) অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র শহর। ৩৩০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামকে নতুন রাজধানী ঘোষণা করেন, নাম দেন নোভারোমা। পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপল নাম ধারণ করে। এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ গুরুত্বপূর্ণ শহরটি মুসলমানগণ ৬বার (৬৬৯, ৬৭৪-৭৫, ৭১৬-১৭, ৭৮২, ৮৩৮, ১০৯৬-৯৯ খৃঃ) অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর তুর্কি সুলতান ২য় মুহাম্মদ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে জয় করেন। এ শহরটি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তুরস্কের রাজধানী ছিল। বর্তমানে এর নাম ইস্তাম্বুল।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

বিশ্বখ্যাত এক স্থাপত্য নিদর্শন। বিখ্যাত হযরত খান জাহান আলী বাংলাদেশের বাগের হাট জেলায় খৃষ্টীয় ১৫ শতকে এটি স্থাপন করেন। এত অধিক গম্বুজ বিশিষ্ট স্থাপত্যের অন্য কোন নজির বিশ্বে নেই। ষাট গম্বুজ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন সমগ্র খৃষ্টান ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন পশ্চিমে আন্দালুসিয়া থেকে পূর্বে খোরাসান ও গজনি পর্যন্ত এই বিশাল ভূ-খণ্ডে মুসলিম গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কার এবং গবেষণা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে রাখেন। তাদের সেই অবদানের কারণেই আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়েছে এত প্রসারিত। এত ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের অবদান উল্লেখ করা অসম্ভব। তবু বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো-

জ্যোতির্বিজ্ঞান : জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান অবিস্মরণীয়। আল-ফারগানী (মৃ ৮৭০) সর্বপ্রথম গণিতের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করেন। বনু মুসা ভ্রাতৃত্রয় (৯ম শতাব্দী) ক্রান্তিবৃত্তের দীর্ঘকক্ষ, পৃথিবী কক্ষের অপভূ ও অনুভূ নির্ণয়, ছাবিত ইবনে কোরা (৮২৬-৯০১) সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। আল-বাত্তানি (৮৫৮-৯২৯) জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে তালিকা প্রণয়ন করেন জিজ-আল শাবিল নামে আজও তা পরিচিত, আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮) চন্দ্রের লম্বন, কোন স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা নির্ণয় ও দিগন্ত দূরত্ব আবিষ্কার করেন।

গণিত : গণিতের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় মুসলমানদের অবদান রয়েছে। বীজগণিতের অবদানের জন্য আল খাওয়ারিজমিকে (মৃ ৮৫০) বীজগণিতের জনক বলা হয়। তাঁর আবিষ্কৃত এলগোরিদম ও লগারিদমকে ভিত্তি করেই কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়েছে। বীজ গণিত ও ত্রিকোণমিতির বিভিন্ন সূত্র ও সমস্যা সমাধানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান অগ্রগণ্য। গোলাকার ত্রিকোণমিতির সূত্রপাত, ত্রিকোণমিতিতে সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্টের ব্যবহার, বিভিন্ন কোসাইন সূত্র ইত্যাদি মুসলমান গণিতবিদদেরই অবদান।

পদার্থ বিজ্ঞান : পদার্থ বিজ্ঞানে মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইবনে আল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাকে অপটিক্স এর জনক বলা হয়। আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮) পদার্থের তুলা ওজন পরিমাপ করেন। তাছাড়া আল কিন্দি (মৃ ৮৭৩), বনু মুসা ভ্রাতৃত্রয় (৯ম শ), আল ফারাবী (৮৭২-৯৫০) আল-খাজেনি (১২শ শতাব্দী), ইবনে ইউনুস (মৃ ১০০৯), ইবনে মাস'উদ আল-সিরাজী (১২৩৬-১৩১১) প্রমুখ পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদান রাখেন।

রসায়ন : কেমিষ্ট্রি (রসায়ন) শব্দটি আরবি আল-কেমিয়া থেকে উদ্ভূত। মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানকে (৭২০-৮১৫) আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। আল রাজি (৮৬১-৯২৬) রসায়ন শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। বিখ্যাত মুসলিম রসায়নবিদরা হলেন- খালেদ বিন ইয়াজিদ (মৃ ৭০৪), জুননুন মিসরিহ্ (মৃ ৮৬০), আব্বাস ইবনে ফিরাস (মৃ ৮৮৭), আল মাজরিতী (১০ম শতাব্দী), আল হাকীম (১১শ শতাব্দী), ইবনে-সিনা (৯৮০-১০৩৭), আবুল কাসেম আল ইরাকী (১৩শ শতাব্দী)।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সর্বোত্তম মানব সভ্যতায় এক বিশেষ অবদান। ইবনে সিনা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে চিকিৎসকদের রাজপুত্র বলা হয়। তাঁর গ্রন্থ আল কানুন ফিত্তিব চিকিৎসাবিদ্যার টেক্সবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আল বেরুনীর কিতাব-ই-সাইদানা ফার্মাকোলজির বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হলেন- আলী বিন রাব্বান (জ ৮১০), আল-ইবাদি (৮০৯-৭৭), ইয়াহিয়া ইবনে সারাবী (মৃ ৯০০), আল রাজী (৮৬১-৯২৬), সিনান বিন ছাবিত (মৃ ৯৪৩), আলী ইবনে আব্বাস (মৃ ৯৯৪), আবু মনসুর মুয়াফফা (১০ম শতাব্দী), আবুল কাসেম (৯৩৬-১০১৩)।

তাছাড়া জীববিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও ভূগোলের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম বিজ্ঞানীরা মৌলিক অবদান রাখেন। বিখ্যাত দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ ইবনে খালদুনই (মৃ ১৪০৬) সর্বপ্রথম সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি প্রবর্তন করেন। মূলতঃ এই সব মুসলিম মনীষীদের অবদানেই বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন আজ এত সুসংহত ও উন্নত।

বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান

- এক কালেমা, অভিন্ন মৌলিক বিশ্বাসে বলীয়ান মুসলিম বিশ্ব পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভূ-খণ্ডে অবস্থান করছে।
- মরক্কো হতে ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়া, মোজাম্বিক হতে কাজাকিস্তান পর্যন্ত বিশাল এলাকায় মুসলিম ভূ-ভাগ পৃথিবীর সবচেয়ে কৌশলগত এলাকা।
- বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশই (১৫০ কোটি) মুসলিম। আফ্রিকায় প্রায় ৪০ কোটি, এশিয়ায় প্রায় ১০০ কোটি, ইউরোপের প্রায় ৫ কোটি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় ... বিশাল জনশক্তির অধিকারী মুসলিম বিশ্ব।
- বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলসীমার অধিকারী মুসলিম বিশ্ব। সুয়েজ খাল, জিব্রাল্টার, বসফোরাস, দারদানেলিস, বাবেল মান্দেব, হরমুজ, মালাক্কা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীগুলো মুসলিম বিশ্বের দখলে। কোন কারণে যদি এ পথগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অচল হয়ে যাবে।
- বিশ্বের ৩০% শিল্পের জন্য ব্যবহার্য কাঁচামালের যোগানদাতা মুসলিম বিশ্ব। ৮০% রাবার, ৬০% পেট্রোলিয়াম এবং সকলপ্রকার তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের যোগানদাতা মুসলিম বিশ্ব। তাই ...

www.pathagar.org

Calender 2000

পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি

সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণেয়মান গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীর বুকেই মানুষ গড়ে তুলেছে তার আবাসস্থল। এই পৃথিবীর প্রকৃতি যেমনি স্নেহ-মমতায় লালন করেছে এর অধিবাসীদের, তেমনি ধ্বংসও করেছে অকৃপণভাবে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যময়তার জন্যই প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন ও শ্বাশত।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

বাংলাদেশের কক্সবাজারে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী সমুদ্র সৈকতটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত। এর দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিলোমিটার। নৈসর্গিকতার দিক দিয়ে এটি বিশ্ব পর্যটকদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাছাড়াও বাংলাদেশের কুয়াকাটা পৃথিবীর এক বিরল সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকতের মধ্যে ক্যালেফোর্নিয়া সৈকত, মীয়ামি সৈকত, ভারতের গোয়ার সৈকত অন্যতম।

মহাদেশের সঞ্চালন

প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগ একত্রে ছিল। যার নাম প্যানজাইয়া (Pangaea)। এটি প্যানথালেসা (Panthalassa) নামক একটি বৃহৎ সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে প্লেটের সঞ্চালনের কারণে প্যানজাইয়া ভূখন্ডটি টেথিস (Tethys) সাগর দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে লরেসিয়া (Laurasia) এবং গান্ডোয়ানা (Gondwana) নামধারণ করে। তারপর ৬.৫ কোটি বছর আগে এ দুটি ভূখন্ড খন্ড-বিখন্ড হয়ে বর্তমানের সাতটি মহাদেশীয় ভূখন্ডে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে আলফ্রেড ওয়েগনার এ তত্ত্বটি প্রদান করেন। পৃথিবীর এ মহাদেশীয় সঞ্চালন বর্তমানেও অব্যাহত।

সাহারা মরুভূমি

উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত এই মরুভূমিটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি। আয়তন প্রায় ৮৪,০০,০০০ বর্গ কি.মি.। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মরুভূমি– অ্যারাবিয়ান মরুভূমি (সিরিয়া ও সৌদি আরব) ১৩,০০,০০০ বর্গ কি.মি; কালাহারি মরুভূমি (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৫,২০,০০০ বর্গ কি.মি; থর মরুভূমি (ভারত) ২,৬০,০০০ বর্গ কি.মি; গোবি মরুভূমি (মঙ্গোলিয়া-মধ্য এশিয়া) ১০,৪০,০০০ বর্গ কি.মি.।

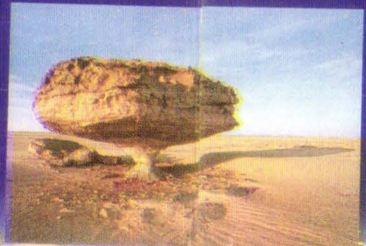

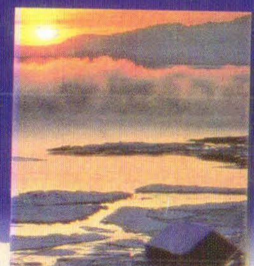

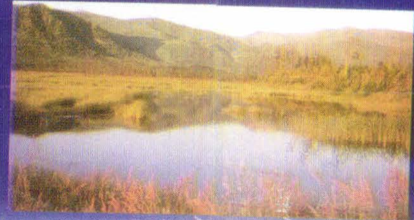

বৈকাল হ্রদ

বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম এবং স্বাদু পানির হ্রদ। এর গভীরতা প্রায় ৬৩৬৭ ফুট। পৃথিবীর প্রায় ২০% স্বাদু পানি সরবরাহ করে বৈকাল হ্রদ। এই হ্রদ সাইবেরিয়ার প্রায় ১২,১৫০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। একে সাইবেরিয়ার নীল চোখ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য বিখ্যাত হ্রদসমূহ হচ্ছে– কাস্পিয়ান হ্রদ/সাগর (কাজাকিস্তান) ৩৭২,০০০ বর্গ কি.মি; সুপিরিয়র হ্রদ (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা) ৮২,৪০৩ বর্গ কি.মি; ভিক্টোরিয়া (পূর্ব-মধ্য আফ্রিকা) ৬৯,৪৮৪ বর্গ কি.মি; আরল হ্রদ (কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তান) ৬৬,৪৫৯ বর্গ কি.মি.।

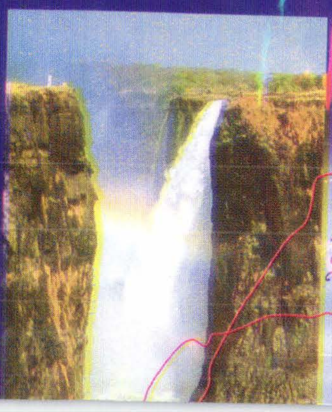

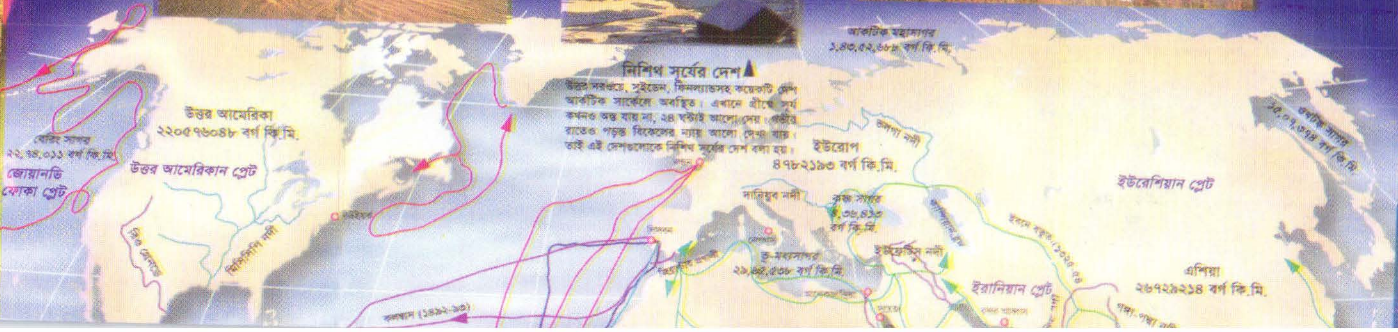

ফুজিয়ামা

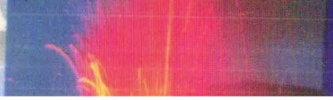

জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি

www.pathagar.org

www.pathagar.org

সীরাতে রাসূল (সা) মক্কা অধ্যায়

calendar 2001

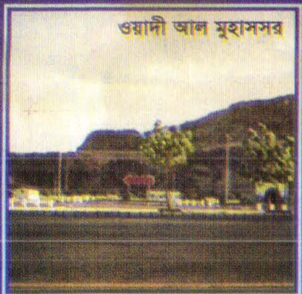
ওয়াদী আল মুহাসসর

রাসূল (সা) এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে (মার্চ ৫৭০খৃ) কাবাঘর ধ্বংস করতে এসে আবরাহা ও তার বিশাল হস্তী বাহিনী এখানে ধ্বংস হয়। এ স্থানে পৌঁছার সাথে সাথে হাতিগুলো বসে যায়, কাবামুখী না হয়ে উল্টো দিকে ছুটতে থাকে। ঠিক সে সময় ক্ষুদ্রাকৃতির এক ঝাঁক পাখি ছোট ছোট পাথর কণা নিক্ষেপ করে সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে ভূষির ন্যায় নাস্তানাবুদ করে ফেলে। ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে রাসূল (সা) এর জন্মের পূর্বাভাস হিসেবে মনে করেন। নইলে কাবার অধিকারী পৌত্তলিকদের নিকট আবরাহার খৃস্টান বাহিনীর পরাজয় ঘটত না। আল্লাহ বলেন- 'আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রভু হস্তী বাহিনীর সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?'-সূরা ফীল

এ সেই বাড়ি যেখানে মহানবী (সা) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। মসজিদুল হারাম থেকে আনুমানিক ৫০ মিটার দূরে সুক-আল-লাইল এলাকায় অবস্থিত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের এ বাড়িটিতেই বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বমানবতার অগ্রদূত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন। তাঁর জন্মে অত্যধিক খুশি হয়ে দাদা আবদুল মুত্তালিব নাম রাখেন 'মুহাম্মদ' বা প্রশংসিত। ইতোপূর্বে এ নাম আর কারো ছিল না।

জন্মস্থান

যেখানে শায়িত আছেন প্রিয় নবীর প্রথম সহধর্মিনী খাদিজাতুল কুবরা (রা)। যিনি শিশু ইসলাম ধর্মকে পরম মাতৃস্নেহে লালন করেছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ রাসূল (সা) ও ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দেন। যিনি রাসূলকে ইসলাম প্রচারে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস যোগাতেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসূল (সা) এর আর কোন সাহায্য ও সহায়তাকারী মক্কায় রইল না। তাই শোকে কাতর হয়ে রাসূল (সা) বলেছিলেন- 'আমার পাজরের হাড়গুলো যেন ভেঙ্গে গেছে।' নবুয়তের ১০ম বছরের এ সংকটময় সময়কে রাসূল (সা) 'আমুল হুযন' বা শোক-দুঃখের বছর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কাবাঘর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত বিখ্যাত এ কবরস্থানে রাসূল (সা) ও খাদিজা (রা) দম্পতির দুই সন্তানের কবর রয়েছে।

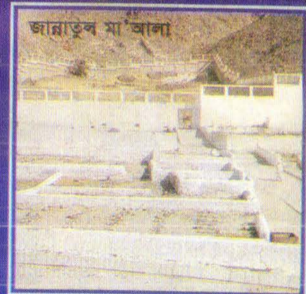
জান্নাতুল মা'আলা

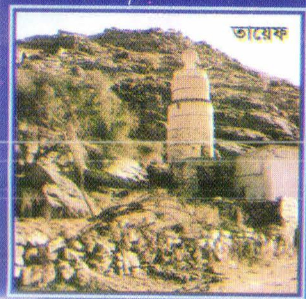
তায়েফ

মিনার চিহ্নিত এস্থানেই এক সময় রাসূল (সা) মারাত্মক আহত অবস্থায় আশ্রয় নেন। এ পাহাড় ও অপর একটি পাহাড়ের মধ্যখানে তায়েফ শহর অবস্থিত। রাসূল (সা) যখন তায়েফের রাস্তায় রাস্তায় কাফেরদের পাথরের আঘাতে জর্জরিত, রক্তে পরবস্ত্র জবজবা; তখন কাফেরদের দৃষ্টি এড়িয়ে শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত পাহাড়টির পাদদেশের আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় নেন। এ সময় আদ্দাস নামক ঐ বাগান মালিকের কৃতদাস তার মজুরী থেকে আঙ্গুরের রস রাসূলকে পান করান। তখন জিব্রাইল (আ) রাসূলকে বলেন- 'হে রাসূল আপনি বলুন, উভয় পাহাড়কে এক করে এ জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেই'। রাসূল (সা) তাদের ধ্বংসের পরিবর্তে হেদায়েতের জন্য যে ঐতিহাসিক মুনাজাত করেন তাতে আদ্দাস, যায়েদ (রা) ও জিব্রাইল (আ) আমিন আমিন বলেছিলেন।

জীবনপঞ্জি ঃ নবুয়াত পূর্ব সময় (৪০ বছর)

৫৭০খৃ ঃ ৫ মে, ১২ রবিউল আউয়াল (ভিন্নমত ৫৭১খৃ ২০ এপ্রিল, ৯ রবিউল আউয়াল) সোমবার সুবহে সাদেকের সময় মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্ম। ১৫ দিন পর দুধ পান, বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় লালন পালন ও পরিশুদ্ধ ভাষা রপ্তের জন্য বনু সাদ গোত্রের হালিমা সাদিয়াকে প্রদান।

৫৭২খৃ (২ বছর) ঃ দুধপান শেষে মা আমিনার কাছে প্রত্যাবর্তন। বরকত লাভের আশায় হালিমার পুনরায় নেওয়ার আবেদন এবং মক্কায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে মায়ের সম্মতি।

৫৭৪খৃ (৪ বছর) ঃ ১ম বক্ষ বিদীর্ণ। হালিমা এতে ভীত হয়ে তাঁকে মায়ের কাছে দিয়ে আসেন।

৫৭৬খৃ (৬ বছর) ঃ মায়ের সাথে মদীনায় পিতার কবর জিয়ারত শেষে ফিরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মায়ের মৃত্যু। দাসী উম্মে আইমান মক্কায় নিয়ে আসলে দাদা আবদুল মুত্তালিবের হাতেই লালন-পালন।

৫৭৮খৃ (৮ বছর) ঃ দাদার মৃত্যু। চাচা আবু তালিবের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ, আমৃত্যু (রাসূলের ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত) ছায়ার মত আশ্রয় দান।

৫৮০খৃ (১০ বছর) ঃ ২য় বার বক্ষ বিদীর্ণ।

৫৮২খৃ (১২ বছর) ঃ ৪ বছর ধরে চাচার মেষ পালন। তারপর চাচার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে রওয়ানা। পথিমধ্যে বুসরা নামক স্থানে পাদ্রী বাহীরা কর্তৃক নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বাহীরার সতর্ক পরামর্শে ফিরে আসা। পরবর্তীতে ২০/২১ বছর বয়স পর্যন্ত চাচাদের সাথে ইয়ামান, সিরিয়া, বাহরাইন, জাবাশা, জারাশ প্রভৃতি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে একাধিকবার সফর।

৫৮৯খৃ (১৯ বছর) ঃ তীর কুড়িয়ে ও আগুন নির্বাপণের মাধ্যমে ৪র্থ ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং মানবাধিকার ও সমাজসেবামূলক সংস্থা 'হিলফুল ফুযূল' গঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর কার্যক্রম নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

৫৯৪খৃ (২৪ বছর) ঃ মক্কার অভিজাত ধনাঢ্য মহিলা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের (রা) মালামাল নিয়ে সিরিয়া-ইয়ামানে দু'বার বাণিজ্য সফর ও অভাবিত লাভ অর্জন এবং খাদিজার ভৃত্য সফরসঙ্গী মাইসারা কর্তৃক বাণিজ্যিক কুশলতা ও সততার ভূয়সী প্রশংসা।

৫৯৫খৃ (২৫ বছর) ঃ বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে বিংবদন্তিপ্রতীম সতী সাধ্বী নারী ৪০ বছর বয়স্কা খাদিজার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব ও আবু তালিবের সম্মতিতে খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। এটি খাদিজার ৩য় এবং নবীজির ১ম বিয়ে।

৬০৫খৃ (৩৫ বছর) ঃ কাবা শরীফ সংস্কার কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপন বিবাদের অভূতপূর্ব মীমাংসার ফলে অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা এবং মক্কার অবিসংবাদিত মধ্যস্থতাকারীতে পরিণত। এ সময়ে বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতার কারণে কৈশোরে প্রদত্ত আল-আমীন, আস-

হালিমার বাড়ির উঠান ও কূপ

যেখানে রাসূল (সা) তাঁর শিশুকাল কাটিয়েছিলেন। উদার প্রকৃতির মাঝে বিচরণ করে তাঁর শিশু মনোভূমি গড়ে তুলেছিলেন। রাসূল (সা) বলেন- আমাকে আমার প্রভুই শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি উত্তম স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দেন।

এ স্থানে অনুষ্ঠিত তিন বছরের (৬২০খৃ, ৬২১, ৬২২খৃ) পরপর তিনটি বৈঠক এবং শপথ অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিতে রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করেন- যা ছিল ইসলামের সমগ্র বিজয়ের ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। ১ম বছর ৬ জন, ২য় বছর ১২ জন এবং ৩য় বছর ৭৫ জন ইয়াসরেববাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। যারা সমস্ত বিপদ নির্যাতন মাথায় পেতে নিয়ে রাসূল ও ইসলামকে রক্ষার শপথ নেন।

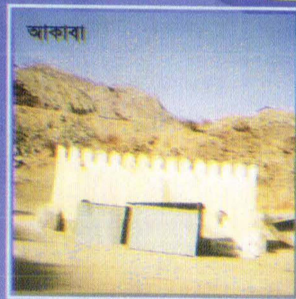
আকাবা

জীবনপঞ্জি ঃ মক্কার নবুয়াত কাল (১৩ বছর)

৬১০খৃ ঃ ১৭ আগস্ট, ২১ রমজান সোমবার রাতে হেরা গুহায় প্রথম প্রত্যক্ষ ওহী লাভ। তখন বয়স ছিল ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। ঠিক ৪০ বছর বয়স থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে নবুয়াতের নিদর্শন পাওয়া শুরু।

৬১০-৬১৩খৃ ঃ গোপনে ইসলাম প্রচার, ৩ বছরে ৪০ থেকে ৫২ জনের ইসলাম গ্রহণ। সকাল-সন্ধ্যায় ২ বার নামাজের নির্দেশ।

৬১৩খৃ ঃ ৩য় নবুয়াতবর্ষ, জুন মাসে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ (১৫:৯৪)। প্রথমে নিকট আত্মীয়দের ২টি জমায়েতে দাওয়াত দান ও আবু লাহাবের রূঢ় বিরোধিতা, তারপর সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত ও আবু লাহাবের প্রস্তর নিক্ষেপ। আবু তালেবের নিকট কুরাইশদের বিচার প্রার্থনা, ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত।

৬১৪খৃ ঃ ৪র্থ নবুয়াতবর্ষ, সেপ্টেম্বর মাসের শেষে হজ্জের মৌসুমে হাজীদের নিকট কুরাইশদের বিরুদ্ধ প্রচারণা ও তাদের বিমুখ করার চেষ্টা। হজ্জ শেষে সম্মিলিত ও চতুর্মুখী প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত। প্রথমত: ঠাট্টা, বিদ্রুপ, উপহাস, গালাগালি; দ্বিতীয়ত: বিকৃত বর্ণনা, সন্দেহ সৃষ্টি, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালানো; তৃতীয়ত: কুরআনের বিপরীতে কাহিনী বর্ণনা ও যৌন প্রলোভন প্রদান, সবশেষে সমঝোতা সাধনের প্রস্তাব।

৬১৫খৃ ঃ জুলুম নির্যাতন শুরু। রজব মাসে আবিসিনিয়াতে ১৬ জন মুসলমানদের প্রথম হিজরত। তারপর ৮৩ জনের হিজরত।

৬১৫খৃ ঃ ৫ম নবুয়াতবর্ষ। আবু জেহেল কর্তৃক সাফা পাহাড়ে ধ্যানরত রাসূলের মাথায় প্রস্তরাঘাত। এতে চাচা হামজা কাবায় প্রবেশ করে আবু জেহেলকে শাস্তি দান ও ইসলাম গ্রহণ।

৬১৬খৃ ঃ ৬ষ্ঠ নবুয়াতবর্ষ। বীর উমর (রা) এর ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ।

৬১৬-৬১৯খৃ ঃ কুরাইশদের সামগ্রিক সামাজিক বয়কট।

৬১৯খৃ ঃ বয়কট অবসানের কিছুদিন পর নবুওয়াতের ১০ম বর্ষে রজব মাসে চাচা আবু তালিব (৮৩) ও রমজান মাসে খাদিজার (৬৫) ইন্তেকাল। শাওয়াল মাসে সাওদা বিনতে যামআকে বিয়ে। আবু যর গিফারীর ইসলাম গ্রহণ। যায়েদ(রা)কে নিয়ে মক্কার ৬০ মাইল দক্ষিণে তায়েফে ইসলাম প্রচারের জন্য গমন এবং নির্মম অত্যাচারের শিকার।

৬২০খৃ ঃ ১১শ নবুয়াত বর্ষের ২৭ রজব ৪র্থ বার বক্ষ বিদীর্ণ। মিরাজে গমন এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরযের বিধান।

৬২০খৃ ঃ ১১শ বর্ষে শাওয়াল মাসে আবু বকরের কন্যা আয়েশা (রা)-কে বিবাহ। হজ্ব মৌসুমে হাজীদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার। মদীনার খাজরাজ গোত্রের ৬ জনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

৬২১খৃ ঃ হজ্ব মৌসুমে ১২জন মদীনাবাসীর আকাবায় ১ম শপথ।

৬২২খৃ ঃ আকাবার ২য় শপথ; ত্রয়োদশ নবুয়াত বর্ষে হজ্বের সময় মদীনার ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা রাতে গোপনে আকাবায় ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের খেদমত করার শপথ এবং হিজরতের আহ্বান। মক্কার সক্ষম সকল মুসলমান দলে দলে মদীনায় গমন। শুধু আলী ও আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে থেকে যান।

www.pathagar.org

পিতামাতা : পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম (৫৪৫খৃ-৫৭০খৃ)। তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবাণীর জন্য পিতার মানতে নির্ধারিত হন এবং ১০০ উটের বিনিময়ে তা থেকে রক্ষা পান। এ জন্যে রাসূল (সা) নিজেকে ইবনুয যাবীহাইন বা দু'যবাইকৃতের সন্তান বলতেন। তিনি রাসূল (সা) জন্মের ৫ মাস পূর্বে মারা যান। মা ছিলেন আমিনা বিনতে ওয়াহাব (৫৪৮খৃ-৫৭৬খৃ)। পিতামাতা উভয়ে হযরত ইসমাইল (আ) এর অধস্তন বংশধর।

দুধপান : জন্মের প্রথম সাতদিন নিজ মাতা আমেনার, তারপর আটদিন আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার, তারপর দু'বছর বনু সাদ গোত্রের হালিমার এবং একদিন বনু সাদ গোত্রের জনৈক মহিলার দুধপান।

দুধ ভাই-বোন : রাসূলুল্লাহ (সা) এর যে সব দুধ ভাই-বোনের পরিচয় পাওয়া যায় তারা হলেন- ১. মাছরুহ, সুয়াইবার ছেলে। ২. হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব : সুয়াইবার দুধপান। ৩. আবু সালমা ইবনে আব্দুল আছাদ মাখযুমি : সুয়াইবার দুধ পান। ৪. আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব : বনুসাদ গোত্রের উক্ত জনৈক মহিলার দুধ পান। এবং হালিমার সন্তানগণ যথাক্রমে ৫. আব্দুল্লাহ। ৬. আনিসা। ৭. হুযাইফা। ৮. শায়মা।

সম্মানিত স্ত্রীগণ : ১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) (৫৫৬-৬১৯খৃ), ২। সাওদা বিনতে যাম'আ (৫৭২-৬৪৩খৃ)। ৩. আয়েশা বিনতে আবি বকর (৬১৩-৬৭৬খৃ)। ৪. হাফসা বিনতে উমর (৬০৪-৬৬৫খৃ)। ৫. জয়নব বিনতে খুযাইমা (৫৯৬-৬৬৫খৃ)। ৬. উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া (৫৯৫-৬৭৭খৃ)। ৭. উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান (৫৯০-৬৬৪খৃ)। ৮. জয়নাব বিনতে জাহাশ (৫৮৫-৬৪০খৃ)। ৯. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (৬০৫-৬৭০খৃ)। ১০. রায়হানা বিনতে শামউন (৫৮৮-৬৩১খৃ)। ১১. মারিয়া কিবতিয়া (৫৯০-৬৩৭খৃ)। ১২. সাফিয়া বিনতে হুয়াই (৫৮৮-৬৭০খৃ)। ১৩. মাইমুনা বিনতে হারিস (৫৮৩-৬৭১খৃ)।

সন্তান-সন্ততি : খাদিজা (রা) এর গর্ভে-১. কাশিম ২. আবদুল্লাহ ৩. জয়নাব ৪. রুকাইয়া ৫. উম্মে কুলসুম ৬. ফাতিমা; মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে- ৭. ইব্রাহীম। একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া সকলেই রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় মারা যান।

রাসূল (সা) এর শারীরিক গঠন : মধ্যম আকৃতি। অত্যান্ত লাবন্যময় চেহারা। মেদহীন শরীর। দুধে আলতা মেশানো রং। মধ্য সিঁথির কানের লতি পর্যন্ত ঢেউ খেলানো বাবরী চুল। অপেক্ষাকৃত বড় মস্তক, প্রসস্ত ললাট। কুচকুচে কালো মণির ও কিঞ্চিৎ রক্তিমাভ সাদা অংশের চোখ, বড় বড় পাতা। উন্নত নাসিকা। সামান্য ফাকা ফাকা রজতশুভ্র দাঁত। দীর্ঘ মাংসল স্কন্ধের মধ্যস্থলে কবুতরের ডিম সদৃশ ঈষৎ লাল রংয়ের 'মোহরে নবুয়াত'। ঘন লম্বা দাড়ি। লম্বাটে হাত ও অঙ্গুলি। ভরাট প্রশস্ত তালু। উন্নত ও প্রশস্ত বক্ষ, বক্ষস্থল থেকে নাভী পর্যন্ত সরু চুলের রেখা। পশমে ভরা শরীর। মসৃণ-নরম চামড়ায় ঘামবিন্দু মুক্তোর মত চমকাত ও সুগন্ধ ছড়াতো। সুগঠিত উরু ও পদদ্বয়। সামান্য ঝুঁকে মাটির দিকে দৃষ্টিনত দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুপুরুষ রাসূল (সা) সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন- 'তাঁর আগে বা পরে কখনো তাঁর মত এমন সুপুরুষ আর দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন নি।'

জাবালুন নূর (আলোকিত পাহাড়)

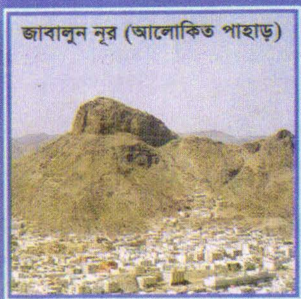

► কাবা থেকে ৩ মাইল দূরে এক নির্জন স্থানে অবস্থিত এ পাহাড় ধারন করেছে হেরা গুহার মত মহিমান্বিত এক গুহাকে। যেখানে অবতীর্ণ হয় রাসূল (সা) এর প্রতি প্রথম ওহী, মানুষের আলোর দিশারী।

► মিরাজ গমনের পথে এখানেই বসে রাসূল (সা) ওজু করেছিলেন। মিরাজ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত'।

-বনী ইসরাঈল : ১

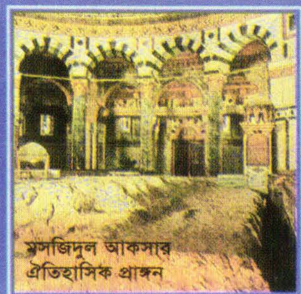

মসজিদুল আকসার ঐতিহাসিক প্রাঙ্গন

চারবার বক্ষ বিদীর্ণ : মোট ৪ বার আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈলকে পাঠিয়েছেন রাসূল (সা) এর বক্ষ বিদীর্ণ করার জন্য। তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর হৃদপিণ্ডের অপবিত্র অংশ ফেলে দিয়ে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে যথাস্থানে স্থাপন করতেন। যেমন- ১ম বার : হালিমার কাছে অবস্থানকালে চারণ ভূমিতে ৪ বছর বয়সে সংগঠিত হয়। তারা এক খণ্ড কাল জমাট রক্ত ফেলে দিয়ে বলেন- এটাই শয়তানী স্বভাব গ্রহণের ও সমস্ত পাপের উৎস। ২য় বার : দশ বছর বয়সে মক্কার এক মরু মাঠে ফেরেশতারা হৃদপিণ্ডের মধ্য হতে জমাট বাধা কিছু রক্ত ফেলে দিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার পদার্থগুলোর পরিবর্তে স্নেহ-ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য কোমল এক পদার্থ রেখে দেন। ৩য় বার : নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বক্ষণে ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায়। এতে তিনি নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হন। ৪র্থ বার : মিরাজের যাওয়ার প্রাক্কালে শেষ বারের মতো জমজম কূপের নিকট বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃদয় ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়।

আবিসিনিয়ায় হিজরত : নবুয়াতের ৪র্থ বছরের মাঝামাঝি মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রাসূল (সা) হযরত উসমান (রা) এর নেতৃত্বে একদল মুসলিমকে ন্যায়পরায়ণ শাসক নাজ্জাশীর শাসনাধীন আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। ২য় পর্যায়ে আরও একদল মুসলিম হিজরত করে। তখন তাদের পিছু নেয় কাফেরদের একটি প্রতিনিধি দল এবং এরা মুসলমানদের ফেরত পাঠানোর জন্য নাজ্জাশীকে অনুরোধ করে। নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা) এর আবেগময়ী বক্তৃতা শুনে তাদের মক্কায় ফেরত না পাঠিয়ে বরং ইসলাম গ্রহণ করেন।

শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী : নবুয়াতের ৭ম বছরে মহানবী (সা) এর সাথে সম্পর্কিত বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে শিয়াবে আবু তালিব নামক স্থানে অবরুদ্ধ করা করা হয় এবং সামাজিক ভাবে বয়কট করা হয়। এর ফলে ৩ বছর ক্ষুধা দারিদ্র মারাত্মক আকার ধারন করে। ক্ষুধার কষ্ট এত মারাত্মক ছিল যে ঘাস, লতাপাতাও কখনো কখনো খেতে হতো। কিন্তু তারপরও রাসূল (সা) তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতেন। ৩ বছর পর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ অবরোধের অবসান ঘটে।

মিরাজ : নবুয়াতের একাদশ বছরের ২৭ রজব মহানবী (সা) স্বশরীরে বোরাক বাহনে করে মসজিদে হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে সেখানে সকল নবীদের নামাজে ইমামতি করেন। তারপর রফরফ মহাকাশযানে মহাকাশের সকল স্তরের সৃষ্টিরহস্য অবলোকন ও উল্লেখযোগ্য নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর মহাকাশের শেষ সীমা 'সিদরাতুল মুনতাহা'র কাছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিময় করেন, যা নামাজে আজও পঠিত হয়। তিনি আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা লাভ এবং নৈতিক ও আদর্শিকভাবে গড়ে উঠার জন্য মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উপহার পান। এ সফরে জান্নাত-জাহান্নাম ও বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিসহ বহু অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করেন।

আকাবার শপথদ্বয় : মক্কার আকাবা নামক স্থানে সংগঠিত শপথদ্বয় ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। যখন রাসূলের (সা) জীবনের চরম সংকট চলছিল, চারদিকে শুধু বিরোধিতা। মক্কার কোথাও দাওয়াত কবুলের কোন স্থান নেই, তায়েফসহ বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত প্রত্যাখান- এমন সময় ইয়াসরেববাসীগণ ইসলামের দিকে এগিয়ে আসেন। এ স্থানে তাদের একদল (৬জন) নবুয়াতের একাদশ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছর ১২ জনের অপর দল ইসলাম গ্রহণ করে বেশকিছু বিষয়ে শপথ নেন, এটি আকাবার ১ম শপথ। ত্রয়োদশ বছরে ৭৫ জন একই স্থানে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা)কে হিজরতের আহ্বান জানান এবং সবধরনের বিপদ-নির্যাতন মাথায় পেতে নিয়ে রাসূল ও ইসলামকে রক্ষার শপথ নেন।

► চারগজ দৈর্ঘ্য ও পৌনে দু'গজ প্রস্থের মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় এ গুহাতেই একদিন কুরআনের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হয়। সেদিন জিব্রাঈল (আ) আল্লাহর এ বাণী নিয়ে আসেন 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন...'। সমাজের শান্তি আনয়ন, সৃষ্টিরহস্য উৎঘাটন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছায় ৩ বছর ধরে এই গুহায় নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্ন থাকার পর তিনি যখন নবুয়াতের গুরু দায়িত্ব পেলেন, তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরলে খাদিজা (রা) তাঁকে সাহস যোগান এবং চাচাত ভাই সুপরিচিত ধর্মীয় পণ্ডিত ওরাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে তাওরাত-ইঞ্জিল কিতাব সূত্রে উদ্ধৃত নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

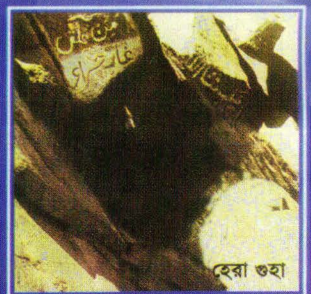

হেরা গুহা

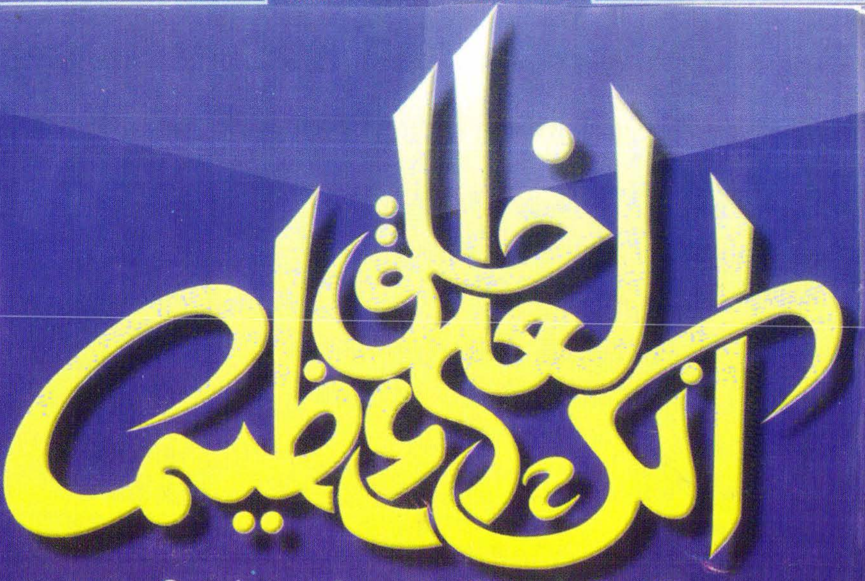

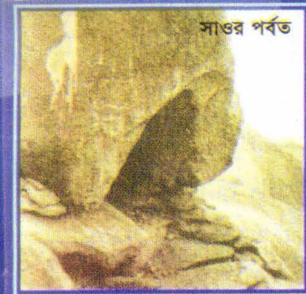

সাওর পর্বত

◄ এ সেই সাওর পর্বতের গুহা, যে গুহা হিজরতের সময় প্রিয় রাসূল (সা)কে তিন দিন নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন- 'আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল এবং যখন গুহার মধ্যে সে দু'জনের একজন ছিল...'। সূরা আততাওবা-৪০

রাসূল (সা) ২ রবিউল আউয়াল (১৪ সেপ্টেম্বর ৬২২খৃ) শনিবার মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে ৩ রাত এ গুহায় অবস্থান করেন। তারপর সোমবার লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে মদীনার দিকে গমন করেন।

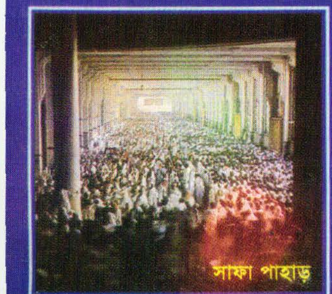

সাফা পাহাড়

◄ একদিন যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মক্কার জনগণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য আহ্বান জানান রাসূল (সা)। তখনই সহসা আল-আমীন, আস-সাদিক ও প্রিয়ভাজন রাসূল (সা) কায়েমী স্বার্থবাদী কুরাইশদের চরম শত্রুতে পরিণত হন। তাঁর আপন চাচা পাপাত্মা আবু লাহাব প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে এই আহ্বানের জবাব দেন। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'ধ্বংস হলো আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে নিজেও।' এটি ছিল ইসলামের প্রথম এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল জনসভা। চিত্রে সাফা থেকে মারওয়ার ভূগর্ভস্থ রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। সূরা আল ক্বালাম : ৪

► হিজরতের সময় কাফেরদের রক্ত চক্ষু এড়িয়ে রাসূল (সা) কৌশলগত এ পথ ধরে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। শত চেষ্টা করেও এবং প্রলোভিত পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েও তারা রাসূলকে কোনভাবেই আটকাতে সক্ষম হয় নি।

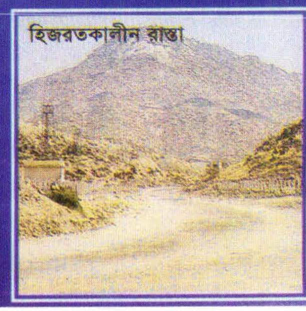

হিজরতকালীন রাস্তা

www.pathagar.org

Calendar 2001

সীরাতে রাসূল (সা) মদীনা অধ্যায়

জীবনপঞ্জি ঃ মদীনার গৌরবময় সময়

৬২২খৃ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ১ম হিজরী ৮ রবিউল আউয়াল– মহানবী (সা) কুবায় পৌঁছেন। প্রথম মসজিদ নির্মাণ। ৫ অক্টোবর ২৩ রবিউল আউয়াল– বানু সালিম গোত্রে সর্বপ্রথম জুমআর নামাজ আদায় করেন। তারপর মদীনায় আগমন; বিপুল সম্বর্ধনা।

৬২৩খৃ ঃ এপ্রিল, ১ম হিজরী শাওয়াল– মসজিদে নববী নির্মাণ সম্পন্ন। সাত মাস আবু আউয়ুব আনসারী (রা) এর বাসভবনে অবস্থান করে মসজিদ সংলগ্ন স্বীয় নবনির্মিত বাসভবনে অবস্থান শুরু।

৬২৩খৃ ঃ আগষ্ট, ২য় হিজরী সফর– মদীনার ২০০ মাইল দূরে আবওয়া নামক স্থানে বানু দুমরার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।

৬২৩খৃ ঃ ডিসেম্বর, ২য় হিজরী জমাদিউস সানি– মদীনার ৯০ মাইল দূরে বানু মুদলিজের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।

৬২৪খৃ ঃ জানুয়ারী, ২য় হিজরী রজব– বিখ্যাত মদীনার সনদ রচনা এবং সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের সম্মতি ও স্বাক্ষর।

৬২৪খৃ ঃ ফেব্রুয়ারী, ২য় হিজরী শাবান– মসজিদুল আকসার পরিবর্তে কাবার দিকে কিবলার পরিবর্তন। নামাজে আযানের প্রবর্তন।

৬২৪খৃ ঃ ১৩ মার্চ, ২য় হিজরী ১৭ রমজান– ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে কুরাইশদের চরমভাবে পরাজয়বরণ।

৬২৪খৃ ঃ ২৬ এপ্রিল, ২য় হিজরী জিলকদ– ইহুদী গোত্র বানু কাইনুকাকে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ১৫ দিন অবরোধ শেষে বহিস্কার।

৬২৫খৃ ঃ ২৩ মার্চ, ৩য় হিজরী ৭ শাওয়াল– উহুদ যুদ্ধ।

৬২৫খৃ ঃ ২৪ মার্চ, ৩য় হিজরী ৮ শাওয়াল– যুদ্ধ ফিরতা কুরাইশ বাহিনীর পুনঃআক্রমণ রোধ করতে মুসলিম বাহিনীর হামরাউল আছাদ পর্যন্ত অগ্রসর, এতে ভীত হয়ে রওহা থেকে কাফেরদের পলায়ন।

৯ মসজিদে যুল হুলায়ফা

৬২৫খৃ ঃ আগষ্ট, ৪র্থ হিজরী রবি.আউয়াল– রাসূল (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র ও সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে ১৫ দিন অবরোধের পর ইহুদী বানু নাদীরকে মদীনা থেকে চিরতরে বহিস্কার।

৬২৬খৃ ঃ জানুয়ারী, ৪ হিজরী শাবান– আবু সুফিয়ানের পূর্বের চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী বদর প্রান্তে মহানবী (সা) মোকাবেলার জন্য পৌঁছালেও, মক্কা থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবু সুফিয়ানের ভীত-

মসজিদে জোরানার পার্শ্ববর্তী একটি কূপ। হুনাইনের যুদ্ধের সময় কাফেলা চরম পানির সংকটে পড়ে। কিন্তু এ কূপের পানি লবনাক্ত হওয়ায় পানের উপযুক্ত ছিল না। তখন মহানবী (সা) এক কুলি পানি নিক্ষেপ করলে এর পানি মিষ্টি হয়ে যায়। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কূপের পানি মিষ্টি আছে। মদীনার কয়েকটি ঐতিহাসিক কূপ হচ্ছে– বুধাই কূপ: এ কূপ থেকে রাসূল (সা) খাবারের পানি নিতেন; হা কূপ: মসজিদে নববীর সন্নিকটে এ কূপের পানিও রাসূল (সা) ব্যবহার করতেন; আল বা'শাহ কূপ; খাতাম কূপ: হযরত উসমানের খেলাফতকালে তিনি মহানবীর (সা) আংটি যে কূপে হারিয়ে ফেলেন। ৮

৮ জোরানার কূপ

যে স্থান থেকে হজ্জ বা ওমরাকারীগণ ইহরাম বাঁধেন তাকে মিকাত বলে। এ রকম মিকাতের সংখ্যা ৭টি। মদীনাবাসী এবং এ পথে আগমনকারীদের জন্য মিকাত হলো যুল হুলায়ফা। এটি মসজিদে নববী হতে ১৪ কিমি পশ্চিমে একটি উপত্যকা। নবী করীম (সা) এখানে এসে গাছের ছায়ায় নেমে দুই রাকাত নামায আদায় করে ইহরাম বাঁধতেন। পরে এখানে মসজিদুশ শাজারা বা মসজিদ যুল হুলায়ফা নামে একটি মসজিদ তৈরী করা হয়। ৯

হিজরতের সময় কুবা হতে মদীনায় প্রবেশ পথে যেখানে দাঁড়িয়ে মদীনার সর্বস্তরের জনগণ মহানবী (সা)কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তারা গাইতে থাকেন 'তালায়াল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদা...' যে গানে তাদের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঝরে পড়ে। দুঃখভারাক্রান্ত নবীহৃদয় সহসা যেন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। পৃথিবীর সর্বাধিক গীত এ বিখ্যাত গানের কলি 'সানিয়াতুল বিদা' থেকে স্থানটির নামকরণ করা হয়। এটি মদীনার প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত। ৩

৩ সানিয়াতুল বিদা

কুবা থেকে মদীনার পথে যখন জুমুয়ার নামাজের সময় হয়, তখন মহানবী (সা) বনী সালেম বিন আউফ গোত্রের এক উন্মুক্ত ময়দানে ১০০ জন মুসল্লি নিয়ে প্রথম জুমুয়ার নামাজ পড়েন। পরবর্তীতে এ স্থানটি একটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়। এটি মসজিদে কুবা থেকে ৯০০ মিঃ দূরে অবস্থিত। ২

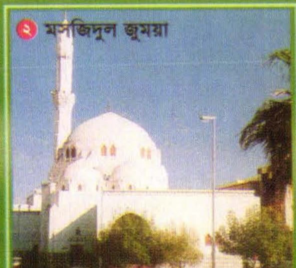

২ মসজিদুল জুমুয়া

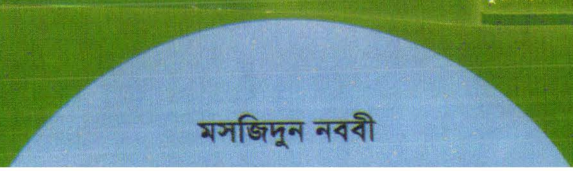

মসজিদুন নববী

সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা দুমাতুল জান্দাল– যেখানকার বেদুইন গোত্রগুলো মুসলিম কাফেলার উপর প্রায়ই লুট-তরাজ করতো। তাই রাসূল (সা) এদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ১০০০ সাহাবী নিয়ে অভিযানে বের হন। রাসূল (সা) আগমনের সংবাদ শুনে এরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) এখানে একটি চমৎকার মসজিদ তৈরী করেন, যার কাঠামো এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে এটি সৌদি আরবের আল-জওফ প্রদেশের অন্তর্গত। ৭

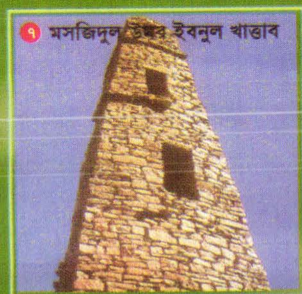

৭ মসজিদুল উমর ইবনুল খাত্তাব

রাসূল (সা) এর আগমন সংবাদে মদীনাবাসীর আনন্দের সীমা নেই। প্রতিদিন ভোরে দলে দলে নারী-পুরুষরা ৩ মাইল দূরে কুবা পল্লীর হাররা নামক স্থানে জড়ো হতো এবং হতাশ হয়ে ফিরে যেত। যথারীতি একদিন সবাই ফিরে গেলে এক ইহুদী দুর্গ প্রাচীরে উঠে বহুদূরে ধূলি উড়তে দেখে চিৎকার দিয়ে মহানবী (সা) এর আগমন সংবাদ জানায়। সাথে সাথে চতুর্দিক মুহুর্মুহ আনন্দ শ্লোগানে ভরে উঠে। মহানবী (সা) আমর বিন আওফের গোত্রপতি কুলসুম বিন হাদামের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৪ দিন অবস্থানকালে তিনি কুলসুম (রা) এর দেয়া জমিতে মসজিদুল কুবা তৈরী করেন– যা ছিল মুসলিমদের প্রথম মসজিদ। ১

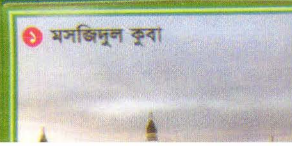

১ মসজিদুল কুবা

ইসলামের চরম দুশমন ইহুদী নেতা কাব বিন আশরাফের ভগ্ন প্রাসাদ। সে মদীনার সনদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিভিন্ন ধরনের উস্কানীমূলক কাজ করত, মুসলিম নারীদের নিয়ে কুৎসা রচনা করত। বারবার সতর্ক করার পরও প্রতিনিয়ত ইসলাম, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলত, উস্কানিমূলক কবিতা লিখত, তথা সন্ত্রাস চালাতো। এভাবে সামাজিক শৃংখলা চরমভাবে লংঘিত হতে থাকে। বদর যুদ্ধের পর কুরাইশদের মনোবল চাঙ্গা করতে সে মক্কায় যায় এবং শেষ পর্যন্ত উহুদ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তাই রাসূল (সা) তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন এবং ৩য় হিজরীর প্রথম দিকে তা কার্যকর হয়। ৬

রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের বুনিয়াদ–মদীনার সনদ ঃ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে রচিত এ সনদ পৃথিবীর ১ম লিখিত সংবিধান। এটি দু অংশে বিভক্ত। ১ম অংশে ২৩টি ধারা–মুসলমানদের আভ্যন্তরিণ সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্যের বর্ণনা। ২য় অংশে ২৪টি ধারা– মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য মদীনাবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে স্পষ্ট বিধান বর্ণনা। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা হয়। এ সনদকে আধুনিক গবেষকগণ 'The first written constitution in the world' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সীমানা ঃ মহানবী (সা) এর ওফাতকালে সিরিয়া সীমান্ত থেকে এডেন এবং জেদ্দা থেকে ইরান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র আরব মুসলিম দেশে পরিণত হয়।

প্রদেশ ও প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ ঃ ১। মদীনা: রাসূল (সা) স্বয়ং, ২। মক্কা: ইত্তাব ইবন উসাইদ, ৩। নাজরান: ক) আমর ইবন হাজাম খ) আলী ইবন আবি তালিব গ) আবু সুফিয়ান, ৪। ইয়ামেন: বাযান ইবন সামান, ৫। হাজরা মাউত: যিয়াদ ইবন লবীদ, ৬। আম্মান: আমর ইবনুল আস, ৭। বাহরাইন: আলী ইবন হাযরাম, ৮। তাইমা: ইয়াজিদ, ৯। জুন্দে আলজানাদ: মুয়াজ ইবন জাবাল (রা)। এদের প্রধানকে ওয়ালী বলা হতো। এছাড়াও ২২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল, যার প্রধানকে আমিল বলা হতো।

প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য রাসূল (সা) যে সব কাজ নিজে আঞ্জাম দিতেন– (১) প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ (২) মুয়াযযিন নির্বাচন (৩) ইমাম নির্ধারণ (৪) যাকাত আদায়কারী নিয়োগ (৫) যিযিয়া আদায়কারী নিয়োগ (৬) ভিন্ন ধর্মের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর (৭) মুসলমানদের মধ্যে জমি বণ্টন (৮) সেনাপতি নিয়োগ (৯) মামলা মোকদ্দমা ফায়সালা করা (১০) গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা (১১) বেতন নির্ধারণ করা (১২) ফরমান জারী করা (১৩) নও মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা (১৪) ফতোয়াদান (১৫) অপরাধীর শাস্তি বিধান জারী (১৬) রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান (১৭) কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ও উন্নয়ন (১৮) গভর্ণর ও ওয়ালী নিয়োগ।

৬ কাব বিন আশরাফের ভগ্ন প্রাসাদ

বিভাগ সমূহ ঃ (১) রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ (২) সীলমোহর বিভাগ (৩) অহী লিখন বিভাগ (৪)

www.pathagar.org

মদীনার ২০০ মাইল দূরে রাসূল (সা) মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান। ইফকের ঘটনা। পর্দার বিধান অবতীর্ণ।
৬২৭খৃ ঃ মার্চ, ৫ হিজরী শাওয়াল– খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ। ইহুদী, কুরাইশ ও বেদুইন ত্রিশক্তির সম্মিলিত বাহিনীর মাসব্যাপী মদীনা অবরোধ। কিন্তু আভ্যন্তরিন অনৈক্য ও প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়ে তাদের পলায়ন।
৬২৭খৃ ঃ এপ্রিল, ৫ হিজরী জিলক্বদ– খন্দক যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইহুদী গোত্র বানু কায়নুকার ২৫ দিন অবরোধের পর আত্মসমর্পন, পুরুষ যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান।
৬২৭খৃ ঃ ৬ হিজরী– খৃষ্টানদের সাথে সন্ধি।
৬২৮খৃ ঃ মার্চ, ৬ হিজরী শাওয়াল– ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি। যাকে পরবর্তী বিজয়ের দ্বার বলা হয়। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ।
৬২৮খৃ ঃ মে, ৭ হিজরী মহররম– খাইবার অভিযান ও বিজয়।
৬২৯খৃ ঃ মার্চ, ৭ হিজরী শাওয়াল– ২০০ সাহাবী নিয়ে উমরা হজ্জ পালন।

এবং ঈদুল আযহার নামাজের স্থান'। পরবর্তীতে সেখানে কয়েকটি মসজিদ তৈরী হয়। মসজিদে গুমামা তন্মধ্যে প্রধান। ৪

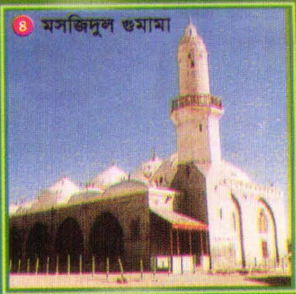
৪ মসজিদুল গুমামা

১০ মহানবী (সা) এর চিঠি

এটি মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাতলা চামড়ার উপর লেখা একটি চিঠি। হুদাইবিয়া সন্ধি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল (সা) বিভিন্ন দেশের শাসন কর্তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মোট ২০০ থেকে ২৫০ টির মতো চিঠি লেখেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাসকগণ হলেন– (১) রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস (২) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ (৩) আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী (৪) মিশরের মুকাওকিস (৫) ইয়ামামার হাওদা বিন আলী ও সুনামা (৬) বোলকার হারিস গাসসানী (৭) ওমানের জীফার ও আবদুল্লাহ (৮) বাহরাইনের মুনযির ইবন সাওয়ার (৯) ইয়ামেনের হারিছ বিন আবদে কিলাব। ১০

৬২৯খৃ ঃ সেপ্টেম্বর, ৮ হিজরী জমা.আউয়াল– মুতার যুদ্ধে লক্ষাধিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩ হাজার মুসলমানের ৩ দিন যুদ্ধের পর বিজয়। যুদ্ধে বীরত্বের কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ উপাধি প্রদান।
৬৩০খৃ ঃ ১৫ জানুয়ারী, ৮ হিজরী ২১ রমজান– দশ হাজার সাহাবী নিয়ে ১০ রমজানে মক্কাভিযানে যাত্রা এবং রক্তপাতহীনভাবে ২১ রমজানে মক্কা বিজয়। এটি ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা।
৬৩০খৃ ঃ ২৭ জানুয়ারী, ৮ হিজরী ৬ শাওয়াল– হুনাইনের যুদ্ধে বিজয়।
৬৩০খৃ ঃ মার্চ, ৮ যিলক্বদ– তায়েফ বিজয়। শত্রুদের ইসলাম গ্রহণ।
৬৩০খৃ ঃ নভেম্বর, ৯ হিজরী রজব– ৪০ হাজার সাহাবী নিয়ে তাবুক অভিযান। রোমান সম্রাট লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়েও ফিরে যায়।
৬৩০-৬৩১খৃ ঃ ৯হিজরী– প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর। ওমান, হাজরা মাউত, নাজরান, মাহরাহ, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধি মদীনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।
৬৩২খৃ ঃ ৩ ফেব্রুয়ারী, ১০ হিজরী ২৫ যিলক্বদ– ১,১৪,০০০ সাহাবীসহ মক্কায় হজ্জে গমন এবং ৯ যিলহজ্জ/৮ মার্চ আরাফাতে বিদায় হজ্জের ভাষণ।
৬৩২খৃ ঃ ২৮ মে, ১১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার– দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণে মহানবী (সা) এর ইন্তেকাল এবং আয়েশা (রা) ঘরে যেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন সেখানেই সমাহিত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সবচেয়ে প্রিয় স্থান, সর্বশেষ বিশ্রাম স্থল, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান কার্যালয় হলো এই মহান মসজিদ। ইবাদতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মাত্র তিনটি স্থান ভ্রমণ বৈধ, তন্মধ্যে একটি মহানবী (সা) এ মসজিদ তৈরী করেন। তাঁর ক্বাসওয়া নামক উটের মাধ্যমে নির্ধারিত এ স্থানটি নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল নামক দু ইয়াতীম বালকের পতিত জমি। তারা এ জমি দান করতে চাইলেও রাসূলুল্লাহ (সা) দশ দিনার মূল্যে তা ক্রয় করেন। রাসূলুল্লাহ নিজেই মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন।

পাথর ও চুন দিয়ে গাঁথা তিন হাত গভীর ভিত্তির উপরে খেজুর গাছের খুটি ও কাঁচা ইটের দেয়াল এবং মাটির প্রলেপ দেয়া খেজুর পাতার ছাদ দিয়ে মসজিদটি নির্মিত। এখানে বসেই শাসন করতেন। ১ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এ মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। রাসূল (সা) ৭ম হিজরীতে মসজিদটিকে ২৪৭৫ বর্গ মিটার এবং হযরত উমর, উসমান (রা), আঃ মালিক সহ অন্যরা মোট ৯বার সম্প্রসারণ করেন। সর্বশেষে বাদশা ফাহাদ ৮২ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেন।

২য় হিজরীর শাবান মাসে রাসূল (সা) বনী সালামা গোত্রের এ মসজিদে জোহর মতান্তরে আছর নামাজের ৩য় রাকাতে অবস্থানকালে ক্বিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূল (সা) বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মসজিদুল হারামের দিকে (উত্তর থেকে দক্ষিণে) ক্বিবলা পরিবর্তন করেন। এ জন্য মসজিদটিকে দুই কেবলার মসজিদ বা মসজিদুল ক্বিবলাতাইন বলে। ৫

৫ মসজিদুল ক্বিবলাতাইন

বিভাগ (১৩) যাকাত ও সাদকাহ বিভাগ (১৪) জনস্বাস্থ্য বিভাগ (১৫) শিক্ষা বিভাগ (১৬) পরিসংখ্যান বিভাগ (১৭) কৃষি ও বন বিভাগ (১৮) নগর প্রশাসন বিভাগ (১৯) স্থানীয় সরকার বিভাগ।

মদীনার ভারপ্রাপ্ত আমীরগণ ঃ রাসূল (সা) অনেক সময় মদীনার বাইরে বিভিন্ন অভিযান বা সফরের কারণে অবস্থান করতেন, তখন মদীনায় একজনকে দায়িত্বশীল নিয়োগ করে যেতেন। আমরা যাদের পরিচয় পেয়েছি– ১। সা'দ ইবনে উবাইদা: গাজওয়ায়ে আবওয়া (২য় হি) ২। সা'দ ইবনে মায়াজ: গাজওয়ায়ে বুয়াত (২য় হি) ৩। যায়েদ ইবনে হারিসা: গাজওয়ায় সাফওয়ান (২য় হি), বনি মুস্তালিক– ২বার ৪। আবু সালমা আল মাখযুমি: যিল উশাইরা (২য় হি) ৫। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম: বদর (২য় হি), উহুদ (৩য় হি), হামরাউল আসাদ (৩য় হি), হুদাবিয়া (৬ষ্ঠ হি), যি-কারাদ–৫ বার ৬। আবু লুবাবা: বদর, বনু কাইনুকা, সাভিক (২য় হি)– ৪বার ৭। উসমান: যি আমর ৮। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা: ২য় বদর ৯। ছাক ইবনে আরাফাতা গিফারী: খায়বর যুদ্ধ (৭ম হি) ১০। আবু জার জিফারী: জাতুররিকা যুদ্ধ ১১। আবু রাহোম গিফারী: মক্কা বিজয় ১২। মুহাম্মদ ইবনে মুসাইলামা (রা): তাবুক।

এ সেই মক্কার ঐতিহাসিক প্রান্তর যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন। আশে পাশের পাহাড়, মাঠ, প্রান্তর, উপত্যকা উপচে পড়া লক্ষাধিক মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বক্তব্য পেশ করেন। দশম হিজরীর ৯ জিলহজ্জের এ ভাষণে তিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করে নারী, কৃতদাস, শ্রমিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়সহ সকল দুর্বল শ্রেণীর অধিকার রক্ষা এবং সবধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ নির্মূলের আহবান জানান। এর পরপরই রিসালাতকে পূর্ণতা দান করে মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন– 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'। সূরা আল মায়িদা: ৩। ১১

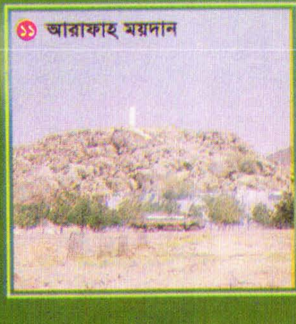
১১ আরাফাহ ময়দান

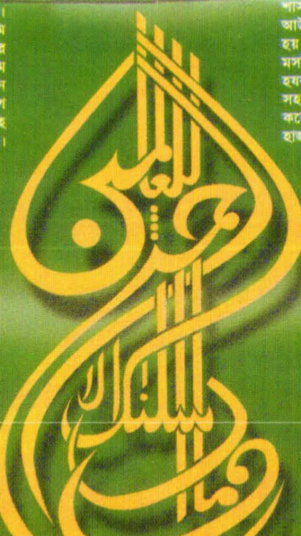

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।
সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭

এখানে শায়িত আছেন পৃথিবীর স... পরিপূর্ণ রূপ হযরত মুহাম্মদ (সা)। মৃত্যুকালেও তার সর্বশেষ বাণী ছিল 'নামাজ, নামাজ; তোমাদের অধিনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান'। তারপর তিনি 'হে আল্লাহ, হে আমার পরম বন্ধু' বলতে বলতে হযরত আয়েশা (রা) এর কামরায় ইন্তেকাল করেন। এ কামরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় কেউ ইমাম হননি, দশ জন করে সাহাবী হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে নামাজ পড়েন। এ রওজার পাশেই শায়িত আছেন হযরত আবু বকর ও উমর (রা)। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে সুড়ঙ্গ পথে রাসূলুল্লাহর লাশ অপহরণের খৃষ্টানদের প্রচেষ্টা সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে নস্যাৎ করেন। তখন তিনি রওজার চারপাশে পানির স্তর পর্যন্ত গভীর করে ধাতুর চালাইকৃত মজবুত দেয়াল তৈরী করেন এবং সমগ্র মদীনায় নিরাপত্তামূলক প্রাচীর নির্মাণ করেন। ১২

১২ রওজা মুবারক

রাসূল (সা) এর কাছে অসংখ্যবার জিব্রাঈল (আ) ওহী নিয়ে আগমন করেন। ২৩ বছরে ১১৪ সূরায় মোট ৬৬৬৬টি আয়াত নাজিল হয়। দু'ধরনের ওহী নিয়ে আসতেন। প্রথমত সরাসরি আল্লাহর বাণী যা কুরআন হিসাবে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয়ত: যার ভাব ছিল আল্লাহর কিন্তু বক্তব্য এবং ভাষা ছিল রাসূলের।

১৩ জান্নাতুল বাকী

মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এ কবরস্থানে শায়িত আছেন রাসূলের (সা) প্রাণপ্রতীম দুহিতা ফাতেমা, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়া, জায়নাব (রা), আয়েশাসহ পবিত্র সহধর্মিনীগণ, ইমাম হাসান, দুধ মা হালিমা, ৩য় খলিফা উসমানসহ প্রায় দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রা), ইমাম মালেক, জয়নুল আবেদীন, জাফর সাদিকের মত রাসূলের (সা) যুগশ্রেষ্ঠ অনুসারীগণ। ১৩

ওহী লেখকবৃন্দ: (১) যায়েদ বিন ছাবিত (২) আবু বকর (৩) ওমর (৪) ওসমান (৫) আলী (৬) আমের বিন ফাহিরা (৭) আমর ইবনুল আস (৮) উবাই বিন কাব (৯) আবদুল্লাহ বিন আরকাম (১০) ছাবিত বিন কায়েস (১১) হানযালা বিন রবী আজলী (১২) মুগীরা বিন শোবা (১৩) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (১৪) খালিদ বিন ওলীদ (১৫) খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (১৬) যুবায়ের (১৭) মুয়াবিয়া (রা)। বিভিন্ন সময় প্রায় ৪০ জন সাহাবী ওহী লিপিবদ্ধ করেন।

www.pathagar.org

সীরাতে রাসূল (সা) জিহাদ অধ্যায়

calendar 2001

রাসূলুল্লাহর (সা) অভিযান ও যুদ্ধসমূহ

যে সব অভিযানে রাসূল (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেন (যুদ্ধ হোক বা না হোক) তাকে গাযওয়া বলে এবং যে সব অভিযানে (যুদ্ধ হোক বা না হোক) তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি, বরং অন্য কোন সাহাবী নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন তাকে ছারিয়া বলে।

রাসূল (সা) এর গাযওয়াসমূহ

ছারিয়া অভিযানের অধিনায়কগণ

সর্বপ্রথম অভিযান প্রেরণ করা হয় হযরত হামযা (রা) এর নেতৃত্বে ১ম হিজরীর রমজান মাসে এবং সর্বশেষ অভিযান প্রেরিত হয় রাসূল (সা) অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে একাদশ হিজরীর রবিউল সানিতে। রাসূল (সা) মোট ৭৪টি অভিযান ৪০ জন সেনানায়কের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে যায়েদ বিন হারিসা ৯ বার, গালিব বিন আবদুল্লাহ ৩ গালিব বিন ওয়ালিদ ৫ বার, মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও আলী বিন আবু তালিব ৩ বার করে নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য বিখ্যাত অধিনায়কগণ হলেন আমর বিন আউফ, আমর ইবনুল আস, উসামা বিন যায়েদ, আলকামা, খালিদ বিন সাঈদ, আবু উবায়দা, বশীর ইবনে সা'দ।

রাসূলুল্লাহর (সা) জিহাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ

উহুদ

পাহাড়ের এ অংশ থেকে তীরন্দাজগণ স্থান ত্যাগ করায় উহুদ যুদ্ধে দৃশ্যত মুসলমানদের পরাজয় হয়। সাথে শহীদদের কবর ও মসজিদ দেখা যাচ্ছে।

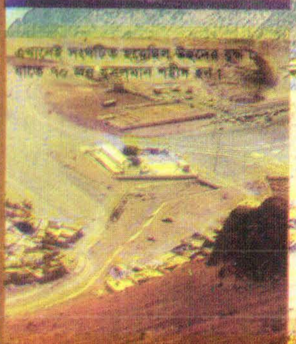

এখানেই সংঘটিত হয়েছিল উহুদের যুদ্ধ যাতে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন।

উহুদ পাহাড়

উহুদের যুদ্ধ : মদীনার ৫ মাইল উত্তরে উহুদ উপত্যকায় ৬২৫খৃ ২৩ মার্চ/৩ হিজরী ৭ শাওয়াল- বদর যুদ্ধে পরাজয় ও অবমাননা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়। তখন রাসূল (সা) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। প্রথমে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও পরবর্তীতে কৌশলগত স্থান ত্যাগ করার কারণে সাময়িক বিপর্যয় ঘটে। তবে যুদ্ধটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এতে ৭০ জন মুসলমান শহীদ এবং ৩৭ জন কাফের নিহত হয়।

এ গুহায় রাসূল (সা) আহত হয়ে অবস্থান নেন

খন্দক

মসজিদে সালমান ফারসী

খন্দক যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানে যে ৫টি মসজিদ (মসজিদুল ফাতহ, সালমান ফারসী, উমর, ফাতিমা, আলী) তৈরি হয়,সেগুলি দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.org

...লক্ষ রোমান বাহিনী মুসলমানদের বিপরীতে যুদ্ধ করে। প্রথম তিন দিন যুদ্ধে মুসলমানদের পরপর তিন সেনাপতি শহীদ হলে তাৎক্ষণিক ভাবে নির্বাচিত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের চমৎকার রণকৌশলে মুসলমানরা এ অসম যুদ্ধে জয়লাভ করে। বিস্ময়কর বীরত্বের কারণে রাসুল (সা) খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

মক্কা বিজয় ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ ও প্রত্যাখান করলে ৮ম হিজরীর ১০ রমজান ১০ হাজার সাহাবী নিয়ে মহানবী (সা) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রক্তপাত এড়াতে গোপনীয়তার সাথে ২১ রমজান মক্কার উপকণ্ঠে উপনীত হলে কুরাইশরা হতবিহ্বল হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ২১ বছরের নির্যাতন-নিষ্পেষণের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েও রাসুল (সা) সবাইকে ক্ষমা করে দেন, এতে কাফেররা অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদিনই কাবায় রক্ষিত সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করা হয়। বিনা রক্তপাতে মক্কা মুসলমানদের নিকট বিজিত হয়।

হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ ঃ কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে মক্কার নিকটবর্তী হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। কাল বিলম্ব না করে রাসুল (সা) ১২ হাজার মুজাহিদ নিয়ে ৮ম হিজরীর ১০ শাওয়াল হুনাইনের দিকে অগ্রসর হন। শত্রুর আক্রমণে পর্বতশীর্ষ মুসলমানদের প্রাথমিক বিপর্যয় দেখা দিলেও রাসুল (সা) এর দৃঢ় নেতৃত্বে পাল্টা আক্রমণ করলে তাদের পরাজয় ঘটে। এতে ৬ হাজার লোক বন্দী এবং বাকিরা তায়েফে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী সেখানেও অগ্রসর হলে এরা দুর্গে আশ্রয় নেয়। দীর্ঘ এক মাস অবরোধের পর তা প্রত্যাহার করে। পরবর্তীতে এদের একদল মুসলমান হয়ে যুদ্ধ বন্দীদের ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করলে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরের বছর এদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।

তাবুক যুদ্ধ ঃ তৎকালীন পরাশক্তি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নবউত্থিত ইসলামী শক্তিকে অংকুরেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য সিরিয়া সীমান্তবর্তী আরব গোত্রসমূহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দিয়ে নিজেই ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়। পূর্বেই সংবাদ পেয়ে রাসুল (সা) ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম, খাদ্যাভাব এবং বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মত প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব। রাসুল (সা) এর আহ্বানে সাহাবীদের নজীরবিহীন সহযোগিতা ছিল ইতিহাস খ্যাত; তারপরও তা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এ অবস্থায় রাসুল (সা) ৩০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে মাদায়েনে সালেহ এলাকার তাবুকে ঘাটি স্থাপন করেন। পূর্বের কথা ও ধারণার চেয়ে বিশাল বাহিনী এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসুলকে উপস্থিত দেখে রোমান বাহিনী ভীত হয়ে পিছুটান দেয়। ফলে আশে পাশের সকল আরব গোত্র মুসলিম আধিপত্য মেনে নিয়ে অধিকাংশই মুসলিম হয়, বাকিরা জিজিয়া দেয়া শুরু করে।

মসজিদুল ফাতহ ঃ যেখানে সম্মিলিত বাহিনী বিপক্ষের জন্য দোয়া করেছিলেন রাসুল (সা)। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন।

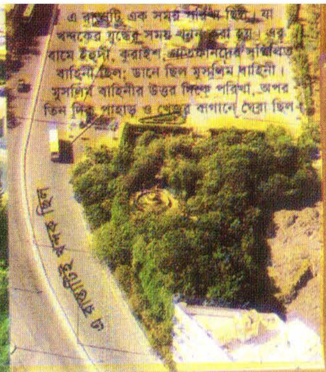
এ রাস্তাটি এক সময় পরিখা ছিল। যা খন্দকের যুদ্ধের সময় খনন করা হয়। এর বামে ইহুদী, কুরাইশ, গাতফানিদের সম্মিলিত বাহিনী ছিল; ডানে ছিল মুসলিম বাহিনী। মুসলিম বাহিনীর উত্তর দিকে পরিখা, অপর তিন দিক পাহাড় ও খেজুর বাগানে ঘেরা ছিল।

বদর

বদর মসজিদ

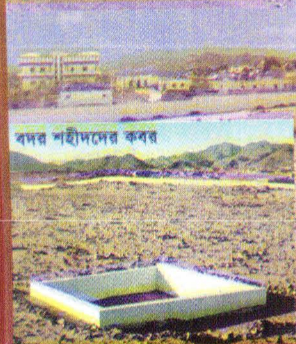
বদর শহীদদের কবর

বদর যুদ্ধ ঃ ২য় হিজরীর ১৭ রমজান, ৬২৪খৃ ফেব্রুয়ারি; মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে; মুসলিম সৈন্য: ৩১৩জন (৮৩ মুহাজির, ২৩০ আনসার তন্মধ্যে ৭০ খাজরাজ, ৬১ আওস গোত্রের), কুরাইশ সৈন্য: ১০০০ জন (৭০০ উষ্ট্রারোহী, ৩০০ অশ্বারোহী); ঘটনা: আবু সুফিয়ানের কাফেলা আক্রান্তের মিথ্যা অপপ্রচারে উত্তেজিত হয়ে আবু জেহেল ১০০০ সৈন্য নিয়ে বদর প্রান্তে অবস্থান করলে মুসলিম বাহিনীও অগ্রসর হয়; পতাকা বহন করেন মুসআব ইবনে উমাইর আবদী (রা)। আনসারদের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ইবনে মা'য (রা)। মুহাজিরদের নেতৃত্বে ছিলেন আলী (রা)। ফলাফলঃ কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়। আবু জেহেল, উকবা, শাইবা, উমাইয়াসহ তাদের ৭০ জন নিহত, ৭০ জন বন্দী হয়। ১৪ জন মুসলিম শহীদ হন (৬ মুহাজির, ৮ আনসার)।

বদর ময়দান ও পাহাড়

নাম লিপিবদ্ধ বদর শহীদদের স্মৃতিসৌধ। বদর কূপকে ঘিরে এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। এ কূপের নামানুসারে স্থানটির নাম বদর। স্মৃতিসৌধের শীর্ষে কূপটির মুখ দেখা যাচ্ছে।

অন্তর্ভুক্ত হলো তখন পরাজিত গোত্র জিজিয়ার বিনিময়ে স্বীয় ধর্মে থাকার অধিকার লাভের চুক্তি করত।

লুটতরাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করা। • যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ গরীবের জন্য রক্ষিত থাকতো। • যুদ্ধ ছিল শুধু আত্মরক্ষার্থে। প্রথম আক্রমণ ছিল নিষিদ্ধ। • যুদ্ধ হতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য। আল্লাহর মহত্ব প্রকাশের জন্য আল্লাহু আকবর ছাড়া আর কোন রণ হুংকার নিষিদ্ধ ছিল। বিপরীত পক্ষে ভয়ে দুর্বল অসহায় লোক ও অসামরিক লোকদের উপর আঘাত এবং পরিবেশ-প্রতিবেশের জন্য হুমকী এমন ধ্বংসাত্মক কাজ নিষিদ্ধ ছিল। • দূতকে হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। আত্মসমর্পণ করলে শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হতো। • যুদ্ধ চলাকালীন সময় শান্তি প্রস্তাব আসলে তা গ্রহণ করা হতো চুক্তি ভঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল। • যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত শত্রুদের কবর দেয়া এবং তাদের অঙ্গহানী ও অসম্মান নিষিদ্ধ ছিল। • যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হতো।

রাসুল (সা) এর ব্যবহৃত যুদ্ধোপকরণ ঃ ৯টি তরবারি, তন্মধ্যে জুলফিকার ছিল বিখ্যাত, যা পরবর্তীকালে আলী (রা) ব্যবহার করতেন। ৭টি বর্ম। ৬টি বর্শা। রুপায় বাঁধানো ১টি কোমরবন্দ। ৩টি ঢাল। ৫টি নেযা। ২টি শিরস্ত্রাণ। ৩টি লাঠি, তন্মধ্যে বিখ্যাত মামদুহ লাঠিটি চার খলিফাই ব্যবহার করেছেন। ৭টি ঘোড়ার নাম জানা যায়। ৪৫টি উট।

গুপ্তচর (উয়ুন) ঃ মহানবী (সা) প্রায় সকল অভিযানেই গুপ্তচরদের কাজে লাগিয়েছেন। তারা শত্রুদের সামরিক ও সংখ্যাগত শক্তি, তাদের কার্যব্যবস্থা, পরিকল্পনা, গমন পথ, ঘটনাস্থলের মানচিত্র প্রণয়নসহ শত্রু বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করত। যতদূর জানা যায় বদরযুদ্ধে প্রথম গুপ্তচর ব্যবহার করা হয়। বদর যুদ্ধে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, সাঈদ বিন যায়েদ, জুহায়নাহ, আদী, আম্মার বিন ইয়াসির, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ; উহুদ যুদ্ধে আনাস, মুনযী, হুবাব ইবনুল মুনযির, আলী বিন আবি তালিব, খন্দক যুদ্ধে খাওয়াত ইবন যুবায়ের, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, হুযায়ফা ইবন ইয়ামান; হুদায়বিয়ার সন্ধিতে বুসর ইবন সুফিয়ান; হুনাইনের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন আবী হাদরাদুল আসলামীসহ বিভিন্ন অভিযানের ১৬ জন গুপ্তচরের নাম জানা যায়।

পথ প্রদর্শক (দালীল) ঃ মরুভূমিতে কোন রাস্তা ঘাট না থাকায় পথ চেনা খুব কঠিন ছিল। তাই নিরাপদ গমন ও শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তায় গন্তব্যে পৌঁছার জন্য রাসুল (সা) প্রায় সব অভিযানে পেশাগত পথ প্রদর্শক ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে ১৪ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- আবদুল্লাহ ইবন উরায়কিত (হিজরত), আবু হামযা (উহুদ), মাযকুর (বনু মুস্তালিক), আমর (হুদায়বিয়া), আলকামা (তাবুক)।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান স্থল

স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে রাসুল (সা) ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১৪০০ সাহাবী নিয়ে হজ্জে রওয়ানা হলে কুরাইশরা বাধা দিলে এ স্থানে (বর্তমান সুমাইছি) তাঁবু খাটেন। শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান এবং দূত হত্যার গুজব ছড়ালে সাহাবীগণ বাবলা গাছের নীচে জিহাদের শপথ নেন। এতে ভীত হয়ে কুরাইশরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

খাইবারের ইহুদী দুর্গ

ইহুদীদের একটি দুর্গ। ৭ম হিজরীতে খায়বার অভিযানে এ দুর্গটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ অভিযানে ইহুদীরা নায়েম, কামুস, নাতাত, কাসারাহ, শাক ও মুলবাতাহ নামক ৬টি দুর্গে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধে এরা পরাজিত হয়ে সন্ধি করে।

রাসুল (সা) এর মক্কা বিজয়ের প্রবেশ পথ। সে সময় মক্কা প্রবেশের ২টি পথের মধ্যে কুদা পাহাড়ের উচ্চ ভূমির এ পথ দিয়ে প্রবেশ করে হাজুন নামক স্থানে তিনি বিজয়ের পতাকা স্থাপন করেন। নিম্নভূমির অপর পথ দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন।

হুনাইন যুদ্ধের মাঠের একাংশ

মাদায়েনে সালেহের যে স্থানে তাবুক যুদ্ধের সময় মহানবী (সা) তাবু স্থাপন করেছিলেন। স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

তাবুক মসজিদ

Calendar 2002

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

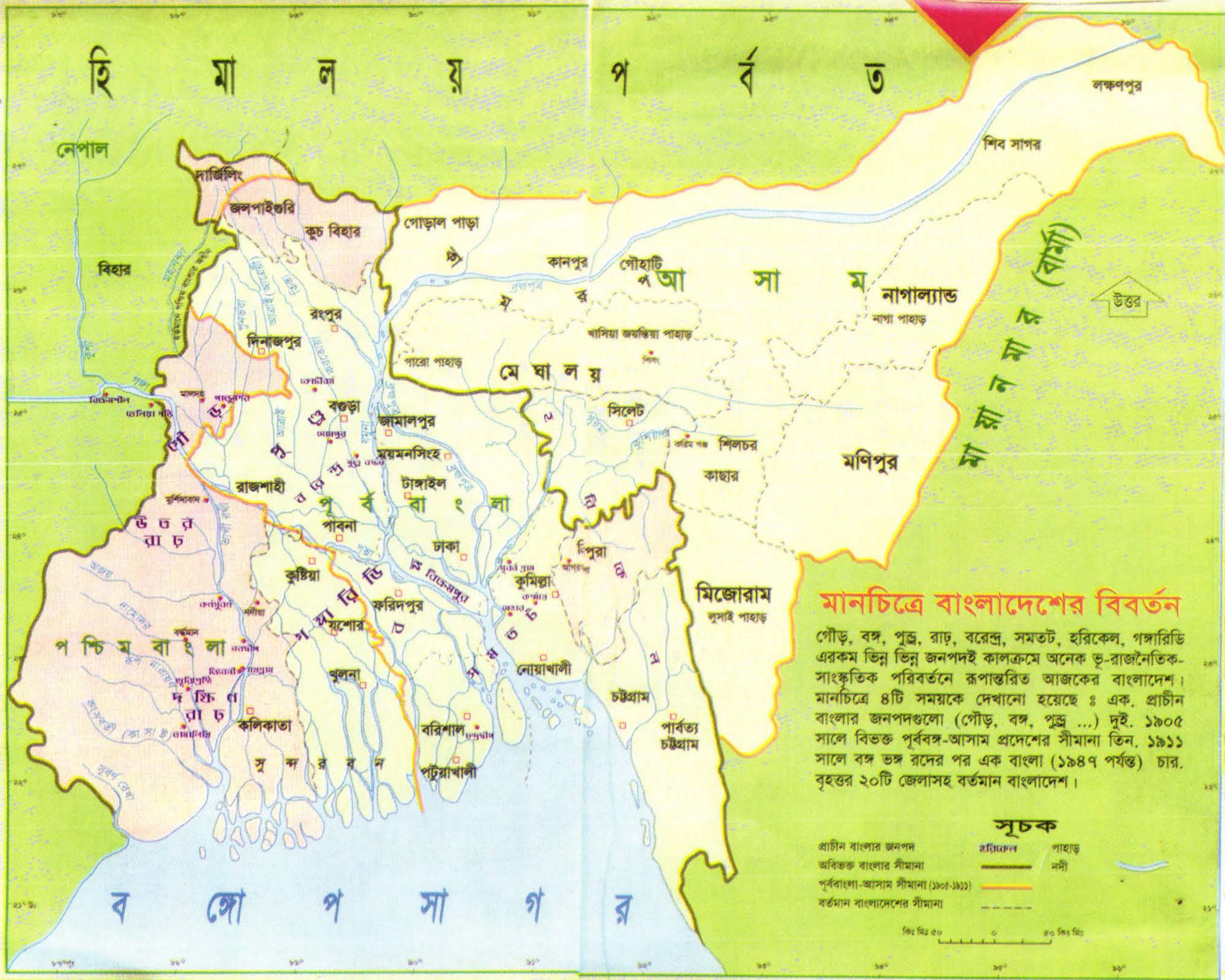

মানচিত্রে বাংলাদেশের বিবর্তন

গৌড়, বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, গঙ্গারিডি এরকম ভিন্ন ভিন্ন জনপদই কালক্রমে অনেক ভূ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত আজকের বাংলাদেশ। মানচিত্রে ৪টি সময়কে দেখানো হয়েছে ঃ এক. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো (গৌড়, বঙ্গ, পুন্ড্র ...) দুই. ১৯০৫ সালে বিভক্ত পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশের সীমানা তিন. ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদের পর এক বাংলা (১৯৪৭ পর্যন্ত) চার. বৃহত্তর ২০টি জেলাসহ বর্তমান বাংলাদেশ।

সূচক

প্রাচীন বাংলার জনপদ — হরিকেল
পাহাড়
অবিভক্ত বাংলার সীমানা
নদী
পূর্ববাংলা-আসাম সীমানা (১৯০৫-১৯১১)
বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা

মানচিত্রে যা আছে—
- স্বাধীনতা যুদ্ধের ১১টি সেক্টর ও কমান্ডারদের নাম
- মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য তথ্যাবলী
- ৬৪টি জেলা, প্রধান সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ২০°৩৪´ থেকে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১´ থেকে ৯২°৪৪´ পূর্ব-দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বিশ্বে জনসংখ্যার ঘনত্বে ২য়, জনসংখ্যার পরিমাণে ৯ম, আয়তনে ৯০তম দেশ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জীবন্ত ব-দ্বীপ। ৬টি বিভাগ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট), ৬৪টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা, ৫১৯টি পুলিশ থানা, ২২৯টি পৌরসভা, ৪৪৫১টি ইউনিয়ন, ৮৫৯৫০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গ কিমি। মোট সীমানা ঃ ৫১৩৮ কিমি [স্থল ঃ ৪৪২৭ কিমি (ভারতের সাথে ৪১৫৬ কিমি, মায়ানমারের সাথে ২৭১ কিমি), জল ঃ ৭১১ কিমি]। সমুদ্র সীমা ঃ ১২ নটিক্যাল মাইল (আঞ্চলিক), ২০০ নটিক্যাল মাইল (অর্থনৈতিক)। সংসদীয় সরকার। ৩৯টি মন্ত্রণালয়।

বিশাল পললভূমির বাংলাদেশ। যেভাবে পললভূমি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তেমনি বাংলাদেশের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তা তৈরি হয়েছে বহু সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি এর অধিবাসীদের চরিত্র ও জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। এরা পরিণত হয়েছে কষ্ট-সহিষ্ণু, সাহসী ও সংগ্রামী মানুষে। বেড়ে উঠেছে স্বাধীনতার অদম্য প্রেরণা নিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর্য-নিষ্পেষিত মানবগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছিল এ জনপদকে। আবার তারাই ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটরদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে বিরামহীনভাবে। পাকিস্তান সৃষ্টির অগ্রসেনানী এদেশবাসীরাই পাকিস্তানী অন্যায়-অবিচারের নিকট মাথা নত না করে লড়াই করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলাদেশ

শাসনামল	সাল	মোট বছর	মোট শাসক	উল্লেখযোগ্য নৃপতি/শাসক
• মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিন	৩২৪খৃপূ-১৮৭খৃপূ	১৩৭	৫ জন	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার, অশোক
• গুপ্ত (শশাঙ্ক সহ)	৩২০-৬৩৭খ্রি	৩১৭	২২ জন	চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্র গুপ্ত, ২য় চন্দ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক
• মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা)	৬৩৭-৭৫৬খ্রি	১১৯		
• পাল	৭৫৬-১১২৪খ্রি	৩৬৮	১৪ জন	গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, ১ম মহীপাল, রামপাল, নারায়ণপাল
• সেন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

...রক্তের সাথে মিশেছে অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলীয়, আর্য রক্তের ধারা। নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় বিশেষ কাউকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও এখানকার গরিষ্ঠ মানুষের মিল রয়েছে, তাদের জীবন দৃষ্টিতে। এই গরিষ্ঠ মানুষের জীবন চেতনা, আদর্শ, বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিই জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, জাতিসত্তার ভিত্তি।

... সর্বপ্রথম 'বাঙ্গলা' নাম দেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭)। তাই ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিঃসন্দেহে বলা যায় ইলিয়াস শাহের নাম। ইতিহাসে তার নামের আগেই দেখা যায় সর্বপ্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গলা' আর তার সৈন্য বাহিনীর নাম ছিল 'বাঙ্গলা পাইক'। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের কোন কোন জনপদের রাজা-বাদশাগণ কখনো কখনো বিশাল শক্তির অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের রাজ্যের পরিধি বাংলার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ...

আহসান মঞ্জিল
নবাব আব্দুল গণি কর্তৃক ১৮৭২ সালে নির্মিত
তৎকালীন ঢাকার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু

ঢাকা ঃ বিশ্বের গুটিকয় মেগা সিটির অন্যতম। মসজিদের শহর বলে খ্যাত ঢাকা মোট ৪বার রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে : মোগল যুগে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক সর্বপ্রথম (১৬১০-১৭১৭), বঙ্গভঙ্গের সময় ২য় বার (১৯০৫-১৯১১), পাকিস্তান সৃষ্টির পর ৩য় বার (১৯৪৭-১৯৭১) প্রাদেশিক রাজধানী এবং সর্বশেষ ১৯৭১ থেকে অদ্যাবধি একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী। ঢাকার সাথে দু'ব্যক্তির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অখ্যাত এক জনপদটিকে ইসলাম খাঁ রাজধানী করে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আনেন এবং স্যার সলিমুল্লাহ দ্বি-খণ্ডিত বঙ্গে রাজধানী করে ঢাকার পুনর্জন্ম দেন। ১৯০৬ সালে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলমানদের প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ফোরাম মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়; যে দল ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ঢাকা ১৮৬৪-এ পৌরসভা, ১৯৭৮-এ পৌর কর্পোরেশন, ১৯৮৯-এ সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়। ঢাকা রক্ষায় ১৮৬৪-এ বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মিত হয়। ১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিজলী বাতি সাপ্লাই দেয়া হয়। ১৮৭৪-এ চাঁদনী ঘাটে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কেন্দ্র গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় নির্মিত গভর্নর হাউজটি ১৯৭২ সালে বঙ্গভবনে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

নানা ঘটনা ও বহু সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আজকের বাংলাদেশ–

ইসলামপূর্ব বাংলা ঃ আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ এবং আর্য বিরোধীদের নিরাপদভূমিতে পরিণত হয়। গুপ্ত যুগে আর্যকরণ ও জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠা পেলেও পাল যুগে আবার জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পায়। বহিরাগত সেনরা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করলে বখতিয়ার খিলজীর বিজয় অভিযান জনগণকে মুক্তি দেয়।

সুলতানী যুগ ঃ ১২০৪ মাত্র ১৭ জন অগ্রবর্তী অশ্ববাহিনী নিয়ে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় ও লক্ষণ সেনের বিক্রমপুরে পলায়ন ১২১২-২৭ হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খিলজীর দিল্লীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন ১৩৩৮ ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা ১৩৪২ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের ক্ষমতা গ্রহণ, বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চলকে একত্রিত করে স্বাধীন মুলুক বাঙ্গালা প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী জাতির পত্তন ১৩৫৯ ফিরোজ শাহ তুঘলকের দ্বিতীয় বাংলা অভিযান ১৫৭৬ রাজমহলের যুদ্ধে দাউদের পরাজয় ১৫৮৩-৯৯ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে ঈশা খানের অবিরাম লড়াই, আকবর সেনাপতি মানসিংহের পরাজয় (১৫৯৭) ও সন্ধি স্থাপন।

মোঘল যুগ ঃ মোঘল যুগে বাংলা একটা প্রদেশ হলেও এ অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি হয়– ১৬১০ সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগর) রাজধানী স্থানান্তর ১৬৬৬ শায়েস্তা খানের সুবেদারি আমলে চট্টগ্রাম অধিকার ও ইসলামাবাদ নামকরণ ১৭১৭ মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত ও বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর ১৭৪০ আলীবর্দী খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত ১৭৫৬ আলীবর্দী খানের মৃত্যু ও সিরাজুদ্দৌলার বাংলার সিংহাসন লাভ।

ইংরেজ আমল ঃ ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন) ও বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্বের সূচনা ১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬০-১৮০০ ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ১ম ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ ১৮১৮-৬২ হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়া কর্তৃক ফরায়েজী আন্দোলন ১৮২১-৩১ অকুতভয় বীর তিতুমীরের ইংরেজ-জমিদার প্রতিরোধ আন্দোলন ও শাহাদতবরণ ১৮৫৭ হাবিলদার রজব আলী কর্তৃক সিপাহী বিপ্লবের সূচনা ও ব্রিটিশ বিরোধী মহাঅভ্যুত্থান ১৮৬০ নীল বিদ্রোহ ১৯০৫ নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ ১৯০৬ ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রদ ১৯২০ খেলাফত আন্দোলন ১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বর্ণহিন্দুদের বিরোধীতা ১৯৪০ শেরেবাংলা কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব পেশ।

পাকিস্তান আমল ঃ ১৯৪৭ ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ (১৪ আগস্ট), তমুদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূচনা (১ সেপ্টেম্বর) ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের বিজয় ১৯৬৬ ছয়দফা পেশ ১৯৬৯ গণ-অভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন ১৯৭০ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ১৯৭১ প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন (২ মার্চ), কালরাত্রি (২৫ মার্চ), স্বাধীনতা ঘোষণা (২৬ মার্চ), অস্থায়ী সরকার গঠন (১৭ এপ্রিল), পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় (১৬ ডিসেম্বর)।

ছোট সোনা মসজিদ

অনুপম এ স্থাপত্য কীর্তিটি হোসেন শাহ এর আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) নির্মিত। উর্ধ্বপ্রান্তে সোনালী কলস থাকায় এর নাম সোনা মসজিদ। সুলতানী আমলের এ ধরনের অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শন বাংলাদেশে বিদ্যমান।

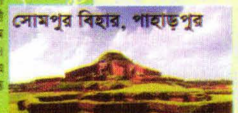

সোমপুর বিহার, পাহাড়পুর

এক সময় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। ভারত বর্ষে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে নিপীড়িত জনগণের জন্য এ অঞ্চল ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এ সময় অনেক বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। নওগাঁ জেলায় অবস্থিত এ বিহারটি রাজা ধর্মপাল (৭৮১-৮২১) প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত বিহারগুলো: শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভাসু বিহার, জগদ্দল বিহার ইত্যাদি।

কোতওয়ালি দরওয়াজা

সুলতানী আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক দুর্গ নগরী গৌড়ের অন্যতম প্রবেশদ্বার। এটি বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তে অবস্থিত। প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগর বা রাজধানীর প্রবেশপথে এ ধরনের তোরণ নির্মিত হতো। বিভিন্ন সময়ে বাংলার যেসব শহর রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পায় তন্মধ্যে ঢাকা, সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া, লখনৌতি, বিক্রমপুর বিখ্যাত।

বানিয়াচং গ্রামের একাংশ

প্রায় অর্ধলাখ লোক অধ্যুষিত সাগরদীঘির পাশে হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ গ্রাম।

ভাষা আন্দোলন ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার

১৯৪৭ প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠন ও ভাষা আন্দোলনের সূচনা (২ সেপ্টেম্বর), নুরুল হক ভূইয়াকে আহ্বায়ক করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন (১ অক্টোবর)। ১৯৪৮ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন (১১ মার্চ), ঢাকায় জিন্নাহ গোলাম আযম প্রমুখের ... (১৪ মার্চ), ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক প্রকাশ (১৪ নভে), প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট গোলাম আযমের স্মারকলিপি পেশ (২৭ নভে)। ১৯৫২ 'উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এর প্রতিবাদে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র সমাজের মিছিল, পুলিশের গুলি বর্ষণে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখের শাহাদাত। ভাষা আন্দোলনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তন্মধ্যে কয়েকজন: অলি আহাদ, আঃ রহমান চৌধুরী, আব্দুল গফুর, সানাউল্লাহ নুরী, শাহেদ আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, গাজীউল হক প্রমুখ।

সেদিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। ইংরেজ বেনিয়াদের দুইশত বছরের শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও অর্থনৈতিক উপনিবেশিকতার শিকার হয়ে বাংলাদেশ পঙ্গু হয়ে গেছে। অথচ এক সময় পৃথিবীর অন্যতম ধনী অঞ্চল ছিল বাংলাদেশ। স্মরণাতীত কাল হতে পর্যটকগণ নানা দেশ ভ্রমণ করে সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেন। সেই প্রাচীনকালে খৃষ্টপূর্ব রোমান কবি ভর্জিল, গ্রীক পণ্ডিত টলেমী, গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, ৭ম শতাব্দীর হিউয়েন সাং, ১৪শ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা, ১৫শ শতাব্দীর চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান, জিয়াউদ্দিন বারানীসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বর্ণনায় এসব জানা যায়। প্রথম পদার্পণেই সম্রাট হুমায়ূন অবাক বিস্ময়ে এর নাম দেন জান্নাতাবাদ ক্রমে পড়ে যান এ অঞ্চলের। সেসময় চীন থেকে মিশর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মসলিনসহ রেশমবস্ত্র, মৃৎ ও ধাতবপাত্র, মাদুর-পাটি, অলঙ্কার শিল্প, কারুকার্য, সোরা (বারুদ উপকরণ), গুড়সহ অসংখ্য পণ্য রপ্তানী হতো। এখনের সমৃদ্ধ দেশের অর্থ সম্পদ লুট করেই দরিদ্র-পশ্চাৎপদ ইউরোপ ধনাঢ্য ইউরোপে পরিণত হয়। তাদের সভ্যতা বিকশিত হয় আমাদের অর্থসম্পদ গ্রাস করেই।

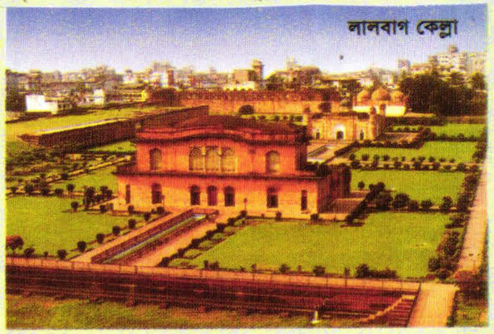

লালবাগ কেল্লা

লালবাগ দুর্গ নামে পরিচিত হলেও এ দুর্গের পোষাকী নাম আওরঙ্গাবাদ দুর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম বাংলার সুবাদার থাকাকালে ১৬৭৮খৃ এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তী সুবাদার নবাব শায়েস্তা খাঁ এ কাজ এগিয়ে নেন। ২০০০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৮০০ ফুট প্রশস্ত আয়তাকার এ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তিনতলা বিশিষ্ট প্রধান প্রবেশ তোরণ দুর্গের স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। ... দুর্গ এলাকার মাঝ বরাবর পশ্চিম প্রান্ত হতে এক সারিতে মসজিদ, পরীবিবির মাযার, হাম্মামখানা ও দরবার গৃহ এবং একটি জলাশয়ের অবস্থান। মসজিদটি ঐতিহ্যবাহী মোঘল তিন গম্বুজ পরিকল্পনায় নির্মিত। এরপরে মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে পরীবিবির মাজার। ভারতীয় এবং ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মোঘল স্থাপত্যরীতির এক অনুপম নিদর্শন এই ইমারত। নানা স্থান হতে সংগৃহীত বহুমূল্যবান পাথর আর অপূর্ব কারুকার্যের সমন্বয়ে নির্মিত এই সৌধটি বাংলাদেশে মোঘল ইমারতসমূহের মাঝে সহজেই আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। ... উষ্ণ এবং শীতল জলাধারসহ এখানে রাজকীয় স্নানের আয়োজন ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত এলাকা ঐতিহ্যবাহী মোঘল বাগান পরিকল্পনায় বিন্যস্ত।

হৃদয়ে বাংলাদেশ

পুরাতন ঢাকা গেট

মীর জুমলা ১৬৬০ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর ঢাকায় প্রবেশ দ্বার হিসেবে এই গেট নির্মাণ করেন।

সোনারগাঁ

মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ইছামতি ও শীতলক্ষ্যা নদী দ্বারা চতুর্দিক সুরক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক সোনারগাঁ'র পূর্ব নাম ছিল সুবর্ণগ্রাম। কথিত আছে ঈশাখাঁ'র স্ত্রী সোনাবিবি'র নাম থেকে সোনারগাঁ হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে গড়ে উঠলেও ১২৮০খৃ হতে এর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী সোনারগাঁ বিশ্বের কয়েকটি কিংবদন্তিতম স্থানের একটি ছিল যাকে পৃথিবীর জান্নাত বলা হতো। যা রীতিমতো উপমায় পরিণত হয়। ১৩৩৮খৃ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ একে রাজধানী করে এখান থেকেই বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শের শাহ'র মধ্য এশিয়া বিস্তৃত বিখ্যাত গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডের সূচনা হয় এখান থেকেই। ঈশাখাঁ এখানে অবস্থান করেই সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতিভূতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় প্রাদপ্রদীপের ভূমিকায় থেকে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে অবদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও মহিমান্বিত করেছে।

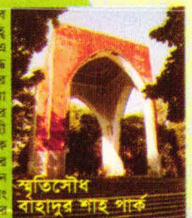

স্মৃতিসৌধ
বাহাদুর শাহ পার্ক

হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ১৮৫৭-এ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার বিদ্রোহের সূচনা হয়। ঢাকার অগণিত বিদ্রোহী সিপাহীদেরকে ইংরেজরা আন্টাঘর নামক ময়দানে ফাঁসি দেয় এবং ১৮৫৭ সালে রাণীর ঘোষণাপত্র মার্বেল ফলকে স্থাপন করে নাম দেয়া হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক। ১৯৫৭-এ সিপাহী বিপ্লবের একশ বছর উৎযাপন উপলক্ষে অজ্ঞাতনামা শহীদদের স্মরণে এখানে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় এবং ভিক্টোরিয়া পার্কের পরিবর্তে শেষ মোঘল সম্রাটের নামে বাহাদুর শাহ পার্ক করা হয়।

বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ

১৯৭২ সংবিধান গৃহীত (৪ নভেম্বর), কার্যকরী (১৬ ডিসে) ১৯৭৫ একদলীয় বাকশাল গঠন (২৫ জানু), ফারাক্কা বাঁধ চালু (২১ এপ্রিল), শেখ মজিবুর রহমান নিহত (১৫ আগস্ট), সিপাহী জনতার বিপ্লব (৭ নভে) ১৯৭৬ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু (২৯ আগস্ট) ১৯৭৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রশিবিরের আত্মপ্রকাশ (৬ ফেব্রু) ১৯৭৮ ১ম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান নির্বাচিত (৩ জুন) ১৯৮১ জিয়াউর রহমান নিহত (৩০ মে) ১৯৮২ সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ (২৪ মার্চ) ১৯৮৩ ... কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক পেশ (২০ নভে) ১৯৮৫ ঢাকায় ১ম সার্ক সম্মেলন ১৯৮৭ জামায়াতের সদস্যগণের পদত্যাগে ৩য় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে যায় ১৯৮৮ ভয়াবহ বন্যা ১৯৯০ গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতন ১৯৯১ বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ৫ম সংসদ নির্বাচন (২৭ ফেব্রু), জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে বিএনপির সরকার গঠন ১৯৯২ তিনবিঘা হস্তান্তর ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৫ ফেব্রু), ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের বিল পাস, ৭ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় (১২ জুন) ২০০০ প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন (২১ ফেব্রু), সার্বভৌমত্ব সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রশিবিরসহ ১০টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন (২৯ এপ্রিল) ২০০১ সরকার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মহাসমাবেশ (২৪ মার্চ), বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ (১৫ জুলাই), ৮ম সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয় (১ অক্টো)।

মহাদুর্ভিক্ষ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে মানব সৃষ্ট তিনটি দুর্ভিক্ষই ছিল নজিরবিহীন। যথা –

১৭৭০ (১১৭৬বাং) ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সৃষ্ট সবচেয়ে ভয়াবহতম এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক মারা যায়। নব প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনকে পাকাপোক্ত করাই ছিল এ দুর্ভিক্ষের কারণ।

১৯৪২-৪৩ (১৩৫০বাং) ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩৫-৪০ লক্ষ লোক মারা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মা হয়ে জাপানি বাহিনীর প্রবেশ ঠেকাতে কৌশল হিসেবে এই অভাব দুর্ভিক্ষ বেছে নেয় ইংরেজ সরকার।

১৯৭৪ ঃ বন্যাকে উপলক্ষ করে শাসক গোষ্ঠীর লুটপাট, কালোবাজারী, মজুদদারীর মাধ্যমে সৃষ্ট কৃত্রিম এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক লোক মারা যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের উপর গবেষণা করে, তত্ত্ব দিয়ে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান অমর্ত্য সেন।

www.pathagar.org

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

calendar 2002

মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু রাসুলে করীম (স) এর হাতে গড়া একদল নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ইসলামের সুমহান দাওয়াত নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে এবং বহু ইসলাম প্রচারক বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করেন। পরবর্তীতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

হাতে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফ

সপ্তদশ শতাব্দীতে অপূর্ব কারুকার্যে ও সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা কুরআন শরীফটি জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সে সময় ছাপাখানা না থাকলেও হাতে লিখেই মানুষ ধর্মীয় গ্রন্থ, বই-পুস্তক নিজস্ব সংগ্রহে রাখতো। কুরআনই হচ্ছে মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ। মুসলমানরা যতদিন কুরআনকে তাদের জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিল ততদিন তারাই ছিল পৃথিবীর শাসক। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ কুরআনভিত্তিক শাসন চালু করায় সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতির ফলে মুসলিম জগতে নেমে আসে অমানিশা। অপমান, অধঃপতন আর নির্যাতন হয়েছে তাদের নিত্যসঙ্গী। মুসলমানদের রক্তে আজ পৃথিবী রঞ্জিত। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কুরআনের দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

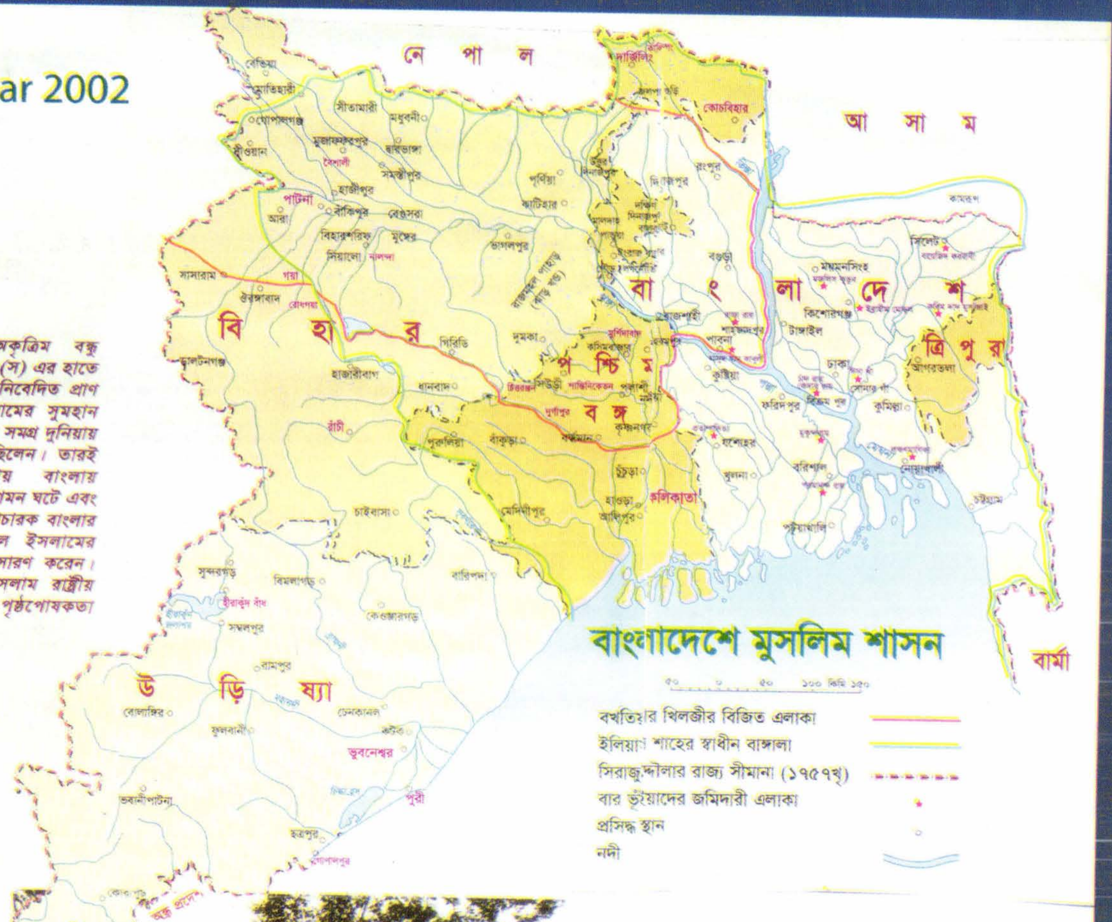

বাংলাদেশে ইসলামের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে কয়জন ব্যক্তিত্বের অবদান চিরস্মরণীয় তন্মধ্যে হযরত শাহজালাল (র) অন্যতম। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ তার সেনাপতি সেকান্দার গাজীকে দু'বার রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠিয়ে ব্যর্থ হলে শাহজালাল (র) ৩৬০জন শিষ্য নিয়ে ঐ বাহিনীকে সহযোগিতা করলে যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে গৌর গোবিন্দ পলায়নে বাধ্য হয়। সুদূর ইয়ামেনের দীপ্ত দরবেশ হযরত শাহজালাল (র) আজ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে সিলেট বিজয় করে মহানবী (স) প্রতিষ্ঠিত মদিনার নগর রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে (১৩০৩-৪৬খৃ) যে উন্নত সভ্যতার পত্তন করেছিলেন তার ভিত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তারই স্মৃতিধন্য এই সিলেট বাংলাদেশের সম্পদ-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধির প্রতীক। সুপ্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এবং শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গৌরবোজ্জল ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারে ধন্য সিলেট বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী।

ষাটগম্বুজ মসজিদ

খুলনা বিভাগের সর্বত্র জনবসতি গড়ে তোলা এবং ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন খান জাহান আলী। তিনি এলাকায় কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন খলিফাতাবাদ বা আল্লাহর প্রতিনিধির অঞ্চল। বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদসহ ৩৬০টি মসজিদ, লোনা পানির দেশে সুপেয় পানির জন্য ৩৬০টি দীঘি ও অসংখ্য পাকা সড়ক নির্মাণ করেন। তিনি ঝিনাইদহের বারবাজার থেকে দক্ষিণমুখে পথে পাকা সড়ক, পাকা মসজিদ নির্মাণ ও বড় বড় জলাশয় খনন করে অগ্রসর হতে হতে বাগেরহাটে এসে আস্তানা গাড়েন। সেখানেই ১৪৪৯খৃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দরসবাড়ি মাদ্রাসার ভূমি কাঠামো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় নগরীতে ১৪৭৯খৃ এই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হয়। পাশে একটি চমৎকার মসজিদ রয়েছে। আরবী দরস অর্থ পাঠদান। মাদ্রাসায় দরস বা পাঠদান করা থেকেই এলাকার নাম দরসবাড়ি হয়ে যায়।

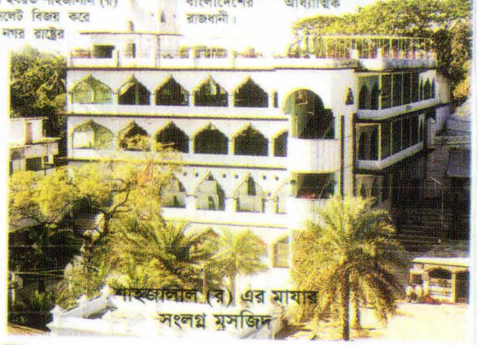

শাহজালাল (র) এর মাযার সংলগ্ন মুসজিদ

নহবতখানা

বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে ইসলামের আগমন

১২০৪খৃ বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই এদেশের অধিবাসীগণ ইসলামের সাথে পরিচিত ছিলেন। আরবদেরকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে চীনে যেতে হতো। এছাড়াও এ বন্দরের সাথে ইসলাম আগমনের পূর্বেই আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) এর সময় ৬১৭খৃ সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক (রা) এর নেতৃত্বে কায়েস ইবনু ছায়রদী, তামীম আনসারী, উরওয়াহ ইবন আছাছা ...

ইংরেজ আমলে মুসালম সংস্কারকদের ভূমিকা

১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলে বাংলার মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসন ও হিন্দু জমিদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুসলমানরা তিনধরনের আক্রমণের শিকার হতে থাকে। দখলদার ইংরেজদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরম আক্রমণ, তাদের তল্পিবাহক হিন্দু এলিটদের সাংস্কৃতিক অগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে খৃষ্টান মিশনারীদের ...

ইদ্রাকপুর জলদুর্গ

www.pathagar.org

১৬৬০খ্রি বাংলার সুবাদার মীরজুমলা মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুন্সীগঞ্জের ইছামতি নদীর তীরে এ দুর্গ তৈরি করেন। বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন দুর্গ দেখা যায় তন্মধ্যে অন্যতম হিসেবে ইদ্রাকপুর বিখ্যাত।

ধানমন্ডি ঈদগাহ

বাংলাদেশের প্রাচীন ঈদগাহের একমাত্র নিদর্শন। বাংলার সুবাদার শাহ সুজার আমলে দেওয়ান মীর আবুল কাশেম ১৬৪০খ্রি এটি নির্মাণ করেন। অন্যান্য বিখ্যাত ঈদগাহের মধ্যে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ।

গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কবর, সোনারগাঁ

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় শাসক গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ। তাঁর ন্যায়বিচার আজো কিংবদন্তি হয়ে আছে। তিনি তাঁর শিক্ষক আল্লামা ... ১৪১১খ্রি নিহত হন।

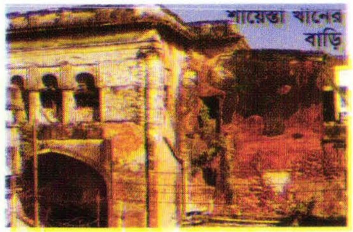

শায়েস্তা খানের বাড়ি

১৬৬৩খ্রি বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর বসবাসের জন্য ছোটকাটরার পাশে এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এর প্রাচীন সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটি ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত।

পানাম পুল

মুসলিম শাসনামলে ছিল জনকল্যাণমুখী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল তখন। সে সময় অসংখ্য রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-পুল নির্মাণ করা হয়। সোনারগাঁয়ে মোঘল আমলে নির্মিত পানাম জনপদের প্রবেশপথে ১৭৩ ফুট দীর্ঘ এ পুলটি তারই নজির।

হবেন • আব্দুল্লাহ ইবনু উতবান • আসেম ইবনু আমর তামিমী • সাহল ইবনুল আবদী • সুহায়েল ইবনু আদী • হাকিম ইবনু আবিল আস সাকাফী (রা)। পরবর্তীতে তুর্কিস্তান থেকে মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহাম্মদ এর একটি দল প্রেরিত হয়ে বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন।

৭১২খ্রি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়। ৭৮৮খ্রি ... ৯৫২খ্রি আরাকানের মুসলমানদের পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামে আগমন। Test ta-Gong (চাটিগাঁও/চট্টগ্রাম) নামক স্থান বিজয় করেন এবং বাংলায় ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ১০৫৩খ্রি শাহ মুহাম্মদ সুলতান বলখী পুন্ড্রনগরে (বগুড়া) ইসলাম প্রচার করেন। ... ১১০০খ্রি এদেশে মুবাল্লিগ নিয়ে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী নেত্রকোনায় আসেন। ... ১১৮৪খ্রি শাহ মাখদুম রূপোশ রাজশাহীতে ইসলাম প্রচার করেন। ১২০৪খ্রি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলা জয় করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়ীবেশে ইসলাম

উত্তরবঙ্গ (গৌড়, নদীয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর) : ১২০৪খ্রি বখতিয়ার খিলজী। পূর্বাঞ্চল (সোনারগাঁও, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ) : ১২৮০খ্রি মুগিসউদ্দিন তুগরীল। সিলেট : ১৩০৩খ্রি শাহজালাল, সেকান্দার গাজী। চট্টগ্রাম : ১৩৪০খ্রি ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। খুলনা বিভাগ : ১৪১৮-১৪৫৯খ্রি খান জাহান আলী।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২০৪খ্রি। মুসলিম শাসন একাধারে ৫৫৪ বছর চলেছিল। তা হলো—

১২০৪খ্রি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি রংপুরে, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা ও নদীয়ায় ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেন। ... ১২১২-২৭খ্রি গিয়াস উদ্দিন খিলজী ... মসজিদ নির্মাণ করেন। ... ১২৮০খ্রি ... ১৩০১-০৮খ্রি ...

১৩১৩খ্রি শাহ শফীউদ্দীনের সহযোগিতায় জাফরখান সাতগাঁও জয় করেন। ১৩২৫খ্রি ... ১৩৫২খ্রি হাজী ইলিয়াস শাহ ... ১৪১৫খ্রি ... ১৪৭৫খ্রি ... ইসলাম প্রচার করেন। ১৪৭৫খ্রি ইউসুফ শাহ তার শাসনামলে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের নৈতিক মানোন্নয়নে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন এবং বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫১৬খ্রি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন শাহ পরাগল খান খলিফাতুল্লাহ, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। ১৫৩৬খ্রি সুলাইমান কররানী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তিনি সালতানাতে ইসলামী শরীয়াহ কার্যকর করেন এবং প্রতিদিন সকালবেলা একদল আলেমের সাথে শরীয়াহ বিষয়ক আলোচনা করতেন। ১৫৮৩-১৫৯৯খ্রি ঈশা খাঁ বার ভূঁইয়াদের নিয়ে বাতিল ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মোঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে বাংলাকে দীনেএলাহীর প্রভাবমুক্ত রাখেন এবং দিল্লী থেকে বিতাড়িত প্রতিবাদী মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেন। ১৬৬৪খ্রি সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছে প্রথমে যাকাত, উশর, জায়গীর ইত্যাদি সংক্রান্ত অসঙ্গতি দূর করেন। ১৭১৭খ্রি মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার হয়ে বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ নির্মাণ করেন; ১৭৫৭খ্রি ২৩ জুন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। অপরিণামদর্শী স্বার্থান্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ফলে ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হয়ে ১৯০ বছর ইংরেজদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে হয়।

চেরাগী পাহাড়ে শাহ বদরের স্মৃতি বিজড়িত স্থান

শাহ বদর এখানে চাটি বা চেরাগ জ্বালিয়ে লোকালয় গড়ে তোলেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। তাই এলাকার নাম হয় চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম। যার আওয়ালিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামে পদধূলি পড়েছে অসংখ্য পুণ্যাত্মার। সেই রাসূল (স) এর যুগ থেকেই তার প্রিয় ৪জন সাহাবীসহ এখানে এসেছিলেন অসংখ্য মুসলিম ব্যবসায়ী ও ইসলাম প্রচারক। তারা ইসলাম প্রচার ও জনগণের কৃষ্টি-কালচার পরিবর্তন করেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগেই চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী আরাকানসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী বিভিন্ন বন্দর যেমন মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, চীন, থাইল্যান্ডে ইসলাম প্রচার হতে থাকে। গড়ে উঠে আরবদের নৌ-এলাকা। এ নৌ-পথেই চট্টগ্রাম হয়ে বাংলায় ইসলাম প্রথমে প্রবেশ করে। এজন্যই চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

ছেলে দুদু মিয়া মুন্নু পর্যন্ত (১৮৪০-৬২খ্রি) এটিকে ইংরেজ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ দেন।

মীর নিসার আলী তিতুমীর : তিনি ১৮৩১ সালে ইংরেজ, হিন্দু জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ ও মুসলিম সমাজে আত্মজাগরণ সৃষ্টিতে গড়ে তোলেন আন্দোলন। ... তিনি ১৮৩১খ্রি তার নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লায় শাহাদাতবরণ করেন।

মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী : তিনি বাংলা ... ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ... মুসলমানরা হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠান সবই পালন করত। তিনি ১৮২২খ্রি তার প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৮৭৩খ্রি রংপুরে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তা অব্যাহত রেখে মুসলিম সমাজের আমূল পরিবর্তন করেন।

মুন্সি মেহেরুল্লাহ : খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। তার চেষ্টার ফলেই মিশনারীদের কর্মতৎপরতা অনেক কমে যায় এবং মুসলিম সমাজ সতর্ক হতে পারে।

বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হওয়ার পরও মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ

বিশ্বমানচিত্রের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, এর চারপাশে নানা মতাবলম্বীদের আবাসভূমি হওয়ার পরও কিভাবে বিচ্ছিন্ন এ অঞ্চলটি মুসলিম প্রধানের গৌরব অর্জন করল, তার কারণ হলো : ইসলাম যখন সমগ্র দুনিয়ায় মুবাল্লিগ ও মুজাহিদগণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছিল তখন স্থলপথের চেয়ে নৌ-পথই ছিল যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম। বাংলার চাটিগাঁও ছিল বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর একটি। ইসলাম প্রচারক ও আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে শৎগাঙ (চট্টগ্রাম) বন্দর হয়ে চীন দেশে যেত। এ সুবাদে বাণিজ্য কাফেলা ও মুবাল্লিগগণ বাংলায় প্রবেশ করে ইসলামের দাওয়াত মানুষের জন্য রেখে গেছেন। আজাড়া রাজনৈতিক কলহমুক্ত, শান্ত প্রকৃতি ও কোমল স্বভাবের অধিকারী, নৈতিক চরিত্রে খুবই উন্নত এ অঞ্চলের মানুষ ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলাম দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। পরবর্তীতে ইসলাম রাজনৈতিক তৎপরতা সমন্বয়ে বিজয়ী রূপ লাভ করে।

অঞ্চলভিত্তিক বিখ্যাত ইসলাম প্রচারকগণ

চট্টগ্রাম ৬১৭খ্রি সাহাবী- আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাব, কায়েস ইবনু হুযাইফা, উরওয়াহ ইবনু আছাছা, আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা), ৬৪৬খ্রি তাবেয়ী- মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ মুহায়মেন, ৮৭৪খ্রি আওলিয়া- বায়েজীদ বোস্তামী, মাহমুদ মাহী সওয়ার, বদর শাহ, ১৫০৫খ্রি শেখ ফরিদ, ১৮০১খ্রি শাহ আমানত কুমিল্লা-চাঁদপুর ১৩০৩খ্রি শাহ রাস্তি, শাহ মাদার খাঁ নেত্রকোণা ১১০০খ্রি শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী মুন্সীগঞ্জ ১২০০খ্রি আদম শাহ রাজশাহী ১১৮৪খ্রি শাহ মাখদুম রূপোশ, তুরকান শাহ বগুড়া ১৫৫৩ শাহ বন্দিনী গাজী, ১৬৫৮খ্রি শাহ সুলতান বলখী, ১৭৭৬ ফতেহ আলী দিনাজপুর ১২০৩খ্রি আলী মারদান খিলজী, বদরুদ্দীন পাবনা ১২৪০খ্রি মাখদুম শাহ দৌলা সোনারগাঁও ১২৭৮খ্রি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, ১৩১৩খ্রি শাহ শফীউদ্দীন, ১৩৫২খ্রি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া, ১৩৫৮খ্রি শায়খ আলাউল হক সিলেট ১৩০৩খ্রি শাহজালাল ইয়ামেনী, শাহ পরান ১৪৫১খ্রি শাহ ইসমাঈল গাজী লক্ষ্মীপুর ১৩০৪খ্রি সাইয়েদ আহমদ তানুরী নোয়াখালী ১৩২৮খ্রি ফখরুদ্দীন বাগের হাট ১৪৩১খ্রি খান জাহান আলী, গরীব শাহ, শাহ মাদার, ১৪৫১খ্রি মুহাম্মদ আবু তাহির ঢাকা বিভাগ ১০৫৩খ্রি সুলতান রুমী, ১১৭৯খ্রি আদম শহীদ, ১৪৯০খ্রি তুরকান শাহ, ১৫৪৫খ্রি সুলাইমান খান, ১৫৭৭খ্রি শাহ আলী বোগদাদী, ১৫৮৪খ্রি শাহবাজ খান, ১৬৫৯খ্রি মুয়াযযাম খান মীর জুমলা, ১৬৬৪খ্রি শায়েস্তা খাঁন জাহাঙ্গীর খুলনা ১২৭৭খ্রি বরহত খান গাজী রংপুর ১৩০৩খ্রি শাহ কলন্দর ১৩০৭খ্রি মখদুম শাহ জালালুদ্দীন, জাহাঁগশাহ বুখারী, ১৮৯৭খ্রি সৈয়দ আবু জাফর মাদানী, গোরা সৈয়দ পীর, পাগলা পীর, ১৪৫১খ্রি শাহ ইসমাঈল গাজী, ১৮৭৩খ্রি কেরামত আলী জৌনপুরী, শাহ কলন্দর ফরিদপুর ১০৪৭খ্রি শাহ সুলতান রুমী, ১২০০খ্রি শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার, ১৪০০খ্রি বদিউদ্দীন শাহ মাদার, ১৪১২খ্রি শাহ আলী বাগদাদী, ১৮১৮খ্রি হাজী শরিয়তুল্লাহ, ১৮৯৮খ্রি শামসুল হক ফরিদপুরী জামালপুর ১৫০৩খ্রি শাহ কামাল, ১৭৭৯খ্রি শাহ জামাল বৃহত্তর বরিশাল ১৩৬১খ্রি সাইয়েদুল আরেফীন, মীর কুতুব, চেরাগ আলম, নফিসুর রহমান, শাহ ওয়াজিহ আলী, শাহ ইয়ার, ১৯১৪খ্রি নেছার উদ্দিন আহমদ, ১৮৫০খ্রি কেরামত আলী, ১৮৫৭খ্রি আবু জাফর ছালেহ।

ইসলাম প্রচারে বঙ্গে উল্লেখযোগ্য শহীদগণ

১১৭৯খ্রি বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদ (একদল অনুসারীসহ) ১২৪৫খ্রি পাবনার শাহজাদপুরে মখদুম শাহদৌলা (২১জন অনুসারীসহ) ১২৭৯খ্রি বগুড়ার শেরপুরে শাহ তুর্কান শহীদ ১২৯৯খ্রি সাতগাঁও-এ শাহ সূফী শহীদ ১৩২০খ্রি কুমিল্লায় সাইয়েদ আহমদ কল্লা শাহ ১৪১৭খ্রি গৌড়ে শায়খ বদরুল ইসলাম ১৪১৮খ্রি সোনারগাঁও-এ শায়খ আনওয়ার শাহ ১৭১৫খ্রি বর্ধমানে খাজা আনওয়ার শাহ ১৭১৫খ্রি ঢাকায় শাহ আব্দুর রহীম।

এটিই বাংলাদেশে সন্ধানপ্রাপ্ত একমাত্র নহবতখানা।

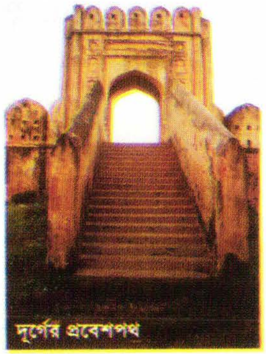

দুর্গের প্রবেশপথ

এটি নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ দুর্গের প্রবেশ পথ। দুর্গের প্রবেশ পথ কৌশলগত কারণে বেশ উঁচু এবং সরু রাখা হতো। যাতে শত্রুবাহিনী সহজে ভিতরে ঢুকতে না পারে।

জলাশয় সংলগ্ন ইমারত। এর ভূগর্ভস্থ কক্ষকে শীতল রাখতে জলাশয় হতে পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ করা হত। গৌড়ের এই তাহখানাটি ১৬৫৫খ্রি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা তার পীর শাহ নিয়ামতুল্লাহর জন্য নির্মাণ করেন।

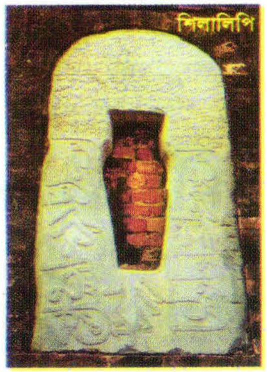

শিলালিপি

ইতিহাস উদ্ধারে শিলালিপির ভূমিকা অপরিসীম। ইতিহাস ইসলামের দান। প্রায় সকল ইসলামী স্থাপত্যে শিলালিপি দেখা যায়। এসব শিলালিপিতে রয়েছে শৈল্পিক নিদর্শন। ১৫৮২ সালে স্থাপিত বগুড়া জেলার শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ গাত্রে ধূসর বেলে পাথরের এ চমৎকার শিলালিপিটি সংরক্ষিত আছে।

Calendar 2002

আবহমান বাংলা

মাঠের পর মাঠ ভরা সবুজের সমারোহ, পুকুর-খাল-বিল-নদী-নালা, গাছ-গাছালির ঝোঁপ-ঝাড়, হরেক রকম পশু-পাখালির ঐকতানে পুরো বাংলাই যেন এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র। ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং থেকে শুরু করে নতুন কোন পর্যটক প্রথম দর্শনেই তন্ময় হয়ে যান বাংলার অপরূপ দৃশ্য দেখে।

অপরূপ সৌন্দর্যের আধার বাংলাদেশ। উর্বরা পললভূমিতে বেড়ে ওঠা গাছে গাছে পাখিদের প্রাতঃ-সান্ধ্য সঙ্গীত, একেবেঁকে চলা রূপালী নদীগুলো, দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ে সবুজের হাতছানি, পাহাড়ের গাঁ ফুড়ে বের হওয়া অসংখ্য ঝর্ণা, বিশাল বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র অবগাহন, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-বাদল, শিশির স্নিগ্ধতা, হিমেল আমেজ আর বসন্ত মুগ্ধতা নিয়েইতো ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ। রংতুলিতে আঁকা ছবির মত সম্রাট হুমায়ূনের জান্নাতাবাদ বাংলাদেশ আজ ফারাক্কার মরণছোবলে কিছুটা বিবর্ণ হলেও বিশ্বে এখনো অনন্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় আমাদের গৌরবের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতি

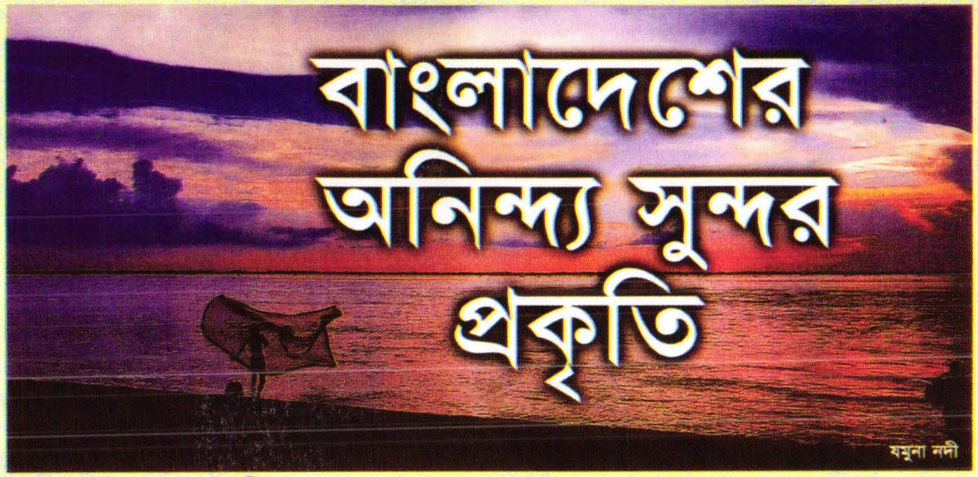

যমুনা নদী

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

Bango-Basin বা বঙ্গখাতে পলি জমে বাংলাদেশী ভূ-খন্ডের উৎপত্তি। টারশিয়ারী যুগের শিলা, প্লায়স্টোসিন যুগের সোপান এবং পরবর্তীকালের পলল থেকে মৃত্তিকা গঠিত। মাটির P^H মান ৪ থেকে ৭.৫ পর্যন্ত। অধিকাংশ এলাকা পলল গঠিত সমভূমি (১,২৪,২৬৬ বর্গ কিমি)। বেলে পাথর শেলপাথর, কাদা দ্বারা গঠিত পাহাড়গুলোর অধিকাংশ টারশিয়ারী যুগের। গড় উচ্চতা ২,০৫০ ফুট; সর্বোচ্চ পাহাড় গারো, সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয় (তাজিনডং)। পাহাড়ে ৩৩টি উপজাতির বসবাস। দেশে প্রবাহিত ২৩০টি নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১১,৭৩৯ কিমি। জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেমি। সিলেটের লালখানে সর্বোচ্চ (৬৩৭.৫সেমি), নাটোরের লালপুরে সর্বনিম্ন (১১৭.৫ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়। গড় তাপমাত্রা ২৫°সে। মোট স্থলভাগের ১৭% বনভূমি। ৩,৬৬,৭০,০০০ একর জমির মধ্যে ২,০১,৯৮,০০০ একর আবাদী জমি (৬২%)। বিশ্বে বাংলাদেশ পাটে ২য়, ধানে ৪র্থ, চায়ে ৮ম, আমে ১৩তম উৎপাদনকারী দেশ। ৫টি অঞ্চলের ২২টি গ্যাস ফিল্ডের ৪৪টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১০.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ৫টি কয়লা, ২টি পিট কয়লা, ৬টি শক্ত পাথর, ৩টি চুনা পাথরের খনিসহ আরোও অনেক প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

চলন বিল

বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য বিল ও হাওড় রয়েছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত এসব বিল-হাওড় কৃষিক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখে। এছাড়া মাছে-ভাতে বাঙ্গালীর জন্য মিষ্টি পানির নানা জাতের মাছ সরবরাহ করে এসব বিল ও হাওড়। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল চলন বিল উত্তরবঙ্গের বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তবে পাবনা ও নাটোরে বড় অংশ প্রবাহিত। একদিকে উষ্ণ বরেন্দ্রভূমি, অন্যদিকে বিশাল চলন বিল যেন প্রকৃতির এক অপরূপ দান। খুলনার ডুমুরিয়ার বিল ডাকাতিয়া, সিলেটের তামাবিলও বিখ্যাত। সিলেটের হাকালুকি হলো হাওড়গুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ।

চা বাগান

চা বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। ছোট বড় মিলিয়ে ১৫৮টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৪টিই সিলেট অঞ্চলে। সর্বাধিক ৯১টি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। চা রপ্তানীকারক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ৮ম। বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৪.৫ কোটি কেজি। চা বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

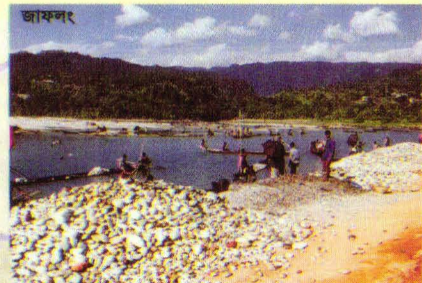

জাফলং

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। স্রষ্টা যেন আপন হাতে সাজিয়েছেন এ ভূমিকে। সবুজ টিলা আর পাহাড়ী নদীর মায়া জড়ানো সিলেটের জাফলং সৌন্দর্যপিয়াসীদের মন হরণ করে। আকাশসম উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর পানিতে বয়ে আসা অসংখ্য পাথর চিরকাল প্রকৃতি প্রেমিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এ পাথর এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার মাধ্যমও বটে।

পদ্মায় সূর্যাস্ত

রমনা পার্ক

www.pathagar.org

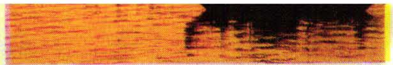

হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন গঙ্গার মূল শাখা রাজশাহীর নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করে। বাংলাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি-জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রমত্তা পদ্মা আজ ফারাক্কার মরণফাঁদে মৃতপ্রায়। পদ্মা বিধৌত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আজ ধু ধু বালুচর।

...ভাবে প্রতিষ্ঠিত ৭৩ একর আয়তনের মনোরম রমনা ...কায় সবুজের হাতছানি। পার্ক জুড়ে একে বেঁকে চলা লেক এবং ১২৪ প্রজাতির শতশত গাছ পার্কটিতে ...আবহ তৈরি করেছে। নগরবাসী ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ... থেকে পরিত্রাণ পেতে একটু পরিচ্ছন্ন বায়ুর জন্য ...য় ভীড় জমায়।

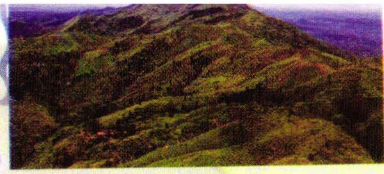

... প্রকৃতির অপরূপ দান। চিরহরিৎ বনাঞ্চল বলে খ্যাত বান্দরবান তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল। ২৯২৮ ফুট উঁচু কেওক্রাডং এবং ৩য় উচ্চতম শৃঙ্গ চিম্বুকও বান্দরবানে অবস্থিত। টারশিয়ারী যুগে গঠিত ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের পাহাড়গুলো উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

সীমান্তবর্তী অভিন্ন নদী

১. রায়মঙ্গল	২০. বুড়ি তিস্তা	৩৯. সোনাই-বরদমা
২. ইছামতি-কালিন্দি	২১. তিস্তা	৪০. জুড়ি
৩. বেতনা-কোদালিয়া	২২. ধরলা	৪১. মনু
৪. ভৈরব-কপোতাক্ষ	২৩. দুধকুমার	৪২. চলাই
৫. মাথা ভাঙ্গা	২৪. ব্রহ্মপুত্র	৪৩. লুন্দিয়া
৬. গঙ্গা	২৫. জিঞ্জিরাম	৪৪. খোয়াল
৭. পাগলা	২৬. চিল্লাখালি	৪৫. সুতাং
৮. আত্রাই	২৭. ভুগাই	৪৬. সোনাই
৯. পূর্ণভবা	২৮. নাটাই	৪৭. হোয়ারা
১০. তেতুলিয়া	২৯. সোমেশ্বরী	৪৮. বিজনি
১১. ট্যাঙ্গন	৩০. যাদুকাটা	৪৯. সালদা
১২. কুলীক	৩১. ধালাকাটি-খাসিয়া	৫০. গোমতী
১৩. নাগর	৩২. নয়াগাঙ্গ	৫১. কাকরী-ডাকাতিয়া
১৪. মহানন্দা	৩৩. উমনাম	৫২. সেলোনিয়া
১৫. ডাহুক	৩৪. চালা	৫৩. মুহুরী
১৬. করতোয়া	৩৫. পিয়াইন	৫৪. ফেনী
১৭. তালমা	৩৬. সারি-গোয়াইন	৫৫. মাতামুহুরী
১৮. ঘোড়ামারা	৩৭. সুরমা	৫৬. নাফ
১৯. দেওনাল-যমুনেশ্বরী	৩৮. কুশিয়ারা	

অভিন্ন নদীর মধ্যে ৫৪ ক্রমিক পর্যন্ত নদীগুলোতে ভারত বাঁধ দেয়ায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং উত্তরবঙ্গসহ বিরাট একটি অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

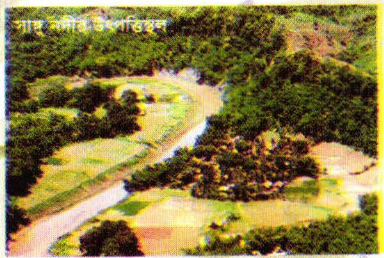

সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল

সাঙ্গু নদীটি বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তের আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন এবং বাংলাদেশের জলসীমায় শেষ হওয়া দুটি নদীর মধ্যে এটি একটি। ২৪৪ কিমি দীর্ঘ এ নদীটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। আকাশ থেকে তোলা উপরের ছবিতে সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল ও এর আশেপাশের পাহাড়ী উপজাতিদের বসতি দেখা যাচ্ছে। হালদা নামক অপর নদীটি খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলি পর্বতশৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলি নদীতে পতিত হয়েছে।

জুম চাষ

উপজাতিদের আদি চাষ পদ্ধতি এই জুম চাষ। উপজাতিরা চাষের মৌসুমে পাহাড়ের ঢালের একটি স্থানকে নির্ধারণ করে প্রথমে আগুন ধরিয়ে সবধরনের ঘাস-আগাছা পুড়ে পরিষ্কার হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে একই সঙ্গে কয়েক প্রকার বীজ বপন করে। চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা, তিল-ই প্রধান। বছরে দু'বার চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ভাল ফসল পেলেও সার্বিকভাবে এটি খুবই ক্ষতিকর। এতে ভূমিক্ষয় হয় এবং বনভূমি উজাড়ের ফলে বিরানভূমিতে পরিণত হয়।

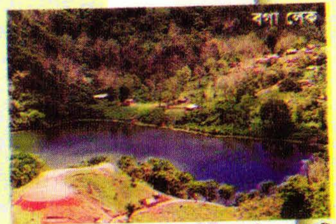

বগা লেক

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক সুপেয় পানির এ হ্রদটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতন এ হ্রদটি বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুন্দরবন

বিশ্ব ঐতিহ্যের ৫২২তম তালিকাভুক্ত বাংলাদেশের জাতীয় বন সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। এটি বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালি, বরগুনা এই ৫টি জেলাকে স্পর্শ করেছে। ৫৫৭৫ বর্গ কিমি আয়তনের এ বনটি টাইডাল বা জোয়ার ভাটার বনও। ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী এবং সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, বাইন, গোলপাতা, পশুর প্রভৃতি অসংখ্য গাছপালা একে মোহনীয় করেছে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন স্পটে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে মূলতঃ চারধরনের বন রয়েছে– পাহাড়ী বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বন, সমতল ভূমির শালবন, গ্রামীণ বন। ১২০০০ বর্গ কিমি আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল। মোট ৩৬টি জেলায় রাষ্ট্রীয় বনভূমি রয়েছে।

কুয়াকাটায় সূর্যোদয়

দক্ষিণবাংলার পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত বিশাল নারকেল বাগান ও নয়নজুড়ানো বালিয়াড়ি সমৃদ্ধ কুয়াকাটা বিশ্বের একটি বিরল সমুদ্র সৈকত, যেখান হতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়। ১৮ কিমি দীর্ঘ এ সৈকতের মূল সৌন্দর্য ২০০ একর জুড়ে বিস্তৃত কাব্যময় নারকেলবীথী, কুয়াকাটার অভিন্ন আত্মীয় জেলেপাড়া ও রাখাইন বসতি। এছাড়া ১৫৫ কিমি দৈর্ঘ্যের পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার বাংলাদেশের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ।

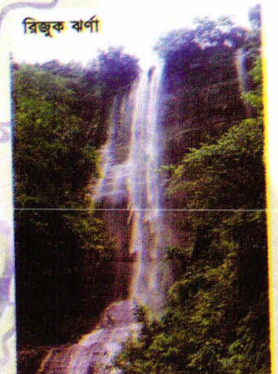

রিজুক ঝর্ণা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশে অসংখ্য জলপ্রপাত-ঝর্ণা রয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত ৭০ ফুট উচ্চতার এ রিজুক ঝর্ণাটি বাংলাদেশের ২য় উচ্চতম। ২৫০ ফুট উচ্চতায় মাধবকুণ্ড উচ্চতম জলপ্রপাত হিসেবে বিখ্যাত হলেও বান্দরবানে লোকচক্ষুর আড়ালে অসংখ্য ঝর্ণা রয়েছে। পুকুর পাড়া নায়াগ্রার মত প্রশস্ততম ঝর্ণা। চুম্পি, বাকত্লাই, ত্নাবং, রুমানাপাড়া, নাইনয়, সানক্রাই, ফিস্তপুং, তুলপেসহ অসংখ্য ঝর্ণা রয়েছে। এছাড়া সীতাকুণ্ডে গরম পানির ঝর্ণাও রয়েছে।

সেন্টমার্টিন

প্রবালরাশি

অসংখ্য নারিকেল গাছে ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বীপ সেন্টমার্টিনের এক সময় নাম ছিল নারিকেল জিঞ্জিরা। বিশ্বের গুটিকয় প্রবালদ্বীপের অন্যতম ৩.৮ বর্গমাইলের সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এখানে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন টন চুনাপাথর মজুদ আছে। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে বাংলাদেশে অসংখ্য মনোরম দ্বীপ রয়েছে। তন্মধ্যে ৯০.৬৫ বর্গ কিমি আয়তনের নিঝুম দ্বীপ সমুদ্র সৈকত, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত এবং পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা। হাতিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, মনপুরা, সন্দ্বীপ, সোনাদিয়া বিখ্যাত দ্বীপ।

তোমরা তোমাদের মহান রবের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

আল-কুরআন

www.pathagar.org

2003

মহাবিশ্ব

Revealing the Secrets of the Universe

মহাবিশ্ব : আমাদের পরিচিত এই মহাবিশ্বে প্রায় ১০ হাজার কোটি গ্যালাক্সী রয়েছে। এরা গুচ্ছাকারে মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে, তবে এসব গ্যালাক্সী একে অন্যের থেকে অভাবনীয় বিশাল দূরত্বে রয়েছে।

মহাবিশ্বের আকৃতি : মহাবিশ্বের বর্তমান ব্যাপ্তি প্রায় ২৬ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। আলো এক সেকেন্ডে অতিক্রম করে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার কিলোমিটার। এই আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় এক আলোকবর্ষ। সে হিসেবে এক আলোক বর্ষ সমান হচ্ছে প্রায় ৯,৪৬১ বিলিয়ন কিলোমিটার।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি : আজ থেকে ১৩০০ কোটি বছর আগে এক বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা এই মহাবিস্ফোরণের নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাং' (Big Bang)। বিগ ব্যাং এর প্রায় ৩ লক্ষ বছর পরে পদার্থ কণিকা তার বর্তমান রূপ লাভ করে। এর আগে পদার্থ পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র কণিকায় বিরাজমান ছিল। বিগ ব্যাং এর প্রায় ৯.২ মিলিয়ন বছর পর প্রাণের সৃষ্টি হয় এই মহাবিশ্বে।

মহাবিশ্বের পরিণতি : মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যান তিনটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল আবিষ্কার করেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা আসলে 'বিগ ব্যাং'-এরই ফল। ফ্রিডম্যানের প্রথম মডেল অনুযায়ী এই প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, অর্থাৎ গ্যালাক্সীসমূহ একটি ত্বরণে পরস্পর থেকে দূরে সরতে থাকবে। দ্বিতীয় মডেল অনুযায়ী, এই প্রসারণ ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে এবং মহাবিশ্ব একটি স্থিতিশীল আকৃতি পাবে।

তৃতীয় মডেল অনুযায়ী, মহাবিশ্বের কৃষ্ণবস্তুর প্রবল মহাকর্ষ বলের কারণ একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হবে এবং 'বিগ ব্যাং' এর বিপরীত 'বিগ ক্রাঞ্চ' (Big crunch) বা বৃহৎ সংকোচনের মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃহৎ সংকোচন এড়িয়ে যাবার মত ত্বরণ গ্যালাক্সীগুলির রয়েছে।

কয়েকজন খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী

স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) : মহাকর্ষ বলের সূত্রের সাহায্যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম বলেন যে, মহাকর্ষ বল গ্রহগুলিকে তাদের কক্ষপথে ধরে রেখেছে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) : ১৯০০ সালে তাঁর কোয়ান্টাম থিওরী প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, আলোকে তরঙ্গ/কণিকা উভয় রূপেই ধারণা করা যায়।

আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) : তার যুগান্তকারী আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রমাণ করেছিল যে, আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি এবং পদার্থ ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য।

এডউইন হাবল (১৮৮৯-১৯৫৩) : তাঁর পর্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত হয় যে, মহাবিশ্ব ক্রম সম্প্রসারণশীল।

স্টিফেন হকিং (জন্ম ১৯৪২) : ব্ল্যাকহোলের কোয়ান্টাম প্রকৃতি ও মহাকর্ষ বলের রূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।

আরব ও উপমহাদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী

আল ফারগানী : নবম শতাব্দীর খ্যাতিমান আরব জ্যোতির্বিদ। তিনি খলিফা আল-মামুন এর দরবারের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। তাঁর রচিত "জ্যামি এলমুল নজুম ওয়াল হরকত আল মামাযিয়া" গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় "Elements of Astronomy" নামে অনুদিত হয়। তিনি সৌরজগতের ৪টি গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করেছিলেন।

আল খারেজমী : বীজগণিতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আলজিবর ওয়াল মুকাবিলা" থেকেই অ্যালজেবরা (Algebra) নামটির উৎপত্তি। তিনি আকাশের মানচিত্র প্রণয়ন করেন এবং "ফিজিজ" নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল বেরুনী : একাদশ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর রচিত "কানুনে মাসউদী" তে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ইবনে ইউনুস : দশম শতাব্দীর এই জ্যোতির্বিদ একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকা 'জিজে ইবনে ইউনুস' নামে পরিচিত।

ওমর খৈয়াম : খ্যাতনামা আরব কবি ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম 'জিজ-ই-মালিকশাহী' নামের একটি তারা তালিকা এবং 'তারিখ-ই-জালালী' নামে একটি নিখুঁত পঞ্জিকা রচনা করেন।

আল বাত্তানী : মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে যার নাম পশ্চিমা বিশ্বে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন আল-বাত্তানী। পাশ্চাত্য জগতে ইনি Albategnius নামে পরিচিত। আল বাত্তানীই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, সূর্যের অপভূ স্থির নয়, তার অগ্রগমন আছে। তিনি গ্রহসমূহের দূরত্বও নির্ণয় করেন। এছাড়া চান্দ্র মাসের সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক ট্রপিক্যাল বৎসরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন।

জাবির ইবনে আফলাহ : জ্যোতির্বিদ্যাতে জাবির টলেমীর মতবাদকে ভীষণভাবে সমালোচনা করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত নয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইবনে তোফায়েল : টলেমীর মতবাদের বিরুদ্ধবাদী দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম ইবনে তোফায়েল। তিনি গ্রহসমূহের অবস্থানের ক্রমও পরিবর্তন করেন।

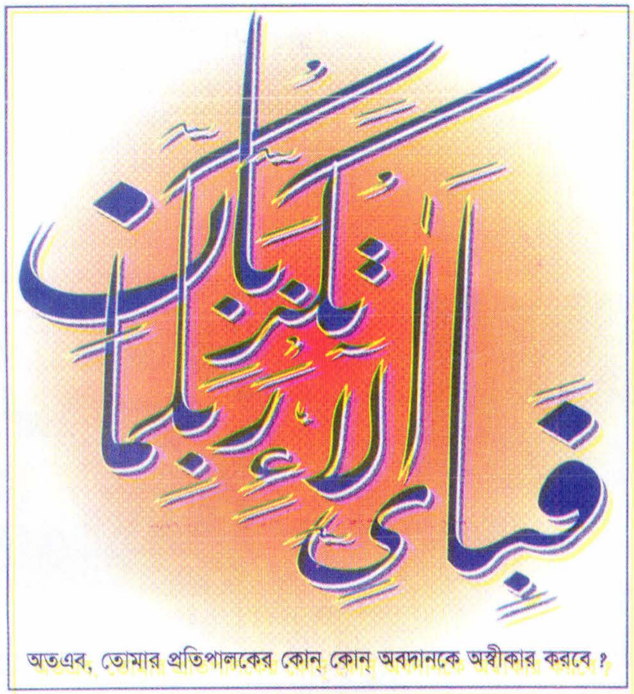

অতএব, তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

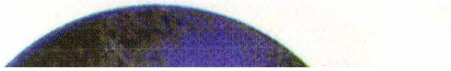

জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) : মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও এতে বিদ্যমান বস্তুসমূহ, যেমন - গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, ধূমকেতু, গ্রহাণু এবং ছায়াপথসমূহের গতিবিধি পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞানই হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা।

৩৩৫-৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব অ্যারিস্টটল (Aristotle) : এই গ্রীক পদার্থবিদ ও দার্শনিক পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে অভিহিত করেন। পনেরশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশ্বাসটি জনমনে প্রচলিত ছিল।

১৩৭-১৪৫ খ্রিষ্টাব্দ, টলেমী (Ptolemy) : এই গ্রীক জ্যোতির্বিদ ১০৮০ টি তারকার অবস্থান সনাক্ত করেন এবং তাদেরকে ৪৮টি নক্ষত্রপুঞ্জে বিভক্ত করেন। তাঁর বই 'Almagest' এ তিনি এটি প্রকাশ করেন। তিনি অ্যারিস্টটলের মতবাদকে ভিত্তি হিসেবে ধরেন এবং এটি এক হাজার চারশত বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৫৪৩ নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicholas Copernicus) (১৪৭৩-১৫৪৩) : এই পোলিশ জ্যোতির্বিদ তাঁর 'De Revolutionibus Orbium caelestium' বইটিতে সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে অভিহিত করেন।

১৫৯৬ টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) (১৫৪৬-১৬০১) : এই ড্যানিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৫৭৫ থেকে ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দৃশ্যমান তারকার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা থেকে ৭৭০টি তারকার সুস্পষ্ট অবস্থান সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

১৬০৮ প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র : জার্মান বিজ্ঞানী হ্যান্‌স লিপারসে (Hans Lippershey) (১৫৭০-১৬১৯) সামরিক কার্যে ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ : জার্মান জ্যোতির্বিদ ইয়োহানস্ কেপলার (Johannes Kepler) (১৫৭১-১৬৩০) গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণনের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহসমূহের বৃত্তাকার গতিপথের মতবাদটি ভুল প্রমাণিত হয়।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ : ইতালীয় বিজ্ঞানী এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহারকারী গ্যালিলিও (Galileo) (১৫৬৫-১৬৪২) বৃহস্পতির চন্দ্র আবিষ্কার করেন এবং সৌরকলংক (Sunspots) ও চাঁদের গর্ত সনাক্ত করেন। তিনি দেখান যে, শুক্র গ্রহ এবং চন্দ্র একই কলায় (সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বিবেচনা করে) অবস্থিত।

১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দ : ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন (Isaac Newton) (১৬৪২-১৭২৭) মহাকর্ষ সূত্র প্রকাশ করেন। এর ফলে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথম প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

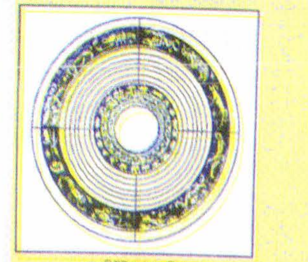
অ্যারিস্টটলের মহাবিশ্ব

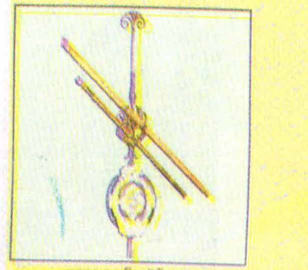
সপ্তদশ শতাব্দীর টেলিস্কোপ

বরাহমিহির ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত উপমহাদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির। 'বৃহৎ-সংহিতা' নামে একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

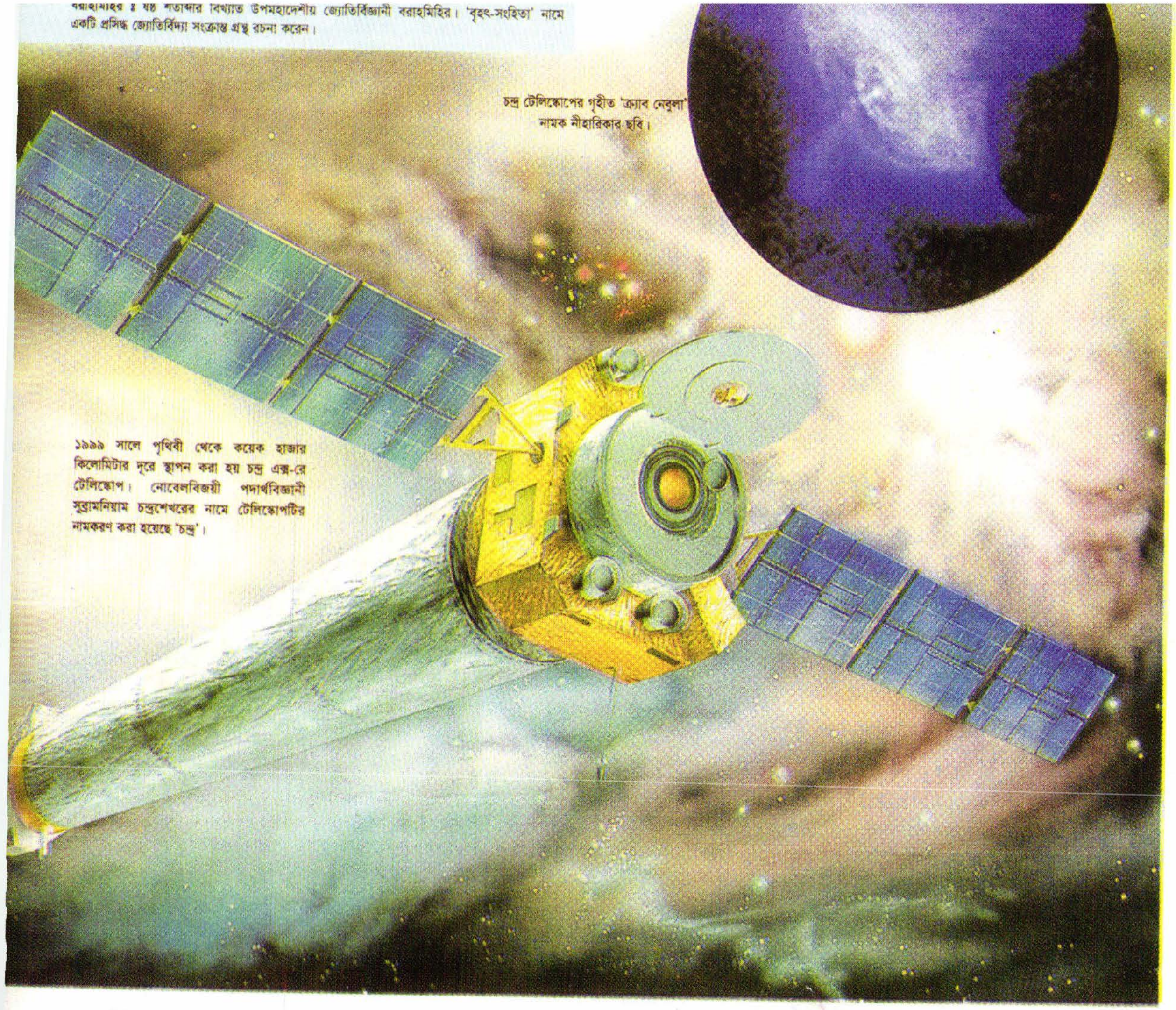

চন্দ্র টেলিস্কোপের গৃহীত 'ক্র্যাব নেবুলা' নামক নীহারিকার ছবি।

১৯৯৯ সালে পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে স্থাপন করা হয় চন্দ্র এক্স-রে টেলিস্কোপ। নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখরের নামে টেলিস্কোপটির নামকরণ করা হয়েছে 'চন্দ্র'।

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জার্মান সংগীতবিদ উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) (১৭৩৮-১৮২২) ইউরেনাস (Uranus) গ্রহটি আবিষ্কার করেন। এর ছয় বছর পর তিনি এই গ্রহের চারটি চাঁদের অস্তিত্ব বের করেন। তিনি যুগ্ম তারকা, (Binary Stars) অনেক নীহারিকা ও গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং অনেক ছায়াপথের অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জার্মান জ্যোতির্বিদ ইয়োহান গ্যালে (Johann Galle) (১৮১২-১৯১০) এবং হাইনরিখ ডি'এরেস্ট (Heinrich D'Arrest) (১৮২২-১৮৭৫) নেপচুন (Neptune) গ্রহ আবিষ্কার করেন।

১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ ঃ হার্ভার্ড মানমন্দির (Harvard Observatory, USA)-এ সর্বপ্রথম তারকার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জার্মান বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) (১৮৭৯-১৯৫৫) দেখান যে, ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। এই তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের উজ্জ্বলতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্যের ফিউশন (Fusion) প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন অণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ ঃ সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব (Expanding Universe) সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন আমেরিকার জ্যোতির্বিদ ভেস্তো স্লাইফার (Vesto Slipher) (১৮৭৫-১৯৬৯)।

১৯২৪-৩০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ স্বতন্ত্রভাবে মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang theory) প্রদান করেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী অ্যাবে লেমাতর (Abbe Lemaitre) (১৮৯৪-১৯৬৬) এবং রাশিয়ান বিজ্ঞানী এ. ফ্রিডম্যান (A. Friedmann) (১৮৮৮-১৯২৫)।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল (Edwin Hubble) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের স্বপক্ষে জোড়ালো প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান জ্যোতির্বিদ ক্লাইড টমবাফ (Clyde Tombaugh) প্লুটো (Pluto) গ্রহ আবিষ্কার করেন।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান প্রকৌশলী কার্ল জ্যান্স্কি (Karl Jansky) (১৯০৫-৫০) পৃথিবীর বাইরে বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। তার উদ্ভাবিত আকাশ-তার (aerial) ছায়াপথ হতে বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করেছিল।

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আমেরিকান বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) (জন্ম ১৯৩৩) এবং রবার্ট উইলসন (Robert wilson) (জন্ম ১৯৩৬) মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ আবিষ্কার করেন।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রী জোসেলিন বেল (Jocelyn Bell) (জন্ম ১৯৪৩) প্রথম পালসার (Pulsar) সনাক্ত করেন।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ ঃ জিওত্তো মহাকাশ যান (Giotto space probe) প্রথম ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের (হ্যালির ধূমকেতু) আলোকচিত্র প্রেরণ করে।

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ সর্বপ্রথম বৃহৎ প্রতিফলক টেলিস্কোপ, হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে স্থাপন করা হয়। এটির সাহায্যে মহাবিশ্বের পরিষ্কার আলোকচিত্র ধারণ করা হয়।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দ ঃ বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়।

হাবল টেলিস্কোপ

জিওত্তো মহাকাশ যান

মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের রেডিও এন্টেনা

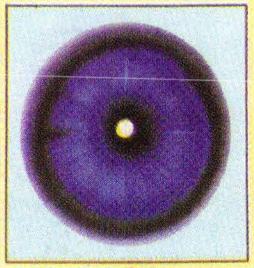

গ্রহজাত নীহারিকা

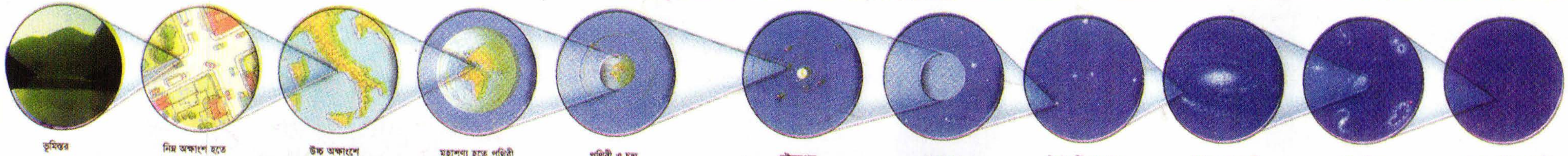

www.pathagar.org

তথ্য কণিকা
(Data Bank)

গ্যালাক্সির প্রকারভেদ : গ্যালাক্সি হলো অজস্র তারার পরিবারের মত। গ্যালাক্সি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমাদের মিল্কিওয়ে একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এছাড়াও উপবৃত্তাকার, অসম, বারড, ক্যানিবাল প্রভৃতি ধরনের গ্যালাক্সি রয়েছে।

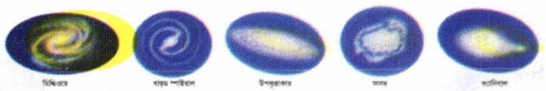

কোয়েসার পরিচিতি : কোয়েসার হচ্ছে দূরবর্তী গ্যালাক্সির প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এদের অভ্যন্তরে কৃষ্ণগহ্বর থাকে। আমাদের জানা মহাবিশ্বের দূরতম বস্তু হলো PC 1247+3106 নামের কোয়েসার, যা ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। প্রথম আবিষ্কৃত এবং নিকটতম কোয়েসার হলো 3C-273। এটি ২০০ কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত।

নিকটতম গ্যালাক্সিসমূহ			
গ্যালাক্সী	ধরন	ভর (বিলিয়ন সৌর ভর)	দূরত্ব (আলোকবর্ষ)
অ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda M31)	স্পাইরাল	৫০০	২,৫০০,০০০
মিল্কিওয়ে (Milky way galaxy)	স্পাইরাল	১৫০	০
ট্রায়াঙ্গুলাম (Galaxy in Triangulum M33)	স্পাইরাল	১০	২,৫০০,০০০
বৃহৎ ম্যাগিলান মেঘ (Large magellanic cloud)	অসম	১০	১৬০,০০০
এন. জি. সি ২০৫ (NGC 205)	উপবৃত্তাকার	১০	২,৫০০,০০০
এন.জি. সি ২২১ (NGC 221)	উপবৃত্তাকার	৩	২,৫০০,০০০
ক্ষুদ্র ম্যাগিলান মেঘ (Small magellanic cloud)	অসম	২	১৯০,০০০
এন.জি.সি ১৮৫ (NGC 185)	উপবৃত্তাকার	১	২,০০০,০০০
এন. জি. সি ১৪৭ (NGC 147)	উপবৃত্তাকার	১	১,৯২০,০০০

নিকটতম কোয়েসার 3C-273

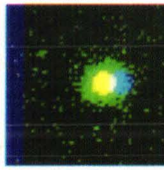

সূর্যের পরিসংখ্যান	
বয়স	৫০০ কোটি বছর
ব্যাস	১৩,৯২,০০০ কি.মি.
ভর	পৃথিবীর ৩,৩২,৯৪৬ গুণ
ঘনত্ব	পানির ঘনত্বের ১.৪১ গুণ
পৃথিবী থেকে দূরত্ব	১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কি.মি.
নিকটতম তারার দূরত্ব	৪০,০০০ বিলিয়ন কি.মি.
কেন্দ্রের তাপমাত্রা	১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস
পৃষ্ঠের তাপমাত্রা	৫,৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস
উজ্জ্বলতা	৩৯০ বিলিয়ন বিলিয়ন মেগাওয়াট
গতি	গ্যালাক্সিকে আবর্তন করতে ২৪ কোটি বছর লাগে

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সংক্রান্ত তথ্যাবলি	
বয়স	প্রায় ১১ বিলিয়ন বছর
তারকা সংখ্যা	২০০ বিলিয়ন
ব্যাস	১ লক্ষ আলোকবর্ষ
কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব	২৫,০০০ আলোকবর্ষ
সূর্যের কক্ষপথে আবর্তন কাল	২৪০ মিলিয়ন বছর

তারা পরিচিতি : তারা হচ্ছে বিশাল গোলকাকৃতির হাইড্রোজেন এর অগ্নিকুণ্ড। মহাকর্ষ বলের কারণে তারা স্থির থাকে। তারার অভ্যন্তরে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং এর ফলে প্রচুর তাপ ও আলোক শক্তি উৎপন্ন হয়।

"এস্কিমো নেবুলা" এক প্রকার গ্রহজাত নীহারিকা (Planetary Nebula)

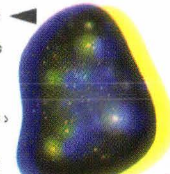

সবচেয়ে অনুজ্জ্বল তারা : RG 0058,8-207, এটি একটি বামনী তারা, এর উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতার ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

উজ্জ্বলতম সুপার নোভা : SN 1006, 1006 খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এটি দেখা গিয়েছিল। তারাটি এত উজ্জ্বল ছিল যে দিনের বেলাতেও দেখা যেত।

দ্রুততম পালসার : PSR 1937+214, যার ঘূর্ণন বেগ সেকেন্ডে ৬৪২ বার।

লোহিত বামন তারার ব্যাস : সূর্যের চেয়ে ১০০ গুণ পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে।

সুপার নোভার নির্গত শক্তি : সূর্যের ৯ বিলিয়ন বছরে নির্গত শক্তি সুপার নোভা নির্গত করে ১ মিনিটে।

রক্তিম দৈত্য (Red Giant) : যখন সূর্যের ন্যায় কোন তারকার হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘাটতি হয়, তখন এটির স্ফীতি ঘটে এবং এটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির শীতল তারকায় রূপান্তরিত হয়।

খোলা ঝাড় (Open Cluster) : গঠনশীল তারকার একটি দলকে খোলা ঝাড় বলা হয়।

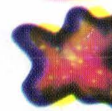

নীহারিকা (Nebula) : হাইড্রোজেন গ্যাস ও ধূলিকণার বিশাল মেঘপুঞ্জ থেকে তারকাসমূহ উৎপন্ন হয়। এ মেঘপুঞ্জকে বলা হয় নীহারিকা।

সুপারনোভা (Supernova) : প্রচণ্ড ভরের কোনো তারকার মৃত্যুর সময় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে এটির আকস্মিক সঙ্কোচন ঘটে। এর পরপরই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। একেই সুপারনোভা বলা হয়।

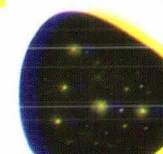

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকার একটি আবদ্ধ পুঞ্জে গ্যাস ও ধূলিকণা ঘনসংবদ্ধ থাকে এবং এটি দ্রুত চলে ও উত্তপ্ত হয়। এই আবদ্ধ পুঞ্জ একটি নতুন তারকায় পরিণত হয়।

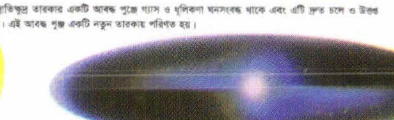

নিকটতম তারা (Nearest Stars)		
তারা (Star)	ধরণ (Star type)	পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে দূরত্ব (Distance) (আলোক বর্ষ)
সূর্য (Sun)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	০
প্রক্সিমা সেন্টারি (Proxima Centauri)	লোহিত বামন (Red dwarf)	৪.২
আলফা সেন্টারি A (Alpha Centauri A)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	৪.৩
আলফা সেন্টারি B (Alpha Centauri B)	কমলা প্রধান সারি (Orange main sequence)	৪.৩
বার্নার্ডের তারা (Barnard's Star)	লোহিত বামন (Red dwarf)	৫.৯
উলফ ৩৫৯ (Wolf 359)	লোহিত বামন (Red dwarf)	৭.৬
লুব্ধক A (Sirius A)	সাদা প্রধান সারি (White main sequence)	৮.৬
লুব্ধক B (Sirius B)	শ্বেত বামন (White dwarf)	৮.৬

উজ্জ্বলতম তারা (Brightest Stars)		
তারা (Star)	ধরণ (Star type)	পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে দূরত্ব (Distance) (আলোক বর্ষ)
সূর্য (Sun)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	০
লুব্ধক (Sirius)	সাদা প্রধান সারি (White main sequence)	৮.৬
অগস্ত্য (Canopus)	শ্বেত দৈত্য (White giant)	২০০
আলফা সেন্টারি (Alpha Centauri)	হলুদ প্রধান সারি (Yellow main sequence)	৪.৩
স্বাতী (Arcturus)	লোহিত দৈত্য (Red giant)	৩৬
অভিজিৎ (Vega)	সাদা প্রধান সারি (White main sequence)	২৬
ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	হলুদ দৈত্য (Yellow giant)	৪২
আর্দ্রা (Rigel)	নীল দৈত্য (Blue giant)	৯১০

সূর্যের পরিচিতি

সূর্যের পৃষ্ঠের ১ বর্গমিটার জায়গা ১০০ ওয়াট ক্ষমতার ৫ লক্ষ বৈদ্যুতিক বাল্বের উজ্জ্বলতা নিয়ে জ্বলে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, সূর্য এক সেকেন্ডে তার ৩৫ মিলিয়ন গুণ বেশি শক্তি নির্গত করে। সূর্যের চৌম্বক ঝড়ের কারণে পৃথিবীতে সম্প্রচারিত রেডিও সিগন্যাল ব্যাহত হয়। সূর্যের নিজ অক্ষে ঘূর্ণনকাল বিষুব অঞ্চলে ২৫ দিন এবং মেরুর কাছাকাছি ৩৫ দিন। সূর্যের অপেক্ষাকৃত শীতল বহিরাবরণ (করোনা) সরিয়ে ফেললে প্রবল বিকিরণে পৃথিবীর সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে।

তারকার মধ্যস্থ গ্যাসের প্রচণ্ড ভরের কারণে উৎপন্ন অভিকর্ষ বল গ্যাসকে কেন্দ্রমুখীভাবে আকর্ষণ করে কিন্তু আলো এবং বিকিরণজনিত চাপ গ্যাসকে কেন্দ্রমুখীভাবে উল্টা দিকে ঠেলা দেয়।

একটি তারকা পুরোপুরি গ্যাস দ্বারা তৈরি

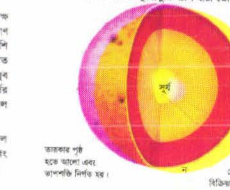

পদার্থবিদগণ চেষ্টা করছেন জানার জন্য যে, কিভাবে মহাবিশ্ব চলে, আর কেন এভাবেই চলে। তবে তৃতীয় উদ্দেশ্য কেন মহাবিশ্ব আছে, কেন এ মহাবিশ্ব, কেন মানুষ, কেন জীবজন্তু, কেন এত সব-এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না বিজ্ঞানের গবেষণাগারে। এ প্রশ্নের উত্তর জানতে তো মানুষ অনাদিকাল থেকেই আগ্রহী। কেন আমরা এখানে? কেন এই মহাবিশ্ব?

মহাবিশ্ব ও মানুষ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তার জবাব জানা গেছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে। বিজ্ঞান যা বলতে পারেনি, তা-ই আমরা অন্যত্র পেয়েছি। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর **জামাল নজরুল ইসলাম** বলেন -

"পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সেটা আমরা মাত্র গত কয়েক শতাব্দী ধরে জানি। মধ্যযুগের পর এই তথ্যটি উপস্থাপন করেন পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolas Copernicus) (১৪৭৩-১৫৪৩) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক De Revolutionibus Orbium Caelestium-এ (অর্থাৎ আকাশের ঘূর্ণায়মান বস্তুসমূহ)। এটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সনে, তাঁর মৃত্যুর বছরে। তারপরে ইতালীয় জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ জের্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno) (১৫৪৮-১৬০০) এবং গ্যালিলিও গ্যালিলাই (Galileo Galilei) (১৫৬৪-১৬৪২) আবার এই বিষয়টি উপস্থাপন করেন, এবার প্রকাশ্যে, কারণ কোপার্নিকাস তাঁর জীবনকালে তাঁর এই ধারণাটি প্রকাশ করেননি। তখন খ্রিষ্টান চার্চের ধারণা ছিল যে, আকাশের সবকিছু পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তাই এই কথাগুলি তাঁদের মনঃপুত হয়নি। এই কারণে ব্রুনোকে ১৬০০ সনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং গ্যালিলিওকে তাঁর এই তত্ত্বটিকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমশ এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য হয় এবং অবশেষে সম্পূর্ণ সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন গ্রীকদেশে এ ধারণাটি (অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে) কতিপয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্রস্তাব করেছিলেন। এ কথাটি প্রথম বলেছিলেন গ্রীক জ্যোতির্বিদ সেমসের অ্যারিস্টার্কাস (Aristarchus of Samos) প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০ সনে। তখনও আরেক দার্শনিক ক্লিয়ানথেস (Cleanthes) দাবি করেছিলেন যে, অ্যারিস্টার্কাসকে অসদাচরণের অপরাধে দণ্ডিত করা উচিত। কিন্তু পরে গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি (Ptolemy) (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) পৃথিবী-কেন্দ্রিক তত্ত্বটি এত ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন (অবশ্যই ভুলভাবে) যে, এটা প্রায় দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময় মেনে নেয়া হয়েছিল। মধ্যযুগে খ্রিষ্টান চার্চের গোঁড়ামি সক্রিয় ছিল এবং এই ভুল ধারণার জন্য তা অনেকটা দায়ী ছিল। পৃথিবীর নিজ অক্ষের (Axis) চারদিকে ঘোরার কারণে যে মনে হয় আকাশের বস্তুসমূহ চারদিকে ঘুরছে, এই তত্ত্বটি ভারতের জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ আর্যভট্ট দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হয় প্রায় ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। যে ধরনের গণিত জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাথমিকভাবে ব্যবহার হয় সেটাতে অবদান রাখেন আর্যভট্ট এবং অন্য এক ভারতীয় গাণিতিক ভাস্করাচার্য (জন্ম ১১১৪ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রাচীন গ্রীক দেশের এবং প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শনের বহনকারী (Transmitters) হিসাবে এবং নিজস্ব অবদানের জন্য (জ্যোতির্বিদ্যায়ও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ইসলামের চিন্তাবিদরা। যেমন আল-খাওয়ারজমী (নবম শতাব্দী), ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), ইবনে হাইথাম ইত্যাদি। কিন্তু চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে সম্ভবত ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির কারণে ইসলামের চিন্তাবিদরা বিজ্ঞানে ও দর্শনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেননি। তখন থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় এবং সাধারণ বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা।

কোপার্নিকাস অ্যারিস্টার্কাসের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অ্যারিস্টার্কাসের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আশ্চর্যজনক।

আইজাক নিউটনের (Isaac Newton) (১৬৪২-১৭২৭) আবির্ভাব বিজ্ঞান তথা মানব চিন্তার অগ্রগতির জন্য একটি বিরল ঘটনা। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী এবং যুগান্তকারী, মানব সভ্যতার জন্য পথ-নির্দেশক। পৃথিবীর এবং বিশ্বের প্রক্রিয়াসমূহ যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক নিয়মানুযায়ী চলে সম্ভবত নিউটনের অবদানের পরেই এটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য গত এক শতাব্দীতে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে এবং বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'নিউটনীয় বিপ্লব' ও প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন।

মাধ্যাকর্ষণ বল সবসময়ে সক্রিয় থাকে এবং এই কারণে প্রমাণ করা যায় যে, অন্য কোন বস্তুকে যেটা সূর্যের তুলনায় অনেক ছোট, যদি আমরা যথেষ্ট গতিবেগ দেই (Give it sufficient velocity) তাহলে হয়ত সেটা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব থেকে অবশেষে মুক্ত হয়ে দূরে চলে যাবে, অথবা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরবে যতদিন সূর্য থাকবে। সর্বদা বিদ্যমান ও সক্রিয় মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া এই চারদিকে ঘোরার জন্য অন্য কোন অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন হয় না (It does not require any additional force)। এটা নিউটনের গতিসূত্রের একটা পরিণাম, যেটা সঠিকভাবে প্রমাণ করতে হলে কিছু গণিতের প্রয়োজন। গণিতের যে অংশটিকে Differential Calculus বলা হয় সেটার দ্বারা সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই গাণিতিক পদ্ধতি নিউটন স্বয়ং আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য জার্মান দার্শনিক ও গাণিতিক লাইবনিজও (Gottefried Wilhelm Leibniz) (১৬৪৬-১৭১৬) স্বাধীনভাবে Differential Calculus আবিষ্কার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গণিতের যে বিষয়কে আমরা Intergral Calculus বলি, যেটা এক অর্থে এর সম্পূরক, সেটার কিছুটা আভাস ছিল প্রাচীন গ্রীক গাণিতিক আর্কিমিডিসের (Archimedes, প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২ সন) কাজে। (আর্কিমিডিসের পিতা ছিলেন জ্যোতির্বিদ ফেইডিয়াস, Pheidias)।

গ্রহাদির কক্ষপথে উপবৃত্তাকার ঘোরা মাধ্যাকর্ষণ সূত্র থেকে Differential Calculus ছাড়া জ্যামিতিক পদ্ধতিতেও (Geometrical Method) প্রমাণ করা যায়।

যেটা নিউটন তাঁর বিখ্যাত বই Principia তে ব্যাখ্যা করেও ছিলেন। গ্রহগুলির কক্ষপথ যে উপবৃত্তাকার, সেই তথ্যটি নিউটনের আগে থেকে জানা ছিল। এটা যৌথভাবেই নিরীক্ষা দ্বারা (Observation) আবিষ্কার করেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) (১৫৪৬-১৬০১) এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা জার্মান বিজ্ঞানী জোহানেস্ কেপলার (Johannes Kepler) (১৫৭১-১৬৩০)। টাইকো ব্রাহের নিরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ করে কেপলার গ্রহগুলির কক্ষপথ সম্পর্কে তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন যেগুলিকে কেপলারের গ্রহের গতিবেগ সূত্র (Kepler's Laws of Planetary Motion) বলা হয়। পরবর্তীকালে নিউটন প্রমাণ করেন যে, কেপলারের গ্রহের গতিবেগ সূত্রসমূহ তাঁর মাধ্যাকর্ষণ সূত্রেরই ফলাফল অথবা পরিণাম।

নিউটনের গতিসূত্রের এবং বলবিদ্যা অথবা গতিবিদ্যার (Dynamics and Mechanics) পেছনে বিরাট অবদান রয়েছে গ্যালিলিওর। গ্যালিলিওর মৃত্যু এবং নিউটনের জন্ম একই সনে হয় (১৬৪২)। নিউটন বলেছিলেন, যদি আমি অন্যদের থেকে দূরে দেখতে পেয়ে থাকি, সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, আমি কতিপয় দৈত্যের কাঁধে চড়েছিলাম (If have been able to see further than any one else this is because I have stood on the shoulders of giants)। যে 'দৈত্যের' কথা নিউটন চিন্তা করেছিলেন তাঁদের নাম (জানা মতে) তিনি উল্লেখ করেননি। সম্ভবত তাঁরা ছিলেন আর্কিমিডিস (Archimedes), গ্যালিলিও (Galileo), টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe), কেপলার (Kepler) ও কোপার্নিকাস (Copernicus)।

উপরে দেখা গেলো, বিজ্ঞান এক স্থানে বসে নেই। মত ও তত্ত্বের পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানের এ হলো সীমাবদ্ধতা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে, কুরআন সেই ৭ম শতাব্দীতে বলছে "সূর্য তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত। ইহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত ব্যবস্থা।" (সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৮)। "তিনি (আল্লাহ্) চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত" (সূরা লোকমান, আয়াত : ২৯)। "আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস, চন্দ্র ও সূর্য; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণশীল।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৩) "সূর্যের সাধ্য নাই চন্দ্রকে সীমার মধ্যে পায়, রাত্রির সাধ্য নাই দিবসকে অতিক্রম করে। প্রত্যেকে স্ব-স্ব কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমান" (সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৪০)। সূরা আর-রা'দ, আয়াত : ২, সূরা ফাতের, আয়াত : ১৩ ও অন্যান্য আয়াতেও এমনি বক্তব্য রয়েছে।

কুরআন বলে- "এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতির্ময় আর সূর্যকে করেছেন প্রদীপ্ত উজ্জ্বল।" (সূরা নূহ, আয়াত : ১৬)। "কত মহান তিনি, যিনি আকাশে সংস্থাপন করেছেন দুর্গ এবং তার মধ্যে স্থাপন করেছেন প্রদীপ সদৃশ সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র" (সূরা আল-ফোরকান, আয়াত : ৬১)। একটি বিকিরণ করে অন্যটি প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরনের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিকগণ জেনেছেন টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতকের দিকে।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সম্পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্তে। এক্ষেত্রে কুরআনে এসেছে স্বয়ং স্রষ্টা থেকে জ্ঞানের এমন কিছু তথ্য, যা মানুষ পূর্বে জানত না। এটিও স্রষ্টার প্রমাণের একটি দলিল ছাড়া আর কী?

A. Cracy Morrison (এ ক্র্যাসি মরিসন) নামে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছেন যে, অলঙ্ঘনীয় গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্ব একজন 'সুপারহিউম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিয়াস (প্রকৌশলী প্রতিভাবান অতিমানব) দ্বারা পরিকল্পিত এবং পরিচালিত।

সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ও কুরআন মজীদ

মরিস বুকাইলী লেখেন, "মহাবিশ্ব যে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অধুনা এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। তবে, কিভাবে যে মহাবিশ্বের সেই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে, তা নিয়ে এখনো ইতস্তত কিছু কিছু মতভেদ রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সর্বজন-পরিচিত আপেক্ষিক থিওরিতে প্রথম উল্লেখিত হয়। যেসব পদার্থবিজ্ঞানী ছায়াপথের আলোক-রশ্মির বর্ণালীবিভা সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় নিরত ছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাও মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সমর্থন করেছেন।

ড. স্টিফেন ডব্লিউ হকিং-এর "এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম" পুস্তকে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় কোরআন মজীদ বলে,

"আমি (আল্লাহ্) আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই এটিকে সম্প্রসারণ করেছি।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৪৭)।

এক্ষেত্রে ড. মরিস বুকাইলীর ব্যাখ্যা হলো- কুরআনে সম্প্রসারণ অর্থে "মুসি'উনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা বহুবচন ও বর্তমান কালবাচক। মূল ক্রিয়া হলো "আউসা'আ", যার অর্থ হলো-প্রসারণ করা, আরো প্রশস্তকরণ, বিস্তারিত করা, সম্প্রসারণ করা।

উল্লেখ্য যে, ১৯২৯ সালে বৈজ্ঞানিক হাবল ঘোষণা করেন যে, 'গ্যালাক্সি' (ছায়াপথ)সমূহ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি হিসাব কষে দেখলেন যে, ১৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে যখন 'বিগ ব্যাং' (বৃহৎ বিস্ফোরণ) হয়, তখন সূর্য, তারকা, ছায়াপথ, আকাশ, পৃথিবী কিছুই ছিল না এবং সেই থেকে সৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আইনস্টাইন স্থির বিশ্বের কথা বলেছিলেন। তবে হাবলের পূর্বে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রুশ পদার্থবিদ আলেকজান্ডার এ. ফ্রিডম্যান বিশ্ব সম্পর্কে তিনটি মডেল উত্থাপন করেন। এর পরপরই বেলজীয় জ্যোতির্বিদ Georges Lemaitre বলেন যে, বিশ্ব ছিল প্রথমে খুবই ঘন ও উত্তপ্ত "Primeval atom" (মৌল অণু)।

বিশ্ব সৃষ্টি হয় এই মৌলিক অণুর ভীষণ বিস্ফোরণে অর্থাৎ "বিগ ব্যাং" ঘটনার পর।

১৯৪৮ সালে তিনজন ব্রিটিশ তত্ত্ববিদ Herman Bondi, Thomas Gold ও Fred Hoyle হাবলের বিশ্ব সম্প্রসারণের তত্ত্বকে ঠিক রেখে the steady state theory (স্থির দশা তত্ত্ব) প্রদান করেন এবং বলেন যে, বিশ্বের কোন সূচনা বা শেষ নেই। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে George Gamow 'বিগ ব্যাং' কালীন সময়ের সেই অতি ঘন ক্ষুদ্র অগ্নিবলয়ের তাপের পরিমাণ কষে দেখালেন এবং বললেন যে, 'বিগ ব্যাং'-এর পরে তাপ হ্রাসের পরবর্তী অবস্থা যাকে নামকরণ করা হয় 3K Background Radiation তার ছিটেফোঁটা এখনও বিশ্বে রয়েছে। ১৯৬৫ সালে Arno Penzias and Robert Wilson (যারা আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের পদার্থবিদ ছিলেন) 3K background radiation তাদের যন্ত্রে ধরেন। এই পর্যবেক্ষণ স্টিডি স্টেট থিওরি'র সলিল সমাধি রচনা করে এবং 'বিগ ব্যাং' থিওরিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। 'বিগ ব্যাং-এর পরে বিভিন্ন পর্যায়ে ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী, সূর্য, গ্রহাদি, চন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে।

বিশ্বসংকোচন ও কুরআন মজিদ

"মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে বিরাট আয়তন প্রাপ্ত হবে এবং তারপর আবার চুপসে যাবে। সেটি দেখাবে অনেকটা বাস্তবকালের অনন্যতার মতো। সুতরাং এক অর্থে কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) থেকে দূরে থাকলেও আমাদের সবার মৃত্যু অবধারিত (মহাবিশ্ব সঙ্কোচনের ফলে)"। (পৃষ্ঠা-১৪৭, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম)

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে মনে হয়, বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন বিশ্ব যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি এক সময় সঙ্কুচিত হবে- তার অবস্থানগত কারণেই। কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত এ প্রসঙ্গে যা বলে, তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে। কুরআন বলে, "সেদিন (রোজ কিয়ামতে) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৪)

"কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাতের মুঠোয় থাকবে ও আকাশগুলো গুটিয়ে থাকবে তাঁর ডানহাতে।" (সূরা যুমার, আয়াত : ৬৭)।

"সূর্য যখন গুটানো হবে, নক্ষত্র যখন খসে পড়বে, পাহাড়গুলো যখন সরানো হবে,......." (সূরা তাকবীর, আয়াত : ১-৩)

"সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসবে?' যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র করা হবে -সেদিন মানুষ বলবে,'আজ পালাবার স্থান কোথায়?' না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।" (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ৬-১১)।

"নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে.....।" (সূরা মুরসালাত, আয়াত : ৭-১০)।

"অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন আকাশ থেকে ধোঁয়া নেমে এসে মানব জাতিকে গ্রাস করবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি।" (সূরা দুখান, আয়াত : ১০-১২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে প্রতীয়মান হবে যে, বৈজ্ঞানিকদের ধারণার মতো মহাবিশ্বকে প্রলয়ের সময় গুটানো হবে। মহাবিশ্ব সঙ্কোচিত হবে ও মানুষ ভীষণ বিপদে নিপতিত হবে। ডঃ হকিং তো বলেছেন যে, বিশ্ব চুপসে গেলে বা সঙ্কোচিত হলে "আমাদের সবার মৃত্যু অবধারিত" (পৃষ্ঠা-১৪৭, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম)। উপরোক্ত আয়াতগুলি নিয়ে কোন পদার্থবিদ বা জ্যোতির্বিদ গবেষণা করলে আরো নতুন, চমকপ্রদ তথ্য পেতে পারেন।

কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম,
যিনি মহিমাময় ও মহানুভব
সূরা আর রাহমান: ৭৮

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। এ তত্ত্বে তিনি মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণযোগ্য ধর্মাবলীর পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক বর্ণনা দেন। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ যদি মহাবিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তবে তা পর্যবেক্ষকের গতি নিরপেক্ষ হবে। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এরূপ ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করে, যদিও এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন পর্যবেক্ষকের গতি অপরিবর্তিত থাকে। পর্যবেক্ষকের পরিবর্তিত গতিবেগের জন্য তার উপর একটি বাহ্যিক বল ক্রিয়াশীল হবে এবং এই পরিস্থিতিকে ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তার ব্যাপক আপেক্ষবাদ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

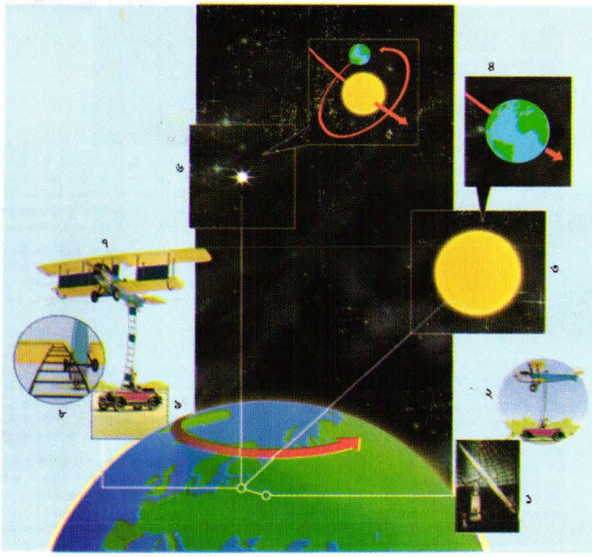

ভেতরে কোন যাত্রীর কাছে এ রেলগাড়ির মেঝেতে গাড়ির সমবেগে গতিশীল একটি বলকে স্থির মনে হবে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, কোন পরম প্রসঙ্গ কাঠামোর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ, এমন কোন প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া যাবে না, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে স্থির। আগে মনে করা হতো পৃথিবী একটি পরম প্রসঙ্গ কাঠামো। কিন্তু এখন আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এমনকি সূর্যও স্থির নয়। বর্তমানে, বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আমাদের গ্যালাক্সিসমূহও মহাশূন্যে চলমান। সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্বের কোথাও কোন পরম স্থির বিন্দু নেই, যেখান থেকে সকল পর্যবেক্ষণসমূহ করা সম্ভব।

আপেক্ষিকতার নীতি আরো বলে যে, এমন কোন পরীক্ষণের অস্তিত্ব নেই যা কিনা পর্যবেক্ষণকারীকে বলতে পারে যে- মহাশূন্যে তার পরম গতি কী? বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতিটি হল- "যদিও সমস্ত গতি পর্যবেক্ষণ বিন্দুর ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু আলোর গতি সর্বত্রই সমান বা ধ্রুব।" ১৮৯০ সালের কতকগুলি পরীক্ষণের (মাইকেলসন/মর্লির পরীক্ষা) মাধ্যমে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব 'ইথার'-এর ধারণাকে বাতিল করে 'স্থান-কাল' (Space-time) এর ধারণা প্রচলন করে।

এ দু'টি নীতি থেকে দেখানো যায় পরস্পরের সাপেক্ষে আপেক্ষিক গতিতে চলমান পর্যবেক্ষকদের নিকট একই বস্তুর দৈর্ঘ্য, গতিবেগ, সময়ের ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। প্রথমটি হল কোন বস্তুই আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে চলাচল করতে পারে না। দ্বিতীয়টি হল, কোন বস্তুর ভর আর শক্তি আসলে একই। ভর হল শক্তির সংহত রূপ। শক্তি হল ভরের বিযুক্ত বা অসংহত রূপ। কাজেই ভর ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। ভর-শক্তির সমতুল্যতার এই নীতি আইনস্টাইন তার বিশ্ববিখ্যাত $E=mc^2$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করেন। ভর-শক্তির সমতুল্যতার এ নীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ- নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়ায় (তারকাসমূহের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিক্রিয়া) ক্ষুদ্র পরিমাণের ভর বৃহৎ পরিমাণের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও এ শক্তিই তারকাসমূহের জ্বলন এবং সূর্যের তাপ বিকিরণের জন্য দায়ী, যা কিনা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে এবং পৃথিবীকে আমাদের জীবনধারণের উপযোগী রাখে।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে পর্যবেক্ষকের গতি তার পর্যবেক্ষণ বিন্দুর সাপেক্ষ। চলন্ত একটি গাড়ি থেকে চলন্ত একটি উড়োজাহাজে সিঁড়ি বেয়ে যে ব্যক্তি উঠে তার কাছে উড়োজাহাজটিকে স্থির মনে হয়। কিন্তু মাটিতে অবস্থানকারী কোন পর্যবেক্ষকের নিকট ঐ ব্যক্তি এবং উড়োজাহাজ উভয়কেই গতিশীল মনে হবে। সূর্য-৩ এ কেন্দ্র করে সূর্যের গতিও দেখতে পাবে।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের অবতারণা করেন এবং এ সময়েই এ তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। এ তত্ত্ব অনুসারে, যে সব প্রসঙ্গ কাঠামো একে অপরের সাপেক্ষে স্থির সমবেগে চলছে অর্থাৎ জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ যে সকল সমীকরণের মাধ্যমে এই নিয়মগুলোকে প্রকাশ করা হয়, সে সকল সমীকরণের রূপ সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে একই রকম। আইনস্টাইন তাঁর এ যুগান্তকারী কাজকে সে সকল প্রসঙ্গ কাঠামোর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে চান, যারা পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে না থেকে ত্বরিত গতিতে আছে, অর্থাৎ এ সকল প্রসঙ্গ কাঠামোর আপেক্ষিক বেগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাধারণীকরণের মাধ্যমে আইনস্টাইন মহাকর্ষ বলের জন্যেও একটি নতুন এবং সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করলেন। এখন পর্যন্ত এ তত্ত্ব সবচেয়ে সফল তত্ত্ব বলে প্রমাণিত।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে সমতুল্যতার নীতি। এ নীতি অনুসারে পৃথিবী স্থানীয়ভাবে সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি প্রসঙ্গ কাঠামো এবং মহাকাশে (যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র অনুপস্থিত) অভিকর্ষ ত্বরণে ঊর্ধ্বগামী একটি প্রসঙ্গ কাঠামো সমতুল্য।

এর অর্থ এ প্রসঙ্গ কাঠামো দু'টিতে অবস্থানকারী পর্যবেক্ষকদ্বয় যে কোন পরীক্ষণের সমতুল্য ফলাফল পাবেন এবং তাদের পক্ষে প্রসঙ্গ কাঠামোদ্বয়ের পার্থক্য করা অসম্ভব।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে সময় কোন বিচ্ছিন্ন স্থানাঙ্ক নয় বরং এটি অপর তিনটি স্থান জাতীয় স্থানাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত। এ মহাবিশ্বে যা কিছুই গতিশীল তাই স্থান-কালের সম্মিলিত এ ক্ষেত্রে জিওডেসিক নামক সরল রেখায় চলে। জিওডেসিক সরলরেখা কিন্তু স্থান-কালের এই ব্যাপ্তি বক্র। এ বক্রতার উৎস হল বৃহৎ পরিমাণে উচ্চভরসম্পন্ন বস্তু অর্থাৎ গ্রহ, তারা, নক্ষত্র ইত্যাদি। এ ক্রিয়ার একটি উদাহরণ হল মহাকর্ষীয় লেন্স, যে প্রক্রিয়ায় বহু দূরে অবস্থিত একটি "কোয়েসার"এর প্রতিবিম্ব, মধ্যবর্তী কোন গ্যালাক্সী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে দুই বা তার চেয়ে বেশী অংশে বিভাজিত অবস্থায় দেখা যায়।

বলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বস্তুর নিকটে ছোট একটি বস্তুর জিওডেসিক বরাবর গতি বড় বস্তুর দিকে হয়। অর্থাৎ মহাকর্ষ বল আকর্ষণধর্মী এবং ক্ষুদ্র বস্তুর ত্বরণ বৃহৎ বস্তুর দিকে।

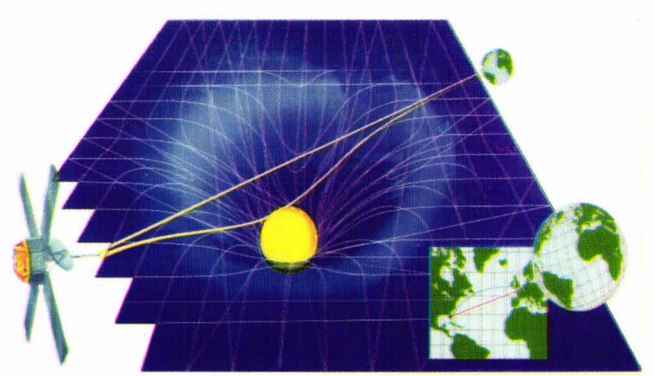

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে সূর্য স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। এ জন্য সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়া রেডিও সিগন্যালের গতি কমে যায়। এই ফলাফল NASA দ্বারা পরিক্ষিত হয়েছে যখন তা ১৯৭০ সালের মধ্যভাগে মঙ্গলগ্রহে মহাশূন্যযান পাঠায়। যখন মঙ্গলগ্রহ সূর্যের দূরবর্তী প্রান্তে ছিল তখন NASA এবং মহাশূন্য যানগুলো সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়া রেডিও সিগনাল পর্যবেক্ষণ করে। পরীক্ষণে দেখা যায় রেডিও সিগন্যাল পৃথিবীতে পৌঁছতে ১০০ মাইক্রোসেকেন্ড অতিরিক্ত সময় নেয়। ইউরোপ হতে উত্তর আমেরিকা যাওয়ার ক্ষুদ্রতম পথ দ্বিমাত্রিক একটি মানচিত্রে সরলরেখা মনে হবে। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী-ত্রিমাত্রিক, সেহেতু প্রকৃত পথ বাঁকা হবে। একই ঘটনা ঘটে যখন স্থান-কালের ক্ষেত্র দিয়ে বস্তু এবং বিকিরণ গতিশীল হয়। যদিও মনে হয় তারা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রে বক্র পথে চলে।

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য"
সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০

নিউট্রন তারকা, পালসার এবং কৃষ্ণ বিবর
NEUTRON STARS, PULSARS AND BLACK HOLES

একটি তারকাকে স্থিতাবস্থায় রাখে এর কণিকাগুলির মহাকর্ষ বল এবং নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির ভারসাম্য। কিন্তু ফিউশন বিক্রিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তারাটি মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সঙ্কুচিত হয়ে নিউট্রন তারকা অথবা কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয়।

নিউট্রন তারকা হলো বৃহৎ কোন তারা অবশেষ মাত্র। নিউট্রন তারকাসমূহের ভর সাধারণত সূর্যের দেড় গুণের বেশি। কিন্তু এদের গঠন উপাদানগুলো এত ঘনীভূত অবস্থায় যে এ প্রকার তারকার ব্যাস হয় মাত্র ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার। পালসার হলো দ্রুত ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকা। ১৯৬০ সালে জোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রী জোসেলিন বেল প্রথম পালসারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পালসারের কার্যক্রম অনেকটা সমুদ্র জাহাজকে পথ নির্দেশক বাতিঘরের মত। যখন এ ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকার চৌম্বক মেরু আমাদের দৃশ্যপটের সরলরেখায় আসে তখনই আমরা এর বিকীর্ণ শক্তি দেখতে পাই। অন্য সময় পাই না।

সুপার নোভা বিস্ফোরণের পর নিউট্রন তারকাগুলো অতি উচ্চবেগে ঘুরতে থাকে। সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন পালসারকে মিলিসেকেন্ড পালসার বলে এবং এরা প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বার আবর্তিত হয়।

ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রমনিয়াম চন্দ্রশেখর গণিতের সাহায্যে সর্বপ্রথম দেখান যে, কোন তারকার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হলে তার অন্তিম পরিণতি হিসেবে এটি ব্ল্যাকহোল কিংবা নিউট্রন তারায় পরিণত হতে পারে। সৌরভরের এই সীমা চন্দ্রশেখরের সীমা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয় কৃষ্ণ বিবরে (Black Hole) এ পরিণত হওয়ার জন্য তারার ভর হওয়া প্রয়োজন ৩.২ সৌরভরের চেয়ে বেশি। এই সীমাকে বলা হয় ওপেনহাইমার-ভলকফ (Oppenheimer-volkoff) সীমা। যখন ৩.২ সৌরভরের চেয়ে বেশি ভরবিশিষ্ট কোন তারার নিউক্লিয়ার ফিউশন জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, তখন তা সঙ্কুচিত হয়ে অসীম ঘনত্বের একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই বিন্দুর নাম সিঙ্গুলারিটি (Singularity)। এই বিন্দুর চারপাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য থেকে কোন কিছুই (এমনকি আলো) বের হতে পারে না। এরই নাম ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণবিবর। কৃষ্ণবিবরের সীমানাকে বলা হয় হরাইজন (Horizon)।

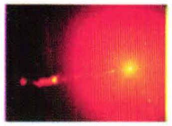

কেন্দ্রের সাদা অংশটি উপবৃত্তীয় গ্যালাক্সি M৮৭ এর অন্তর্গত। এটি একটি সাধারণ উপবৃত্তীয় গ্যালাক্সি হতে ৩০০ গুণ বেশি তারকা ঘনত্ব নির্দেশ করে। জোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা ২.৬ মিলিয়ন সৌরভর বিশিষ্ট কোন একটি কৃষ্ণ বিবর (Black hole) তারকাগুলোকে ধরে রেখেছে।

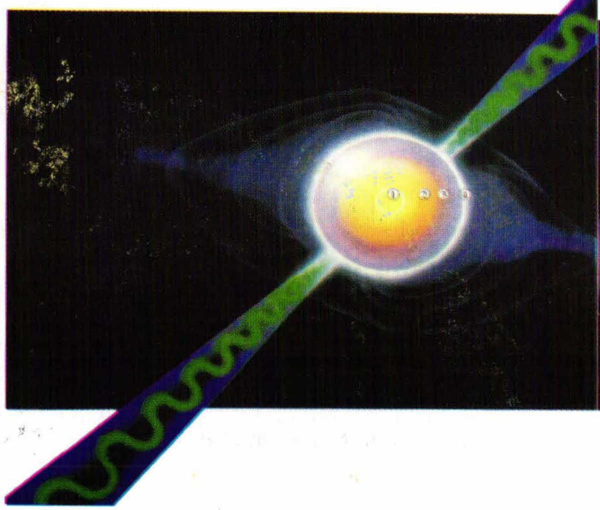

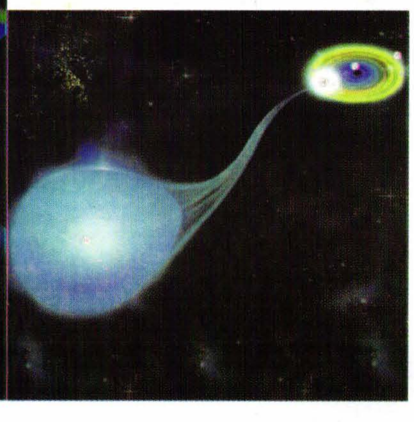

1. Supergiant star (অতিদানব তারকা)
2. Black hole (কৃষ্ণবিবর)
3. Accretion disk (বর্ধিত চাকতি)
4. Hot spot (উষ্ণ স্থান)

একটি নীল বর্ণের অতি বৃহৎ তারকা কৃষ্ণ বিবরের (x-1) এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারকাটির বহির্ভাগ ধীরে ধীরে কৃষ্ণবিবরের বর্ধিতাংশের সংস্পর্শে আসছে। এ সংস্পর্শ স্থানটির তাপমাত্রা অতি উচ্চ এবং এটি থেকে X-Ray নির্গত হয়, যা আমাদের পৃথিবী হতেও অবলোকন করা যায়।

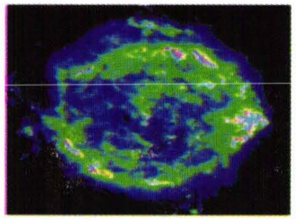

সুপারনোভা ক্যাসিওপিয়া A এর অবশেষের একটি চিত্র। এটি ৩০০ বছর আগে বিস্ফোরিত হয় এবং তা আজো মহাকাশের অন্যতম শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ উৎস। নীলাভ জায়গাগুলো সর্বাধিক বিকিরণকে নির্দেশ করে।

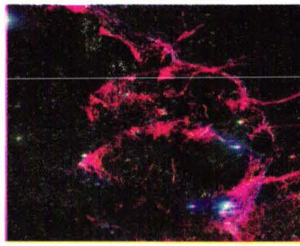

এটি ভেলা সুপারনোভার অবশেষের একটি চিত্র। চিত্রে সুপারনোভাটির একটি ক্ষুদ্র অংশকে দেখানো হয়েছে। ধারণা করা হয়, আজ হতে প্রায় ১২০০০ বছর পূর্বে সুপারনোভাটি সৃষ্টি হয়েছিল। একেবারে মাঝামাঝি পালসার ০৮৩৩-৪৫ অবস্থিত, যাকে সুপারনোভা সৃষ্টিকারী তারকাটির অবশেষ হিসেবে মনে করা হয়।

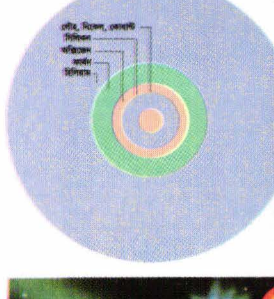

যখন একটি অতি বড় তারকা তার জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন এর কেন্দ্রীয় অংশের বিভিন্ন স্তরে ফিউশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। হাইড্রোজেন ফিউশন হিলিয়াম সৃষ্টি করে। হিলিয়াম ফিউশন সৃষ্টি করে কার্বন এবং অক্সিজেন। কার্বন ফিউশন নিয়ন ও ম্যাগনেসিয়াম তৈরি করে এবং অক্সিজেন ফিউশন তৈরি করে সিলিকন ও সালফার। সবশেষে সিলিকন ও সালফার ফিউশন লৌহ সৃষ্টি করে। লৌহের ফিউশনের জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় বলে লৌহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায়।

কোন তারকার ভর চন্দ্রশেখর সীমার (১.৪ সৌরভর) বেশি হলে তা বিস্ফোরণ সহকারে সুপারনোভা সৃষ্টি করে এবং এর বহিঃস্থাংশের বস্তুসমূহকে শূন্যে নিক্ষেপ করে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কেন্দ্রীয় অংশ খুবই ছোট এবং উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন নিউট্রন তারকার সৃষ্টি করে। যখন তারকা সুপারনোভায় পরিণত হয়, তখন এর উজ্জ্বলতা ১০৮ গুণ বৃদ্ধি পায়, যা মাত্র কয়েকদিন বিদ্যমান থাকে।

"তোমাদের জন্য (আল্লাহ) অধীনস্থ করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজি তাঁর হুকুমের অধীন। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা জ্ঞানী।"
সূরা নহল, আয়াত : ১২

www.pathagar.org

তারকা, গ্যালাক্সি ও সূর্য
STARS, GALAXIES AND SUN calender 2003

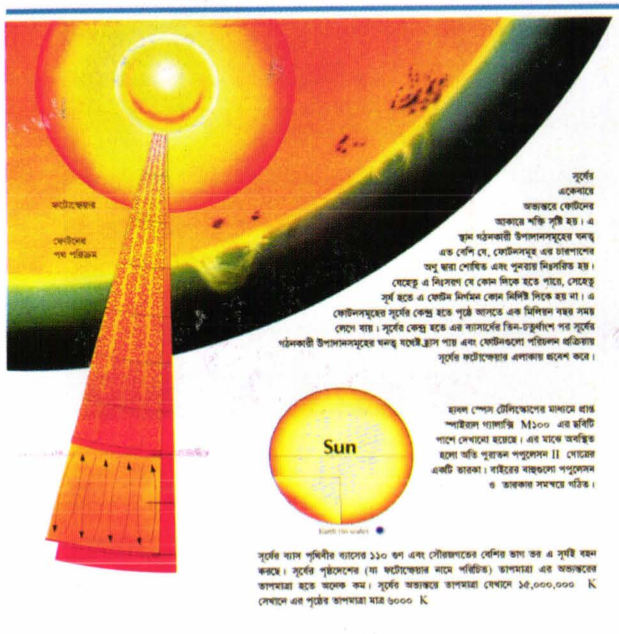

সূর্যের একেবারে অভ্যন্তরে ফোটনের আকারে শক্তি সৃষ্টি হয়। এ স্থান গঠনকারী উপাদানসমূহের ঘনত্ব এত বেশি যে, ফোটনসমূহ এর চারপাশের অণু দ্বারা শোষিত এবং পুনরায় নিঃসরিত হয়। যেহেতু এ নিঃসরণ যে কোন দিকে হতে পারে, সেহেতু সূর্য হতে এ ফোটন নির্গমন কোন নির্দিষ্ট দিকে হয় না। এ ফোটনসমূহের সূর্যের কেন্দ্র হতে পৃষ্ঠে আসতে এক মিলিয়ন বছর সময় লেগে যায়। সূর্যের কেন্দ্র হতে এর ব্যাসার্ধের তিন-চতুর্থাংশ পর সূর্যের গঠনকারী উপাদানসমূহের ঘনত্ব যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ফোটনগুলো পরিচলন প্রক্রিয়ায় সূর্যের ফটোস্ফেয়ার এলাকায় প্রবেশ করে।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্পাইরাল গ্যালাক্সি M১০০ এর ছবিটি পাশে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে অবস্থিত হলো অতি পুরাতন পপুলেশন II থেকে একটি তারকা। বাইরের বাহুগুলো পপুলেশন ও তারকার সমন্বয়ে গঠিত।

সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ এবং সৌরজগতের বেশির ভাগ ভর এ সূর্যই বহন করছে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের (যা ফটোস্ফেয়ার নামে পরিচিত) তাপমাত্রা এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা হতে অনেক কম। সূর্যের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা যেখানে ১৫,০০০,০০০ K সেখানে এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাত্র ৬০০০ K

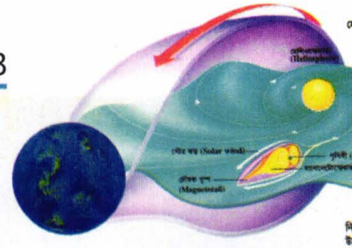

হেলিওস্ফেয়ার (Heliosphere) হলো সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রকে আবদ্ধ করে রাখা একটি কাল্পনিক ক্ষেত্র। এটি সৌরজগৎকে মহাজাগতিক বিকিরণ (Cosmic Radiantion) হতে রক্ষা করে।

এ চিত্রটি সূর্যের ফটোস্ফেয়ারের বিভিন্ন স্থানের পোলারিটিকে প্রদর্শন করছে। হলুদ বর্ণের স্থানগুলো ধনাত্মক পোলারিটি বিশিষ্ট এবং গাঢ় নীল বর্ণের স্থানগুলো ঋণাত্মক পোলারিটি বিশিষ্ট। এ এলাকাতেই সৌর কলঙ্কগুলো দেখা যায়। এ এলাকার তাপমাত্রা চতুষ্পার্শ্বের তুলনায় ১০০০ K কম বলে এদের চতুষ্পার্শ্বের তুলনায় কালো প্রতীয়মান হয়। সৌর কলঙ্কের আকৃতিও আবার পরিবর্তিত হয়।

সূর্য হলো প্রকৃতপক্ষে একটি বিস্ফোরক বস্তু। এর বিস্ফোরণ হতে নির্গত পদার্থসমূহ প্রতি সেকেন্ডে ৩ মিলিয়ন টন বেগে মহাশূন্যে নির্গত হয়। এ নির্গমন বেগ এত বেশি যে, সেগুলো সূর্যের মহাকর্ষজনিত বাধাকেও উপেক্ষা করে এবং সৌরজগতের বাইরেও নির্গত হয়। এ নির্গত পদার্থসমূহকে সৌরঝড় বলে। সৌরঝড়ের অন্তর্গত উপাদানসমূহ চৌম্বক ধর্ম বিশিষ্ট এবং এগুলো গ্রহসমূহের চৌম্বকক্ষেত্রকে বিনষ্ট করে।

অধিকাংশ গ্রহেরই নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটোস্ফেয়ার (Magnetosphere) আছে। এ চৌম্বকক্ষেত্রের অভ্যন্তরের চৌম্বক বলের শক্তি সূর্যের চৌম্বক বলের চেয়েও বেশি। এটি গ্রহের ম্যাগনেটোস্ফেয়ার সৌরঝড়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং গ্রহের ম্যাগনেটোস্ফেয়ার সূর্যের বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়ে চৌম্বক পুচ্ছের সৃষ্টি করে।

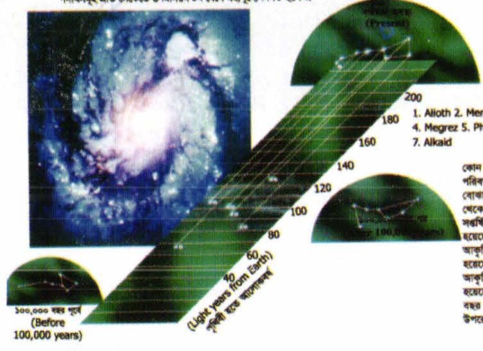

কোন একটি তারকার অবস্থানের পরিবর্তন অনেক সময়ের ব্যবধানে বোঝা যায়। নীচে বামে আজ থেকে ১০০,০০০ বছর পূর্বে সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকৃতি দেখানো হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এর আকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ তারকামণ্ডলের বর্তমান আকৃতি উপরে চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। আজ থেকে ১০০,০০০ বছর পর এর আকৃতি হবে উপরের চিত্রের ন্যায়।

বৈচিত্র্যময় তারকারাজি
VARIETIES OF STARS

দৈত্য ও বামন তারা

তারাসমূহকে কেবল বর্ণালী বিশেষণ দ্বারা শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। যদিও তাপমাত্রার মাধ্যমে তারাগুলোকে আলাদা করা যায়, কিন্তু তার মাধ্যমে তারার আকার নির্ণয় করা যায় না। হাইড্রোজেন তারার ব্যাসার্ধ সৌর ব্যাসার্ধের এক দশমাংশ হতে শুরু করে ১০০ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আকৃতি সৌর ব্যাসার্ধের ১০০০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। নক্ষত্রসমূহের ভর সৌরভরের ০.০৮ গুণ হতে ১০০ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। একই তাপমাত্রার কিন্তু ভিন্ন আকারের দুটি তারার উজ্জ্বলতা ভিন্ন হয়, যা তাদের বর্ণালী বিশেষণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন বলে প্রতীয়মান হয়। এ পার্থক্যকে পাঁচটি উজ্জ্বলতার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শ্রেণী ১ এর তারাদের বলে অতিদানব (Supergiant) তারা, শ্রেণী ২ এর তারাদের উজ্জ্বল দানব, শ্রেণী III এর তারাদের দানব (Giant) তারা, শ্রেণী IV এর তারাদের উপদানব (Subgiant) তারা, এবং V এর তারাদের প্রধান ধারার তারা (main sequence) বলে। বর্ণালী শ্রেণীর G.K.M শ্রেণীর যেসব তারা হাইড্রোজেন দহন করে, তারা প্রধান ধারার তারার অন্তর্ভুক্ত। সূর্য প্রধান ধারার G2 শ্রেণীর একটি হলুদ বামন তারা। প্রধান ধারা কথাটি উৎপত্তি হয় Hertzsprung-Russel চিত্র হতে, যা জ্যোতির্বিদগণ তারার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য উদ্ভাবন করেন। এতে তাপমাত্রার সাপেক্ষে তারার ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করা হয়েছে। চিত্রটির ৫৮০০° তাপমাত্রার রেখা ১ সৌর উজ্জ্বলতা রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেখানে সূর্যের অবস্থান। ৫৮০০° হলো সূর্যের আলোকমণ্ডল (Photosphere) এর তাপমাত্রা। এ চিত্র হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ তারা S আকৃতির বক্ররেখার ওপর অবস্থান করে। এ বক্ররেখা নীচের ডানপার্শ্বের সর্বনিম্ন উজ্জ্বলতার লাল বামন তারা হতে শুরু করে সূর্যের অবস্থানের মধ্য দিয়ে উপরের সর্বডানে অধিক উজ্জ্বলতার নীল তারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ ধারাকে প্রধান ধারা বলে, যাতে অধিকাংশ তারা জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে, এ প্রধান ধারা মাঝারী হাইড্রোজেন তারার সঞ্চার পথ। তারার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রধান ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যখন তারার হাইড্রোজেনের দহন বন্ধ হয়ে হিলিয়ামের দহন শুরু হয়, তখন তারার শক্তিতে পরিবর্তন ঘটে, যা তার বাহ্যিক আকার ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস পায়। তখন তারাটি Hertzsprung-Russel চিত্রের সর্বোচ্চ ডানের চতুর্থাংশে লাল দানব তারা এলাকায় অবস্থান করে। যখন তারার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন তা সর্বনিম্ন বাম চতুর্থাংশে শ্বেত বামন তারাদের বা, তারার অবশেষ অংশের সাথে বিরাজ করে।

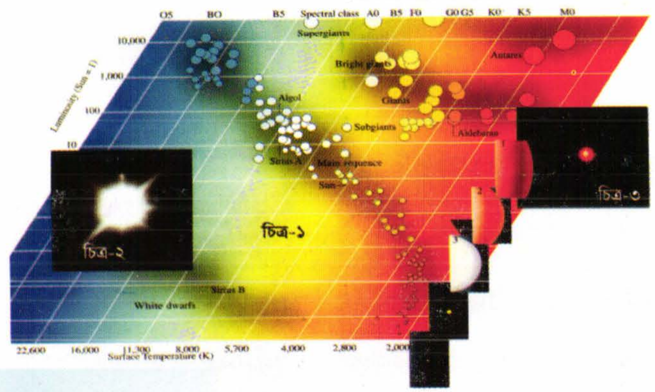

চিত্র-১ : রাতের আকাশে দেখা যায় এরূপ সকল তারার উজ্জ্বল্য Hertzsprung-Russel চিত্রে দেখানো যায়। এটি তারার উজ্জ্বলতা শ্রেণীর সাথে উজ্জ্বল্যের লেখচিত্র। অধিকাংশ স্থায়ী ও মাঝামাঝি তারা উপরের বামদিক হতে নীচে ডানদিক পর্যন্ত S আকৃতির বক্ররেখার উপর অবস্থিত। এদের প্রধান ধারার তারা বলে। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাসমূহের অবস্থান চিত্রের নীচের দিকে, লাল বামন তারাগুলো প্রধান ধারার অংশবিশেষ, সাদা বামন তারাগুলো হালকা ও অধিক ঘনত্বসম্পন্ন কেন্দ্রবিশিষ্ট, যারা তারার জীবনের শেষভাগে এসে বিস্ফোরণ করেছে।

চিত্র-২ : আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারা লুব্ধক (Sirius) মৃগব্যাধ (Canis major) মণ্ডলে অবস্থিত একটি উজ্জ্বল সাদা তারা, যেখান থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে ৮.৭ আলোকবর্ষ সময় লাগে। পৃথিবী হতে দূরত্বের হিসেবে এটি ৬ষ্ঠ নিকটবর্তী তারা। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি যুগল তারা যার অন্যটি শ্বেত বামন তারা। লুব্ধকের উজ্জ্বলতা সূর্য অপেক্ষা ২৬ গুণ অধিক।

চিত্র-৩ : বৃশ্চিক তারামণ্ডলে পারিজাত (Antares) একটি লাল অতি দানব তারা, যার অবস্থান চিত্রের উপরের ডান কোনায়। এরা আকাশের বৃহত্তম তারাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ৫০০ গুণ এবং উজ্জ্বলতা ৩০,০০০ গুণ। কিন্তু আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা মাত্র ৩০০০K, এসব তারার ঘনত্ব খুব কম।

তারাসমূহের আকৃতি, ভর ও তাপমাত্রার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। সূর্যকে প্রামাণ্য ধরে তারাসমূহের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়। একই তাপমাত্রার তারাসমূহের পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলে নির্গত শক্তি সমান। উজ্জ্বলতা আকৃতির সাথে বৃদ্ধি পায়। পারিজাত এবং আদমবরান সূর্য অপেক্ষা বড় এবং উজ্জ্বলতর তারা। আদমবরান সূর্য অপেক্ষা ২৫ গুণ বৃহত্তর এবং ২০০ গুণ উজ্জ্বলতর কিন্তু শীতলতর। পারিজাত সূর্য অপেক্ষা অর্ধেক উষ্ণ, যার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩০০০K। সূর্যের সাথে প্রধান ধারায় মায়াবতী (algol) একটি B শ্রেণীর তারা, যা সূর্য অপেক্ষা ৭ গুণ বড়, কিন্তু ১০০ গুণ উজ্জ্বলতর এবং উষ্ণ (১০,০০০K)। লুব্ধক পৃথিবীর সমান আকৃতির একটি সাদা বামন তারা। এটি অত্যন্ত উষ্ণ (১০,০০০K), কিন্তু সূর্য অপেক্ষা ১০০০ গুণ কম উজ্জ্বল।

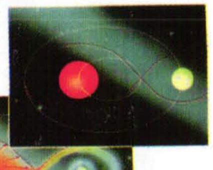

প্রথম অবস্থায় তারাকযুগলে প্রতিটি তারকাই এদের সাধারণ কেন্দ্রীয় ভরের (Common center of mass) চতুর্দিকে আবর্তন করে। এ তারকা দুটির প্রতিটি মহাকর্ষীয় বলক্ষেত্রের সীমানাটি Roche lobe নামে পরিচিত। যে বিন্দুতে দুটি তারকার সীমানা রেখা মিলিত হয়, সেখানে মহাকর্ষীয় বলে প্রভাব শূন্য থাকে।

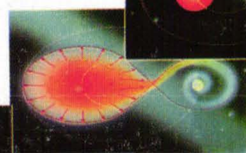

জীবনকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে, তারকা যুগলের যে তারকাটির ভর বেশি, সেটি লাল দানব (Red giant) তারকায় পরিণত হয় এবং এর Roche বৃত্তকে পূর্ণ করে। তারকা ঝড়ের মাধ্যমে কিছু পদার্থ উক্ত তারকা হতে নির্গত হয়ে ছোট তারকাটির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে চক্রাকারে ছোট তারকার দিকে ধাবিত হয় এবং এতে ধীরে ধীরে ছোট ছোট তারকাটির ভর বৃদ্ধি পায়।

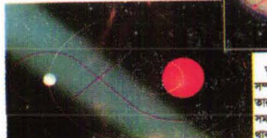

তৃতীয় পর্যায়ে লাল দানব তারকা তার বিবর্তন চক্র সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ে এটি শ্বেত বামন অথবা নিউট্রন তারকাতে পরিবর্তিত হয়। অপর ছোট তারকাটি যা এ সময়ে প্রধান ধারায় রয়েছে, তার ভর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকার কারণে এর বিবর্তনের হার অনেক বেড়ে যায়।

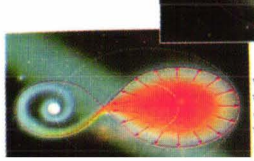

চতুর্থ পর্যায়ে, ছোট তারকাটিও লাল দানব তারকায় পরিণত হয়। এ তারা যুগলের অপর তারকাটির মতই এ নতুন সৃষ্ট লাল দানব তারকাটিও অনেকগুণ প্রসারিত হয়ে এর Roche বৃত্তকে পূর্ণ করে এবং এর কিছু কিছু উপাদান নির্গত করে, যা অপর তারকার দিকে ধাবিত হয়। এরপর কী হবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রথম তারকাটি কী অবস্থায় আছে। পূর্বের তারকাটি যদি একটি শ্বেত বামন হয় তবে এ প্রক্রিয়ায় একটি নোভা সৃষ্টি হবে। আর পূর্বের তারকাটি একটি নিউট্রন নক্ষত্র হলে X-ray বিস্ফোরণ ঘটবে।

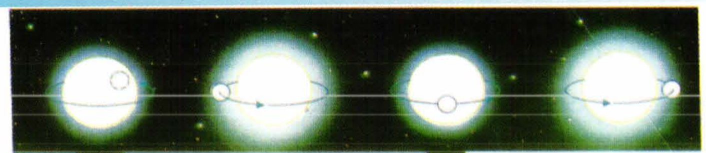

- গ্রহণসৃষ্টিকারী তারকাযুগলে (Eclipsing Binary) তারকা দুটি এভাবে অবস্থান করে যে, এরা পারস্পরিক গ্রহণের (Mutual Eclipse) সৃষ্টি করে। ফলে এ তারকাযুগল হতে নির্গত আলোর উজ্জ্বলতা পরিবর্তিত হয়। তারকাযুগলের তারকা দুটি একটির সাপেক্ষে আরেকটি পাশাপাশি থাকলে এদের উজ্জ্বলতা সর্বাধিক হয়। কিন্তু যখন একটি তারকা অপরটির সামনে চলে আসে (এমনকি ছোট তারকাটি বড়টির সামনে এলেও), তখন তারকাযুগলের উজ্জ্বলতা সর্বাধিক হ্রাস পায়।

- এ নোভাটি Cygni নামে পরিচিত। এটি ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উৎপন্ন হয়। নোভাটি পৃথিবী হতে ১০,৪৩০ আলোকবর্ষ দূরে Cygnus নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত। এ ছবিটি ১৯৯৩ সালের মে মাসে হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে তোলা। নোভাটি সীমানার কাছাকাছি একটি রিং তৈরি হয়েছে, যা বিস্ফোরণে সৃষ্ট গরম গ্যাসসমূহকে নির্দেশ করে।
- দ্বিতীয় চিত্রটি প্রাথমিক বিস্ফোরণের তিন মাস পর তোলা। নোভাটির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সীমানা ৭৪ থেকে ৯৬ বিলিয়ন মাইল প্রসারিত হয়েছে।

"(আল্লাহ) তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন নক্ষত্ররাজি- যেন তোমরা স্থলে ও সমুদ্রপথে অন্ধকারে চলতে তাদের সাহায্যে দিশা পেতে পার। আমরা বিস্তারিতভাবে নির্দশনাবলী ব্যক্ত করেছি

মহাবিস্ফোরণ
THE BIG BANG

গ্যালাক্সীগুলো সর্বদা একে অপর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। ধারণা করা হয়, সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিশ্বের সকল পদার্থ ও শক্তি এক সাথে অতি ক্ষুদ্র স্থানে পুঞ্জীভূত অবস্থায় ছিল। মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হয়।

ধারণা করা হয়, মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সংঘটিত হয়েছিল বিস্ফোরণের প্রথম এক সেকেন্ডেরও অতি কম সময়ে। প্রশ্ন আসতে পারে, মহাবিস্ফোরণের আগে কী ছিল? প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, মহাবিস্ফোরণের সাথে সাথে সময়ের সৃষ্টি। মহাবিস্ফোরণের পূর্বে সময়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং মহাবিস্ফোরণের আগে কী ছিল তা প্রশ্ন করাই অযৌক্তিক।

সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে এ বিশ্বজগৎ সম্প্রসারিত হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির ক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেছেন।

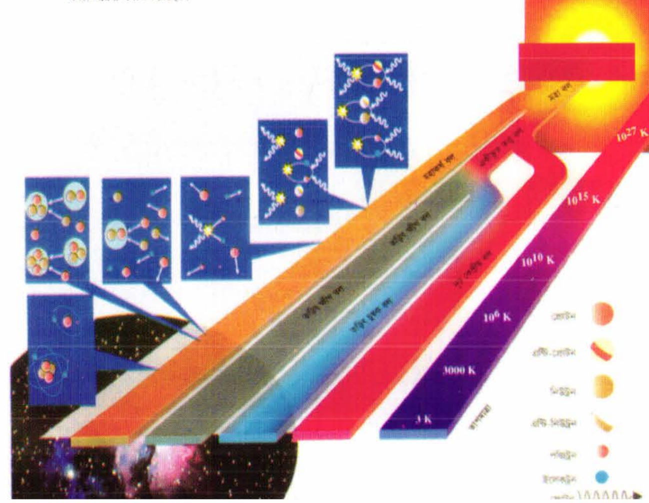

মহাবিশ্বের পরিণতি
THE FATE OF THE UNIVERSE

সৃষ্টির একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, মহাবিস্ফোরণের ১০[illegible] সেকেন্ড সময় পরও স্থান (Space) এবং সময় (Time) সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিল। জগতে বর্তমানে বিদ্যমান সকল বল একই সাথে মহাবল (Super Force) হিসেবে ছিল। এ সময়কাল প্লাঙ্ক সময় (Planck Time) হিসেবে পরিচিত। পদার্থবিদ্যার তত্ত্বসমূহের সৃষ্টিও এ সময়ে, এ জন্যই এ সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলো কখনোই বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

$১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে স্থান (Space) এর যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে এবং সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে $১০^{২৭}$K-এ নেমে আসে। এ সময়ের মধ্যে আলাদা বল হিসেবে মহাকর্ষ বলের (Gravity) সৃষ্টি হয় এবং একীভূত তত্ত্ব বল (Grand Unified Theory Force) আলাদা হয়ে দৃঢ় কেন্দ্রীয় বল (Strong Nuclear Force) এবং তড়িৎ ক্ষীণ বলের (Eletroweak Force) সৃষ্টি করে। সাথে সাথে কোয়ার্ক (Quark), লেপটন (Lepton) এবং এদের বিপরীত কণা (Anti Particle) তৈরি হয়।

$১০^{-১২}$ সেকেন্ড সময়ে তড়িৎ ক্ষীণ বল (Electroweak Force) ভেঙে তড়িৎ চুম্বক বল (Electromagnetic Force) এবং ক্ষীণ কেন্দ্রীয় বল (Weak Nuclear Force) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বল প্রকৃতির চারটি মৌলিক (Fundamental) বলে আলাদা হয়ে পড়ে এবং এদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা ভাবে বোঝা যায়। কণা এবং এদের বিপরীত কণার সৃষ্টি (Creation) এবং ধ্বংস (Annihilation) একই সাথে চলতে থাকে এবং লেপটন (Lepton), নিউট্রিনো (Neutrino) এবং ইলেকট্রন (Electron) বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের অতি উচ্চ তাপমাত্রা কোয়ার্ককে বড় কণা সৃষ্টিতে বাঁধা প্রদান করে বলে এ সময়ে কোয়ার্ক তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে পৃথকভাবে অবস্থান করে।

$১০^{-৬}$ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে কোয়ার্ক আর নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে অবস্থান করতে পারে না বলে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রোটন (Proton) এবং নিউট্রন (Neutron) সহ মেসন (Meson) এবং বেরিয়ন (Baryon) তৈরি করে।

কোয়ার্কের বিপরীত কণাও একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ (প্রতি বিলিয়নে একটি) ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে অবস্থান করে এবং এ অবশিষ্ট কণাই বর্তমান বিশ্বজগতের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছে। এ প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ ফোটনেরও (Photon) সৃষ্টি হয়।

প্রথম সেকেন্ড সময় শেষে তাপমাত্রা $১০^{১০}$K -তে নেমে আসে। ৫ সেকেন্ড পর নিউট্রিনো (Neutrino) এবং বিপরীত নিউট্রিনো (Anti Neutrino) এর সাথে অপর বস্তুকণার সংস্পর্শ বন্ধ হয়ে যায়। ১০ সেকেন্ড সময়ে প্রোটন এবং নিউট্রন ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস (Deuterium Nuclei) সৃষ্টি করে। মহাবিস্ফোরণের ১ থেকে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে দৃঢ় কেন্দ্রীয় বল (Strong Nuclear Force) তার প্রাধান্য স্থাপন করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (Helium Nuclei) তৈরি করে। এ সময়ে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের আপেক্ষিক অনুপাত নির্ধারিত হয়ে যায়।

মহাবিস্ফোরণের মোটামুটি ৩০০,০০০ বছর পর, বিশ্বজগতের তাপমাত্রা ৩০০০K-তে নেমে আসে। ফলে তড়িৎ চুম্বক বল নিউক্লিয়াসকে ধরতে সহায়তা করে। ফলশ্রুতিতে প্রথমবারের মত ফোটন (Photon) কোন বস্তুর সাথে সংঘর্ষ ব্যতীত দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়। এটি কসমিক বিকিরণের জন্ম দেয়। যেহেতু কসমিক বিকিরণ চাপ বিশ্বজগতের গঠন উপাদানসমূহ হতে আলাদা হয়ে পড়ে, সেহেতু পরমাণুসমূহ মহাকর্ষীয় বলকে অনুভব করে এবং একত্রিত হয়ে বিশ্বজগতের উপাদানসমূহ সৃষ্টি করে।

মহাবিস্ফোরণ যা থেকে আমাদের এ বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তা সংঘটিত হয়েছিল আজ থেকে ১০-১৫ বিলিয়ন বছর আগে। স্টিফেন হকিং একজন সহযোগী বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে সম্প্রতি 'বিগব্যাং' -এর অব্যবহিত আগের অবস্থার একটি গাণিতিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'Hick's Field' নামক তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের সাহায্যে এ অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়।

"এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই"
সূরা আল-বাকারা : ২

পৃথিবীর সৃষ্টি : প্রায় ১৩০০ কোটি বছর আগে "বিগ ব্যাং" বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করে। 'সিঙ্গুলারিটি' Singularity নামক অসীম ঘনত্বের বিন্দু অবস্থা হতে মহাবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে গ্যালাক্সি সৃষ্টি করে। গ্যালাক্সিগুলোর অভ্যন্তরে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান নীহারিকা ঘনীভূত হয়ে তৈরি হয় নক্ষত্র। সূর্যের মত কিছু নক্ষত্রের চারপাশে গঠিত হয় পৃথিবীর মত গ্রহ।

"আকাশমন্ডলী, আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি ক্ষমতাবলে।
নিশ্চয়ই আমি তাকে সম্প্রসারিত করেছি।"
সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭

মহাজাগতিক বস্তু	ব্যাপ্তি (১ আলোকবর্ষ=৯,৪৬১ কি.মি.)
পৃথিবী	৬৪০০ কি.মি.
সৌরজগৎ	০.১ আলোকবর্ষ
মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি	১ লক্ষ আলোকবর্ষ
মহাবিশ্ব	২৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ

যদি প্রশ্ন করা হয়, "এ মহাবিশ্বের পরিণতি কী?" প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। আমাদের এ মহাবিশ্ব সদা সম্প্রসারণশীল। ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের এ সম্প্রসারণ হলো আদি মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) ফলাফল। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, "এ সম্প্রসারণ কি চলতেই থাকবে?" এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিশদ জানতে হবে।

মহাবিশ্বের সামগ্রিক ভর নির্ণয় একটি খুব কঠিন কাজ। আর আমাদের মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এটি নির্ণয় অতি জরুরি। মহাবিশ্বের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এ মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্বকে একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের (সঙ্কট ঘনত্ব বা Critical Density) সাথে তুলনা করা হয়। এ সঙ্কট ঘনত্বের মান হল $১০^{-৩০}$ থেকে $১০^{-২৯}$ গ্রাম/সি সি।

ঘনত্বের মান সঠিকভাবে নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন বলে মহাবিশ্বের স্বরূপ নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে গ্যালাক্সিসমূহে মহাবিশ্বের বক্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

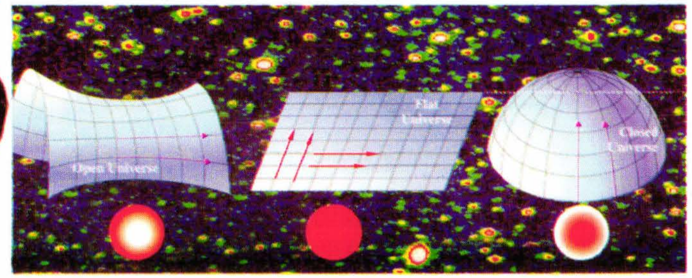

Open Universe: খোলা মহাবিশ্বে স্থানের (স্থান-কালের) আকৃতি হবে অধিবৃত্তীয় বা ঘোড়ার জিনের মত। এক্ষেত্রে সমান্তরাল রেখাসমূহ ক্রমে দূরে সরে যায়। খোলা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের চেয়ে কম হবে বলে বর্ণনা করা হয়। খোলা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সর্বদা চলতেই থাকবে এবং এদের ক্ষেত্রে দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহকে নিকটবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের তুলনায় অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট মনে হবে।

Flat Universe : সমান মহাবিশ্বে সমান্তরাল রেখাসমূহ চিরকালই সমান্তরাল থাকবে এবং গ্যালাক্সীসমূহে বস্তুর বন্টন একই মনে হবে। এক্ষেত্রে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের সমান হবে এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অসীম (Infinite) কোন সময়ে গিয়ে শেষ হবে।

Closed Universe : বদ্ধ মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি অর্ধগোলক পৃষ্ঠের মতো। এক্ষেত্রে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হয় এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এক সময় থেমে যাবে। বদ্ধ মহাবিশ্বে দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহকে নিকটবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের তুলনায় কম ঘনত্ববিশিষ্ট মনে হবে।

বর্তমানে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এ মহাবিশ্ব হয়তো তা সমতল এবং অসীম সময় পর্যন্ত এর সম্প্রসারণ চলতে থাকবে এবং এর পর থেমে যাবে।

এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। বস্তুসমূহ তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের কোয়ান্টা বা ফোটন প্রতিফলিত বা নির্গত করে বলে আমরা বস্তুসমূহকে দেখতে পাই। প্রশ্ন উঠতে পারে, "এমন কোন বস্তু আছে কিনা, যা এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি?" জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা- এরকম বস্তুর অস্তিত্ব আছে এবং শুধু অস্তিত্বই নয় বরং তা আমাদের পরিচিত বস্তুসমূহকে পরিমাণে ছাড়িয়ে যায়। ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের ৯০ শতাংশ এ অনাবিষ্কৃত বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত! এ অদৃশ্য বস্তুসমূহ "কৃষ্ণবস্তু" নামে পরিচিত। এসব অনাবিষ্কৃত "কৃষ্ণ বস্তুর" প্রকৃতি বিশেষণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব হতে পারে।

আমাদের এ মহাবিশ্ব সমতল বা উন্মুক্ত যা-ই হোক না কেন, অনন্তকাল পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু তাই এটি মনে করা ঠিক নয় যে, গ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিগুলোর অস্তিত্ব অনন্তকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। মহাবশ্বের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে এর মধ্যে কী পরিমাণ বস্তু অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে তার ওপর। এ বিশ্বজগতের সকল নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিগুলো এদের চারপাশে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে সর্বদা তাপ বিকিরণ করে চলছে। ধারণা করা হয়, এভাবে তাপ বিকিরণ করতে করতে এক সময় এদের মৃত্যু ঘটবে। আজ থেকে অনেক অনেক কাল পরে, মোটামুটি দশ হাজার কোটি বছর পর নক্ষত্রগুলো তাদের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছাবে। নক্ষত্রের তিনটি চূড়ান্ত অবস্থা হতে পারে। এগুলো হলো- শ্বেত বামনত্ব (White Dwarf), নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron Star) এবং কৃষ্ণ বিবর (Black Hole)।

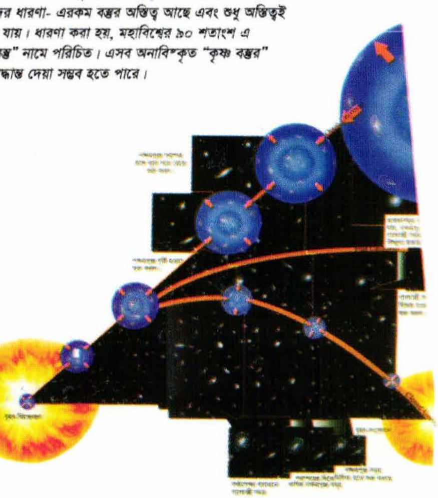

এগুলো ব্যতীত ছোট ছোট পদার্থের টুকরো যেমন- গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ইত্যাদি অবস্থান করবে। এরা সকলেই আকর্ষণ বলের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে পরস্পরের সাথে একত্রে থাকবে। দলগুলো এক অপরের থেকে অনেক দূরে দূরে থাকবে এবং পরস্পর থেকে আরো দূরে সরে যেতে থাকবে। সময়ের সাথে সাথে অধিকাংশ নক্ষত্র এ দলগুলো হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলো একত্রে বিরাট কৃষ্ণ বিবরে (Black Hole) পরিণত হবে। ধারণা করা হয়, এ কৃষ্ণ বিবরও চিরস্থায়ী হবে না। বরং হকিং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় (Hawking Radiation Process) কৃষ্ণ বিবরের ভিতরের বস্তুসমূহ কৃষ্ণ বিবর থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। এ প্রক্রিয়ার ফলে কৃষ্ণ বিবরের ভর হ্রাস পেতে থাকবে এবং সাথে সাথে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সবশেষে, কৃষ্ণ বিবরের সর্বশেষ বস্তুটিও বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং এতে হয়তোবা প্রচন্ড একটি বিস্ফোরণ ঘটবে। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পর এ বিশ্বজগৎ তাপমাত্রার সাম্যাবস্থায় পৌঁছাতে পারে। তখন বিশ্বজগতে শুধুমাত্র উপ-আণবিক (Sub-Atomic) কণাসমূহ অবস্থান করবে। সকল কণা একই তাপমাত্রায় থাকবে এবং আর কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না। আর যদি কোন পরিবর্তনই সাধিত না হয়, তবে সময়ের অস্তিত্বও বোঝা যাবে না। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা, এ অবস্থার পর মহাবিশ্বের পুনর্জন্ম হবে। সে জগৎ হয়তো হবে আমাদের বর্তমান জগৎ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ।

"সেদিন (রোজ কিয়ামতে) আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়।"
সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৪

www.pathagar.org

Calender 2004

আল কুরআনে নবী ও রাসূলগণ

১ আদম (আ)

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة

আদম (আ) কে স্বয়ং আল্লাহপাকের নির্দেশনায় জান্নাতে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়। তিনিই প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। আদম শব্দটির অর্থ পৃথিবী। কেননা পৃথিবীর মাটি থেকে আদম (আ) কে পয়দা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন "—আল্লাহ আদম (আ) কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে হও আর এমনি সে হয়ে গেল।" (আলে ইমরান আয়াত-৫৯) শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত সকল ধর্মের মানুষ পবিত্র একটি পাহাড়কে আদমের (আ) পাহাড় বলে। যেখানে আদম (আ) পবিত্র জুম্মার দিনে অবতরণ করে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন "আমি (আল্লাহ) বললাম যে, তোমরা সবাই এখান (বেহেশত) থেকে নেমে যাও—।" (বাকারা-৩৮) সেই পাহাড়ে আজো আদম (আ) এর পদচিহ্ন কালের সাক্ষী হয়ে আছে। ইংরেজীতে পাহাড়ের সেই শৃঙ্গকে 'Adam's Peak' এবং স্থানীয় ভাষায় 'চুড়া' বলে। আদম (আ) তাঁর সঙ্গিনী হাওয়া (আ) এর অনুসন্ধানে পক প্রণালীর দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে তৎকালীন ভারতবর্ষে আসেন।

পক প্রণালীর দ্বীপপুঞ্জ সমূহকে বিশ্ব মানচিত্রে আজও এডামস ব্রীজ বা আদমের সেতু বলা হয়। হাওয়া (আ) আজকের আরবের জিদ্দায় অবতরণ করেন। তিনি হলেন মানব জাতির আদি মাতা, সে হিসাবে তাকে দাদীও বলা যায়। সেখান থেকেই অবতরণস্থলের নাম দাদী বা আরবীতে জিদ্দাতুন থেকে জিদ্দা রাখা হয়েছে। আদম (আ) ও বিবি হাওয়া-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে মক্কার অদূরে আরাফাতের 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে। আদম (আ) থেকে মানবের বংশ বৃদ্ধি শুরু হয়। মৃত্যুকালে আদম (আ) এর বংশধরের সংখ্যা ছিল চার হাজার।

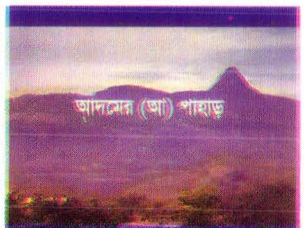
আদমের (আ) পাহাড়

জাবালে রহমত

২ ইদ্রিস (আ)

واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا

ইদ্রিস (আ) মিশরের আনাপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিব্রু ও সুরিয়ানি ভাষায় তাঁর নাম খনুক এবং আরবী ভাষায় আখনুক। ইদ্রিস তাঁর লকব। আরবী দরস শব্দ থেকে ইদ্রিস শব্দের উৎপত্তি। তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন " —— আর স্মরণ কর এই কিতাবের ইদ্রিস (আ) এর কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।" (মারিয়াম ৫৬-৫৭ আয়াত) তিনি একটি আংটি পরতেন। সেই আংটিতে লিখা ছিল "—— আল্লাহর প্রতি ঈমানের সহিত ধৈর্য অবলম্বন বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়"। তাঁর কমরবন্ধের উপর লিখিত ছিল "প্রকৃত ঈদ ফরজসমূহ আদায় করার মাঝে নিহিত। দ্বীনের পূর্ণতা শরিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট আর মানবতার পূর্ণতাই দ্বীনের পূর্ণতা"। সে সময় ৭২টি ভাষা প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তাঁর উপর ৩০টি ছহীফা নাযিল করেন। গ্রীক পন্ডিতগণ তাঁকে হিপোক্রেটিস বলেন। এই হিপোক্রেটিসই ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। তিনি সপ্তাহে ৩ দিন লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং ৪ দিন বিদেশ সফর করতেন। তিনি কলম আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতি চালু করেন। তাঁর স্মরণীয় বাণী হল 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই আত্মার জীবন'।

৩ নূহ (আ)

قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك

নূহ (আ) ফোরাত ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী চৌদ্দ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের অধিবাসী সুমেরীয় মূর্তিপুজকদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। সুমেরীয় মূর্তিপুজকরা নূহ (আ) এর কথায় সাড়া না দিয়ে প্রকাশ্য খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়। নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার তক্তা দিয়ে বিশাল জাহাজ নির্মাণ করেন। যার প্রতিটি তক্তায় এক একজন নবীর নাম লেখা ছিল। নূহ (আ) এর জাহাজের দৈর্ঘ ছিল ১২০০ হাত, প্রস্থ ৬০০ হাত যা ছিল ৩ তলা বিশিষ্ট। ৮০ জন ঈমানদার নারী ও পুরুষ এবং

৪ হূদ (আ)

اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون

হূদ (আ) আজ থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নূহ (আ) এর পুত্র শামের বংশধর বনী আদ গোত্রকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। বর্তমান তাঁর জন্মস্থানের নাম আহকাব বা উবার নগরী। হূদ (আ) এর কবরস্থান হাযরা মাউতের কাসিরে আহমার অর্থাৎ লাল টিলার চুড়ায় অবস্থিত। আদ জাতির রাজধানী ছিল ইয়ামান। বনী আদ গোত্রকে আমালিকা সম্প্রদায়ও বলা হয়। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আদজাতিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন "— আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা,যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে।" (আল-হাক্কা -৬) আদ শব্দের অর্থ উচ্চ। হূদ (আ) এর সময়কালীন স্বৈরাচারী বাদশা শাদ্দাদকে তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

www.pathagar.org

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জুদি পাহাড় আরমেনিয়ায় আরারাত পর্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এটা ৩৮০০ ফুট উঁচু। জুদি পাহাড় কুর্দিস্থান, তুরস্ক এবং আরমেনিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন " ---- হে পৃথিবী তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো এবং নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে থামল এবং বলা হলো জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হও"। (সূরা-হূদ আয়াত-৪৪) প্লাবনের পর নূহ (আ) এর তিন পুত্র জীবিত ছিলেন। পরবর্তিতে তাঁদের বংশধরগণই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

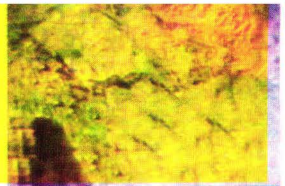

জুদি পাহাড়

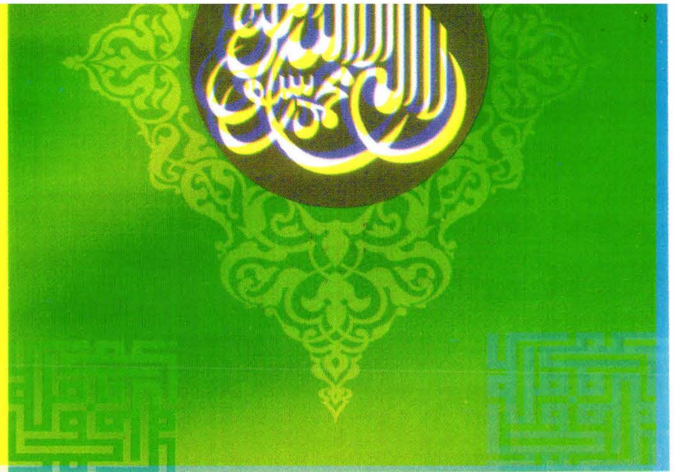

- সামুদ জাতির বাড়ি-ঘর
- সামুদ জাতির ধ্বংস স্তূপ
- সালেহ (আ) কর্তৃক খননকৃত কূপ

٥

والى ثمود اخاهم صالحا

সালেহ (আ)

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে 'হিজর' নামক স্থানে সালেহ (আ) জন্মগ্রহণ করেন। হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সামুদ জাতির বাসস্থান ছিল। তিনি সাম নবীর বংশীয় সামুদ বাদশার গোত্র সামুদ জাতির নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাঁর সময় বিশ্বাসীর সংখ্যা ছিল চার হাজার। সামুদ শব্দের অর্থ স্বল্প পানি।

এই জাতি পানি সংকটে জর্জরিত ছিল। আল্লাহ সামুদ জাতির পানি পান করার লক্ষ্যে একটি কূপ দান করেছিলেন। সামুদ জাতি সালেহ (আ) নিকট যখন মু'জেজা দাবী করলো, তখন আল্লাহর হুকুমে পাথুরে পাহাড় থেকে একটি উটনী বের হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রসব করতঃ বাচ্চাকে দুধ পান করাতে শুরু করলো। এই মুজেজা দেখে কিছু লোক দ্বীন গ্রহণ করলো আর কিছু লোক নবীকে যাদুকর বলে আখ্যা দিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন "---- আমাকে কেউ নিষেধ করেনি তবে শুধু এ কারণে পাঠাইনি যে তাদের আগের লোকেরা সে সবকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, সামুদকে আমি উটনী এনে দিলাম, আর তারা তাঁর উপর জুলুম করল। আমি নিদর্শন তো এ জন্যই পাঠাই যে লোকেরা তা দেখে ভয় করবে।" (বনি-ইসরাইল : ৫৯-আয়াত) সামুদ গোত্র খুব শক্তিশালী ছিল। তারা পাহাড় খনন করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতো। বর্তমানে এলাকাটি সৌদি আরবের মাদায়েনে সালেহ নামে পরিচিত। সামুদ জাতির লোকেরা নিষিদ্ধ উট জবাই করার অপরাধে আল্লাহ তাদেরকে বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন।

٦

واتخذ الله ابراهيم خليلا

ইব্রাহীম (আ)

আল কুরআনে বর্ণিত নবীদের মধ্যে ইব্রাহিম (আ) ষষ্ঠতম। তাঁর পিতা অগ্নিপূজক আজর ছিল নমরুদের মন্ত্রী। ইরাকের নাসিরিয়া থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার এবং বাগদাদ থেকে ৩৯৬ কিলোমিটার দূরে 'উর' নামক স্থান যা প্রাচীন বাবেল শহর নামে পরিচিত। এখানে একটি বিধ্বস্ত দোতলা বাড়ি, যেখানে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ) প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে ইব্রাহিম (আ) এর সময়ে এই নগরীতে ৪০ ফুট উঁচু ১১৮০টি মন্দির ছিল।

বাবেল শহরের ম্যাকফেলা গুহায় তাঁর কবর রয়েছে। হিট্রিদের কাছ থেকে তিনি গুহাটি ক্রয় করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে শিশু পুত্র সহ বিবি হাজেরাকে মক্কা উপত্যকায় নির্বাসন দান করেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসমাঈল (আ) কে কুরবানীর নির্দেশ আসে। ইব্রাহীম (আ) ফিলিস্তীনে ফিরে গিয়ে দেখেন সারার গর্ভের হযরত ইসাহাক এর জন্ম হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) সম্মিলিতভাবে কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর নাম কূরআনের ২৫টি সূরায় ৬৯ বার আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির পিতা। এছাড়া ইব্রাহিম (আ) এর বংশে মানবজাতির অসংখ্য নেতা জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন "---- আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করতে চাই, তিনি ইব্রাহিম (আ) বললেন আমার সন্তানদের প্রতিও কি এই ওয়াদা ? তিনি (আল্লাহ) উত্তরে বললেন আমার এ প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য নহে"। (বাকারা-১২৪ আয়াত)

ইব্রাহিম (আ) এর সময় রাষ্ট্রপ্রধান ছিল নমরুদ। নমরুদের রাজ্য ছিল বাবেল, ইরাক ও কলোনী অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। অতঃপর আল্লাহর গজব মাছি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নমরুদ মৃত্যুবরণ করে। তাকে এই কবরে দাফন করা হয়।

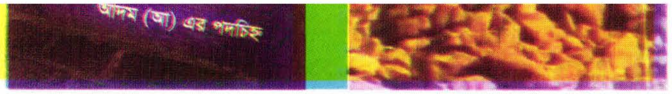

আদম (আ) এর পদচিহ্ন

ইব্রাহিম (আ) এর আবাস

নমরুদ প্রাসাদের ধ্বংস স্তূপ

ইব্রাহিম (আ) এর কবর

নমরুদের মন্দির

٧

فامن له لوط وقال انى مهاجر الى ربى

লুত (আ)

লুত শব্দের অর্থ জড়িয়ে যাওয়া, এঁটে যাওয়া। লুত (আ) ইব্রাহিম (আ) এর একান্ত প্রিয়ভাজন ও অন্তরঙ্গ ছিলেন বলেই তার নাম লুত হয়। প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে লুত (আ) বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্রাহিম (আ) এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি সামুদ গোত্রের নিকট প্রেরিত হন। তাঁর গোত্রের লোকেরা সমকামিতা (Sodomy), বণিকদের সম্পদ লুণ্ঠনসহ যাবতীয় অপকর্মে লিপ্ত থাকত। কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "তোমরা কি ঐ সমস্ত লোক নও যে তোমরা পুরুষদের সাথে অপকর্ম করছ, ডাকাতি করছ, নিজেদের মজলিসসমূহে এবং পরিবার পরিজনের সম্মুখে অশ্লীল কার্য করছ"। (সূরা আন কাবুত-২৯)

এই সমকামিতার অপরাধে এবং ফেরেশতাদের সাথে খারাপ আচরণের কারণে আল্লাহ সামুদ গোত্রের বস্তিসহ জমিনকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। জমিন উল্টানোর ফলে নিচের পানি উপরে এসে সাগর সৃষ্টি হয়েছে। এই সাগর ৮২ কিলোমিটার লম্বা, ১৮ কিলোমিটার প্রস্থ এবং ১০০০ ফুট গভীর। অতিরিক্ত লবণের কারণে পানির ঘনত্ব অত্যধিক বেশি যার ফলে কোন মানুষ পানিতে ডোবে না।

মৃত সাগর

১৪১০-১৪১১ বাংলা | 2004 | ١٤٢٤-١٤٢٥ هجرة

www.pathagar.org

calender 2004

আল কুরআনে নবী ও রাসূলগণ

৮ واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد

ইসমাঈল (আ)

ইব্রাহিম (আ) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ) আজ থেকে প্রায় তিন হাজার নয়শত দশ বছর আগে আজকের ফিলিস্তিনের হেবরুনে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিম (আ) আল্লাহর নির্দেশে শিশু পুত্রসহ বিবি হাজেরাকে মক্কা উপত্যকায় নির্বাসন দান করেন। ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-"আর ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুত-প্রত্যেককেই আমি সারাবিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি"। (সূরা আনআম-৮৬ আয়াত)

নির্বাসনে মশকের সঞ্চিত পানি শেষ হওয়ার পর হযরত হাজেরা ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে পানির সন্ধানে সাতবার সায়ী করেন যা বর্তমানে হজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হঠাৎ হাজেরা (আ) দেখলেন একজন ব্যক্তি (জিব্রাইল (আ) মাটিতে আঘাত করছেন। অতঃপর পানি বের হওয়া শুরু হলো। হাজেরা (আ) পানি সংগ্রহ করে পাথর দিয়ে বাঁধ দিলেন। যা জমজম কূপ হিসেবে পরিচিত। জম জম শব্দের অর্থ শক্ত করে বাঁধ দেয়া। ইসমাঈল (আ) ১৩৭ বছর জীবিত ছিলেন।

৯ وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين

ইসহাক (আ)

ইব্রাহিম (আ) এর বয়স যখন একশো বছর এবং বিবি সারাহ এর বয়স যখন ৯০ বছর তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একজন সন্তানের শুভ সংবাদ দেন। সে সন্তানের নামই ইসহাক (আ)। ইসহাক (আ) এর দু'ছেলে ছিলেন তারা হলেন ইয়াকুব এবং ইশু। তিনি ১৮০ বছর জীবিত ছিলেন এবং কেনানে মৃত্যু বরণ করেন।

১৩ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين

শুয়াইব (আ)

শুয়াইব (আ) খৃঃ পূর্ব ৫০০ থেকে ৬০০ সালের মধ্যে মাদায়েনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্রাহিম (আ) এর ছেলে মাদায়েনের বংশধর। রাসূল (সা) তাঁকে 'খতিবুল আম্বিয়া' বা নবীদের মাঝে 'শ্রেষ্ঠ বক্তা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মাদায়েনের জনগণের সুবিধার জন্য তিনি একটি কূপ খনন করেন। এই কূপের পানি থেকে জনগণ উপকৃত হত। তিনি মাদায়েন ও আইকা সম্প্রদায়ের নবী হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হন। মূসা (আ) এর শ্বশুর ছিলেন শুয়াইব (আ)। মাদায়েনবাসী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-"আমি মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শুয়াইব (আ) কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর,---। (সূরা আন-কাবুত ৩৬)

শুয়াইব (আ) এর পানির কূপ

১৪ هل اتاك حديث موسى

মূসা (আ)

মূসা (আ) ৩২০০ বছর পূর্বে মিশরের সিনাই উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। মূসা শব্দের অর্থ মুশা যার অর্থ নাজাত দানকারী। তিনি বনি ইসরাঈলকে ৪০০ শত বছরের গোলামী থেকে নাজাত দান করেছিলেন। জন্মের পর থেকে তিনি আল্লাহর কুদরতে ফেরাউন দ্বিতীয় রামাসিসের ঘরে লালিত-পালিত হন। তিনি নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনের নিকট আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যান। ফেরাউন দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং মু'জিযা দাবী করলে তিনি তার হাতের লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং সংগে সংগে ত বিশাল অজগরে পরিণত হয়। মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে মূসা এবং তাঁর অনুসারীদের উপর জুলুম নির্যাতন করে। খৃঃ পূর্ব ১২৩৫ সালে মূসা (আ) তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। ফেরাউন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মূসা (আ) এর পশ্চাদ্ধাবন করে লোহিত সাগরের দিকে রওয়ানা হয়। মূসা (আ) তাঁর হাতের লাঠি সাগরে নিক্ষেপ করলে বারোটি রাস্তা তৈরী হয়। মূস (আ) তাঁর সাথীদের নিয়ে সাগর অতিক্রম করেন। কিন্তু ফেরাউন সাগরের মাঝা মাঝি আসা মাত্র সঙ্গী সাথীদের সলীল সমাধি ঘটে। মিশরের যাদু ঘরে আজও ফেরাউনের লাশ রক্ষিত আছে।

মূসা (আ) তূর পাহাড়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পাহাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে নবী রূপে"। (মারিয়াম-৫২-৫৩) সমুদ্র সমতল থেকে তূর পাহাড়ের উচ্চতা ৮২৬ মিটার। তূর পাহাড়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাওরাত নামক আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হন। সমুদ্র অতিক্রম করে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বাইতুল মাকদাস রওয়ানা হন। মরুভূমিতে পানির অভাব হলে হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলে আল্লাহর নির্দেশে পানির ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হতে শুরু করে, যা আজও প্রবাহমান।

তূর পাহাড়

www.pathagar.org

ইয়াকুব (আ) কেনান অর্থাৎ আজকের ফিলিস্তীনের জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব (আ) এর উপাধি হলো ঈসরাইল। ইব্রানী ভাষায় ইসরা অর্থ গোলাম এবং 'আইল' অর্থ আল্লাহ। অর্থাৎ ঈসরাইল অর্থ 'আল্লাহর বান্দা'। তাঁর পিতা হযরত ইসহাক (আ) এবং মাতা রহীল বিনতে লাবান। ইয়াকুব (আ) ১২ সন্তানের জনক ছিলেন। ১) রাতবীন ২) শামাউন ৩) লাওয়া ৪) ইয়াহুদ ৫) দাইসাফার ৬) যালুবুন ৭) ইউসুফ ৮) বেনইয়ামীন ৯) দান ১০) নাফতালা ১১) যাদ ১২) আষার। বেনইয়ামীন ব্যতীত তাঁর সকল সন্তান ফাদ্দাম আরামে জন্মগ্রহণ করেন। বেনইয়ামীনকে ইহুদী নাছারা বেঞ্জামিন এবং ইউসুফ (আ) কে জোসেফ বিকৃত নামে ডাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্বন্ধে বলেন, "---এবং আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকুব, আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎ কর্মপরায়ণ।" (আম্বিয়া-৭২) ইয়াকুব (আ) ১৪৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং ফিলিস্তীনের হেবরুনে তাঁকে দাফন করা হয়।

১১

لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين

ইউসুফ (আ)

ইউসুফ (আ) ছিলেন ইয়াকুব (আ) এর ১১তম সন্তান। একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন ১১টি গ্রহ তাঁকে সিজদা করছে উক্ত ঘটনা ইয়াকুব (আ) কে বলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর ভাইয়েরা ঘটনাটি জেনে গেলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে Douthan নামক স্থানে এক অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল। মিশরগামী বাণিজ্য কাফেলা কূপের ভিতর বালতি নিক্ষেপ করলেই ইউসুফ (আ) সেটা ধরে ফেলেন এবং বালতিসহ তিনি উপরে উঠে আসেন। তৎক্ষণাৎ তারা এ ফুটফুটে কিশোরকে মিশরের বাজারে নিয়ে গেলে মিশরের বাদশা আজিজ তাঁকে দাসরূপে ক্রয় করে নেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, "একটি যাত্রীদল এলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠালো। সে তার ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠলো কি সুখবর! এ যে এক কিশোর অতঃপর তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। তারা যা করতে ছিল আল্লাহ সেসব বিষয়ে অবহিত ছিলেন"। (সূরা ইউসুফ-আয়াত ১৯)

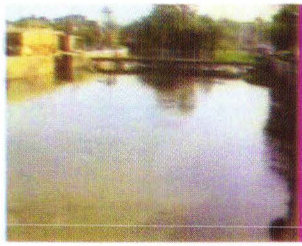
ইউসুফ (আ) এর নহর

এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আজিজের গৃহে তিনি ৬ বছর অবস্থান করার পর তাঁর স্ত্রী জুলেখা কর্তৃক অপবাদ রটনার প্রেক্ষিতে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে বাদশাহর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণে তিনি কারামুক্ত হয়ে রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অতঃপর খৃঃ পূর্ব ১৭০৬ অব্দে পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ রামাসিস নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। ইউসুফ (আ) ১১০ বৎসর বয়সে মিশরে মৃত্যু বরণ করেন।

১২

واذكر عبدنا ايوب

আইয়ুব (আ)

আইয়ুব (আ) খৃঃপূর্ব ১৫০০-১৩০০ সনের মধ্যে দক্ষিণ আরবের আওজ আইল নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে উল্লেখ্য আছে "আর তার আওলাদের মধ্য থেকে দাউদ সুলাইমান আইয়ুব ইউছুফ মূসা এবং হারুন" (সূরা আনয়াম-৮৪) আইয়ুব (আ) আদওয়ান বংশীয় আরব ছিলেন। তাঁর জামানা ছিল ইয়াকুব (আ) এবং মূসা (আ) এর মধ্যবর্তীকালে। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর অসুস্থ থাকার পর ১৪০ বছর বয়সে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন। আইয়ুব (আ) ২১০ বছর জীবিত ছিলেন।

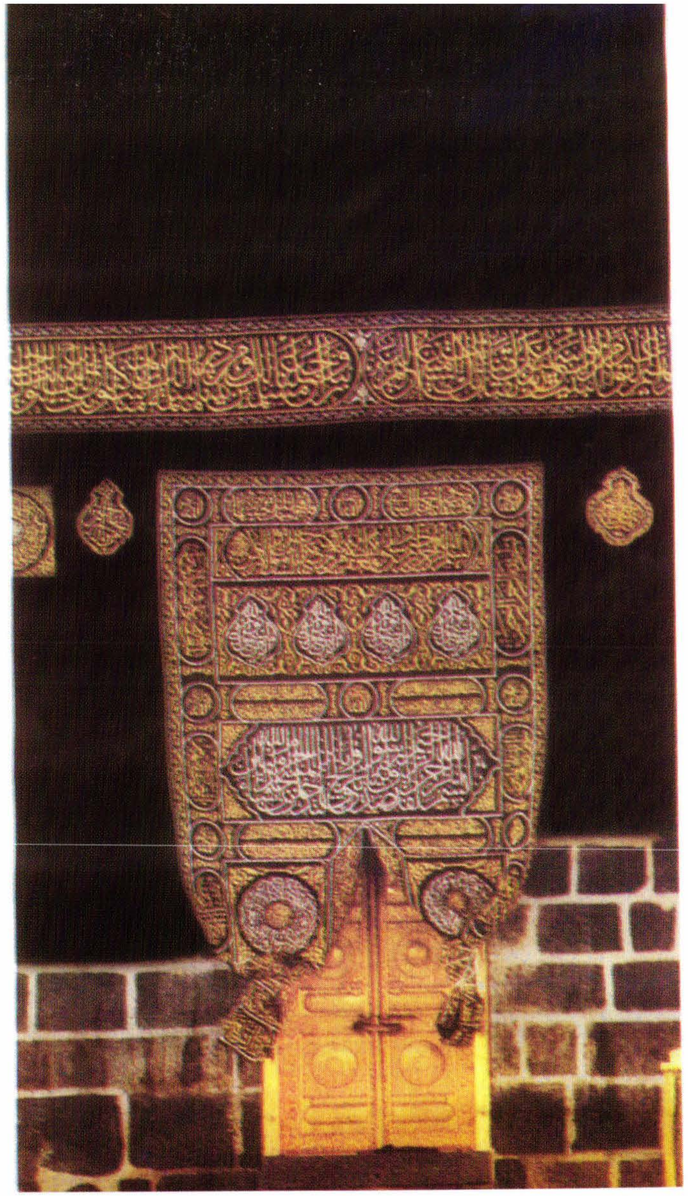

১৫

ولقد مننا على موسى وهارون

হারুন (আ)

হারুন (আ) ছিলেন মূসা (আ) এর ভাই। তিনি ছিলেন ইব্রাহিম (আ) এর সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি মূসা (আ) এর সাহায্যকারী ও প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-"আমি তো মূসা (আ) কে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারুনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম"। (সূরা আল-ফোরকান : ৩৫-৩৬ আয়াত) মূসা (আ) যখন চল্লিশ দিন এতেকাফের জন্য গমন করেন তখন হারুন (আ) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। সিনাই উপত্যকায় থেকে তিনি বনী ইসরাঈলীদের সাথে রাফিদিনে পৌঁছেন। এ জায়গা থেকে হারুন (আ) আল-মারখাওতে যান যেখানে মান্নাহ ও সালওয়া নাজিল হয়েছিল। হারুন (আ) মূসা (আ) এর ৩ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬

واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين

যুলকিফ্‌ল (আ)

কুরআন মজীদে 'যুলকিফ্‌ল' নামটি দু'বার উল্লেখ হয়েছে। দু'বারই অন্যান্য নবীদের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উল্লেখ হয়েছে সূরা সোয়াদে এভাবে ঃ "ইসমাঈল, আল ইয়াসা আর যুলকিফল-এর কথা স্মরণ করো। এরা সবাই ছিলো উত্তম মানুষ।"

যুলকিফল ছিলেন বনি ইসরাঈলের একজন নবী। কেউ কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন আইয়ুব (আ) এর পুত্র। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ ভাগ্যবান। এটি ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর মূল নাম ছিল 'বিশর'। তিনি বাইশ বছর যাবত বনি ইসরাঈলীদের মাঝে নবুয়্যতের দায়িত্ব পালন করেন।

১৭

وان الياس لمن المرسلين

ইলিয়াস (আ)

ইলিয়াস (আ) জর্দানের জিলিয়াদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হারুন (আ) এর বংশধর ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-"নিঃসন্দেহে ইলিয়াছ রাসূলগণের অর্ন্তভুক্ত, যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না ? তোমরা বায়ালকে ডাকছো অথচ সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিহার করছো ? সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদের এবং পূর্ব-পুরুষদেরও প্রভু"। (সূরা আস-ছাফ্‌ফাত : আয়াত ১২৩-১২৬) পবিত্র কুরআনে তাঁর নাম ৩ বার এসেছে। ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারকদের মতে ৪ জন নবী এখনো জীবিত আছেন যারা হলেন ইদ্রিস (আ), খিজির (আ), ইলিয়াস (আ) ও ঈসা (আ)। ইলিয়াস (আ) সিমেটিক জাতিকে হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর জাতি ইলিয়াস (আ) এর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তাঁর সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ইলিয়াস (আ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে ফলে আল্লাহ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যান বলে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়।

www.pathagar.org

Calender 2004

আল কুরআনে নবী ও রাসূলগণ

১৮ واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العلمين
আল ইয়াসা' (আ)

আল ইয়াসা' হলেন আল-ইসবাত ইবনে আদি ইবনে সাওতালম ইবনে আফ্রাছিম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম খলিল (আ)। বলা হয় আল ইয়াসা' (আ) ছিলেন ইলিয়াছ (আ) এর চাচাত ভাই (ইবনে কাসির)। তাঁর পিতার নাম ছিল সাফাত। কথিত আছে ইলিয়াছ (আ) যখন কাসিউন পাহাড়ে সংগোপনে অবস্থান করছিলেন, তখন আল ইয়াসা' (আ) তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। তাঁর জীবনের আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঃ আরীহার পানি ছিল ব্যবহারের অনুপযোগী। আল ইয়াসা' (আ) সেই পানিতে লবণ নিক্ষেপ করলে পানি নির্মল ও সুপেয় হয়ে গিয়েছিল।

১৯ واتينا داؤد زبورا
দাউদ (আ)

দাউদ (আ) ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াকুব (আ) এর ১২ পুত্রের মধ্যে ইয়াহুদার বংশধর ছিলেন। তিনি ছিলেন সু-বক্তা ও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। যখন তিনি যাবুর কিতাব পাঠ করতেন তখন আকাবা উপসাগরের মাছ, আকাশের পাখি, বনের পশু স্থির হয়ে আল্লাহর কিতাব শুনতো। আকাবা উপ-সাগরের তীরে বসে তিনি প্রতি শনিবার যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। দাউদ (আ) ঐ এলাকার মানুষকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা শনিবারে বাঁধ দিয়ে মাছ আটকে রেখে অন্যদিন ধরতো। ফলে আল্লাহর গজবে তারা বানরে পরিণত হয়। পবিত্র রমজান মাসের ১২ তারিখ তাঁর উপর যাবুর কিতাব অবতীর্ণ হয়। তিনি পশু-পাখির ভাষা বুঝতেন। হযরত দাউদ (আ)-ই প্রথম, যিনি একাধারে রাসূল এবং সুদক্ষ রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "হে দাউদ ভূ-পৃষ্ঠে আমি তোমাকে আমার খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।" (সূরা ছোয়াদ : আয়াত-২৬) তিনি মূসা (আ) এর শরিয়ত পুনরুজ্জীবিত করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে তিনি শরহুম উবারক নামে পরিচিত। তাঁর সময়ে Demography শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে, তিনিই প্রথম পৃথিবীতে মানুষ গণনা বা আদমশুমারী শুরু করেন। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রীয় Treasury গঠন করেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির প্রচলন শুরু হয়। জেরুজালেমে একটি উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করেন যেখানে উঁচুতে মরু সাগর এবং জর্দান নদী দেখা যেত।

মানবতার বন্ধু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) আরবের মক্কা নগরীতে মাতা আমিনার কোলে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। ৫ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ-মা হালিমার কাছে থাকেন। অতঃপর পিতৃব্য আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। মক্কায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৭ বছর বয়সে হিলফুল ফুযুল নামক শান্তি সংঘ গঠন করেন। অতঃপর ৬১০ খৃষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন।

কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নবুওয়্যাতের ৫ম বর্ষে প্রথম পর্বে ১৬ জন মুসলমান আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন এবং দ্বিতীয় দফায় আরো হিজরত করেন ৮৩ জন মুসলমান। এ সময় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা কুরাইশ নেতা উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমবারের মত মুসলমানেরা কাবা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করে। ৪৭ বছর বয়সে শি'য়াবে আবুতালিবের অবরোধ জীবন শুরু হয় এবং ৪৯ বছর বয়সে সমাপ্তি ঘটে। তিনি নবুওয়্যতের ১০ম বর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন, তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং নির্মম নির্যাতন করে। ৫১ বছর বয়সে নবুওয়্যতের ১২ বর্ষে আকাবা নামক স্থানে ১২ জন মদীনাবাসী বাই'য়াত গ্রহণ করেন। তিনি ৫২ বছর বয়সে আয়েশা (রা) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

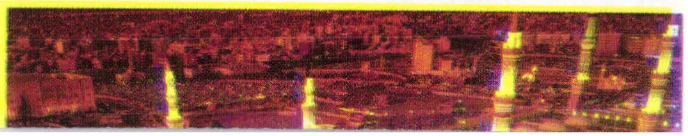

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

م

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)

২১ وان يونس لمن المرسلين
ইউনুস (আ)

ইউনুস (আ) ইরাকের নিনেয়া শহরে যার বর্তমান নাম মসুল, বাগদাদ থেকে ৩৯৬ কিঃ মিঃ উত্তরে ফোরাত নদীর তীরে খৃঃ পূর্ব ৩৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আসতাহ। তিনি ২৮ বছর বয়সে নবুওয়্যতের দায়িত্ব পান। নিনেয়াবাসী যখন ইউনুস (আ) এর কথা অমান্য করে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল এবং পয়গাম্বরের কথায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিল তখন তিনি বদদোয়া করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিলেন। যাবার কালে ফোরাত নদীর তীরে নৌকায় উঠার পর প্রচণ্ড ঝড় তুফান শুরু হলো। তখন যাত্রীরা লটারীর সাহায্যে ইউনুস নবীকে দায়ী করে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর হুকুমে নদীর মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে মাছের পেটে তিনি জীবিত আছেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে এস্তেগফার ও তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। আর আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। পরে মাছ তাঁকে মুখ দিয়ে উগরিয়ে নদীর তীরে ফেলে দিল। তিনি সেখানে একখানা কুঠির নির্মাণ করে কিছু দিন বসবাস করেন এবং আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় মসুলে ফিরে যান। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন পাকে বলেনঃ "আর ইউনুস অবশ্যই প্রেরিত পুরুষদের অন্যতম।" (সূরা আস সাফফাত : আয়াত-১৩৯)

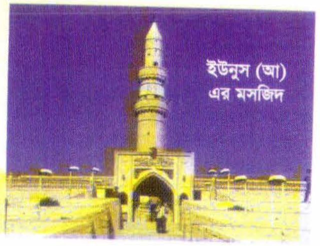

ইউনুস (আ) এর মসজিদ

২২ ذكر رحمة ربك عبده زكريا
যাকারিয়া (আ)

যাকারিয়া (আ) প্রায় ২১০০ বছর পূর্বে ফিলিস্তিনে বনি ইসরাঈল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) এর বংশধর ছিলেন তার স্ত্রী ইশা বা আল ইয়শ হারুন (আ) এর বংশীয় ছিলেন।

www.pathagar.org

দাউদ (আ) এর টাওয়ার

انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

২০ সুলাইমান (আ)

লাইমান (আ) খৃঃপূর্ব ১০৩৫ অব্দে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দাউদ (আ) এর সুযোগ্য ত্র। বায়তুল মাকদাস যা সুলাইমান (আ) পুনঃনির্মাণ করেন। বায়তুল মাকদাসের দৈর্ঘ ৬০ হাত এবং প্রস্থ ০ হাত উচ্চতা ৩০ হাত ছিল। সুলাইমানকে আল্লাহ তায়ালা জীনকে বশীভূত করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। । সম্পর্কে আল্লাহ বলেন "আর বশীভূত করে দেয়া হয়েছে অবাধ্য জীনকে, যে সর্বপ্রকার কর্ম সমাধাকারী, মারাত নির্মাণকারী এবং সমুদ্রে ডুবুরী রূপে।" (সূরা ছোয়াদ : আয়াত-৩৭) মাসজিদুল আকসার পুনঃনির্মাণে ৩০,০০০ শ্রমিক সাত বছর যাবৎ পরিশ্রম করেন। তাঁর শাসন কালে খনিবিদ্যার সূচনা হয়।

মসজিদুল আকসা

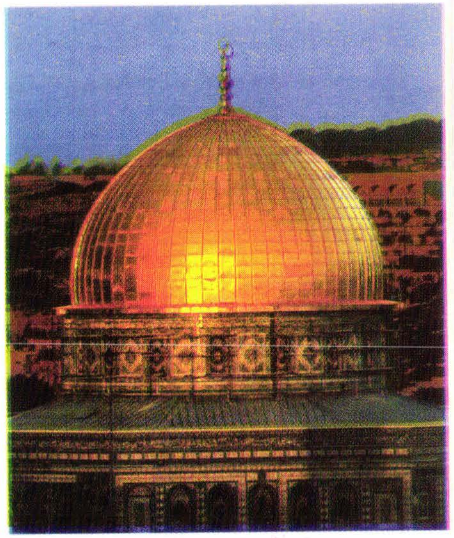

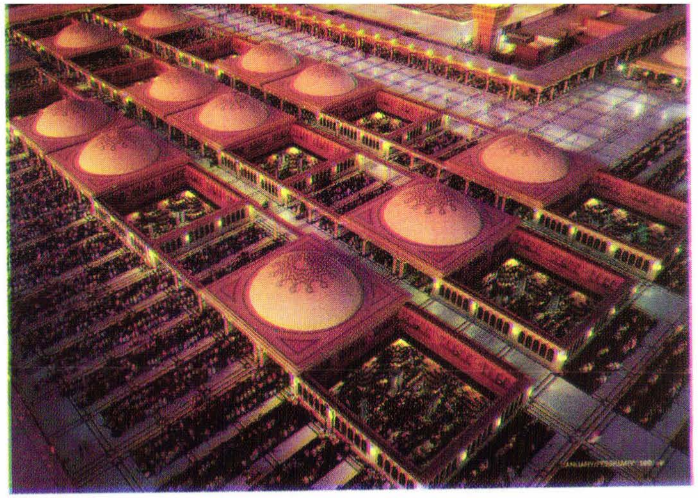

অতঃপর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে আল্লাহর হুকুমে ৬২২ খৃষ্টাব্দে আবুবকর (রা) কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে ওঠেন। বানুনা উপত্যকায় বনী সালেম পল্লীতে ১০০ জন সাহাবী নিয়ে সর্বপ্রথম জুমার নামাজ আদায় করেন।

৬২৩ খৃষ্টাব্দে কাফিরদের সাথে ১৭ রমজান বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে রাসূল (সা) কাফিরদের মুকাবেলায় বিজয় লাভ করেন। ৩য় হিজরী ১১ শাওয়াল বিখ্যাত ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং রাসূল (সা) এর চাচা হামযা (রা) সহ ১৭ জন মুসলিম সৈনিক শাহাদাত বরণ করেন। ৪ হিজরীতে সফর মাসে 'বীর মাউনা' নামক স্থানে ৬৮ জন ইসলাম প্রচারক সাহাবীকে কাফিররা নির্মমভাবে হত্যা করে। মহানবী (সা) কে হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে রবিউল আওয়াল মাসে বনু নাযির গোত্রকে মদীনা প্রজাতন্ত্র থেকে বহিস্কার করা হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ১৫শত সাহাবী নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করেন। এবং হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফিররা বাধা প্রদান করে। সেখানে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ৮ হিজরীতে যায়িদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে সিরিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। জামাদিউল আওয়াল মাসে সিরিয়ার খৃষ্টান নেতা শোরাহবীলের বাহিনীর সাথে 'মুতা' নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শাহাদত বরণ করেন। ৮ হিজরী (২০ রমজান) ৬২ বছর বয়সে ১০ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে মহানবী (সা) বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে মহানবী (সা) ইন্তেকাল করেন। ১৪ রবিউল আওয়াল রাসূল (সা) এর দাফন সম্পন্ন হয়।

১৪১১ বাংলা	2004	١٤٢٥ هجرى

মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু তার জামার একটি অংশ বাইরে থাকায় আল্লাহর দ্বীনের শত্রুরা গাছটি করাত দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত করলে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন।

يا يحيى خذ الكتاب بقوة

২৩ ইয়াহইয়া (আ)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন "হে যাকারিয়া আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করছি এক পুত্রের, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। পূর্বে আর কারো জন্য এ নাম নির্ধারিত করিনি" (সূরা মরিয়াম : আয়াত-৭) যাকারিয়া (আ) এর দোয়ার বরকতে বন্ধা মাতার গর্ভে খৃঃপূর্ব ১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াহইয়াহ (আ)। তিনি ঈসা (আ) এর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময় নির্জনে খোদার প্রেমে কান্না কাটি করে কাটাতেন। তিনি ইয়ারদান নদীর তীরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ইয়াহইয়া (আ) মানুষকে ৫ টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিতেন। ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা ২. সালাত আদায় করা। ৩. রোযা পালন করা । ৪. অধিক পরিমাণ আল্লাহর যিকির করা ৫. দান সাদকা করা।

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون

২৪ ঈসা (আ)

বায়তুল লাহম যেখানে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা আরবী শব্দ। হিব্রু ভাষা Joshua এর অর্থ হলো ত্রাণকর্তা। গ্রীক ভাষায় বলা হয় Chirst। মাসীহ তার উপাধি। এর অর্থ স্পর্শ করা। কারণ ঈসা (আ) রুগ্ন রোগীকে স্পর্শ করা মাত্রই সুস্থ হয়ে যেত। ঈসা (আ) মারইয়ামের গর্ভে আল্লাহর কুদরতে পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা (আ) এর ৫টি মুযেজা ছিল

১। তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন।
২। মাটির তৈরি পাখিকে ফুঁ দিলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ে যেত।
৩। অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ফুঁ দিলে আল্লাহর কুদরতে ভাল হয়ে যেত।
৪। মানুষ তাদের ঘরে যে খাদ্য খেতো তিনি তা বলে দিতে পারতেন।
৫। ঈসা (আ) এর সঙ্গীদের অনুরোধে আল্লাহর কুদরতে আকাশ থেকে খাদ্য ভরা পাত্র নাযিল হত।

তিনি ৩০ বছর বয়সে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তার উপর ইনজিল কিতাব নাযিল হয়। বনি ইসরাঈলগণ তাকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাকে উর্ধ্ব জগতে নিয়ে যান।

কাবার ভিতরের কারুকাজ

মদীনার ভিতরের কারুকাজ

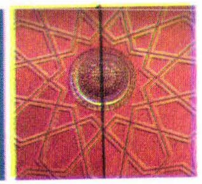

www.pathagar.org

calender 2005

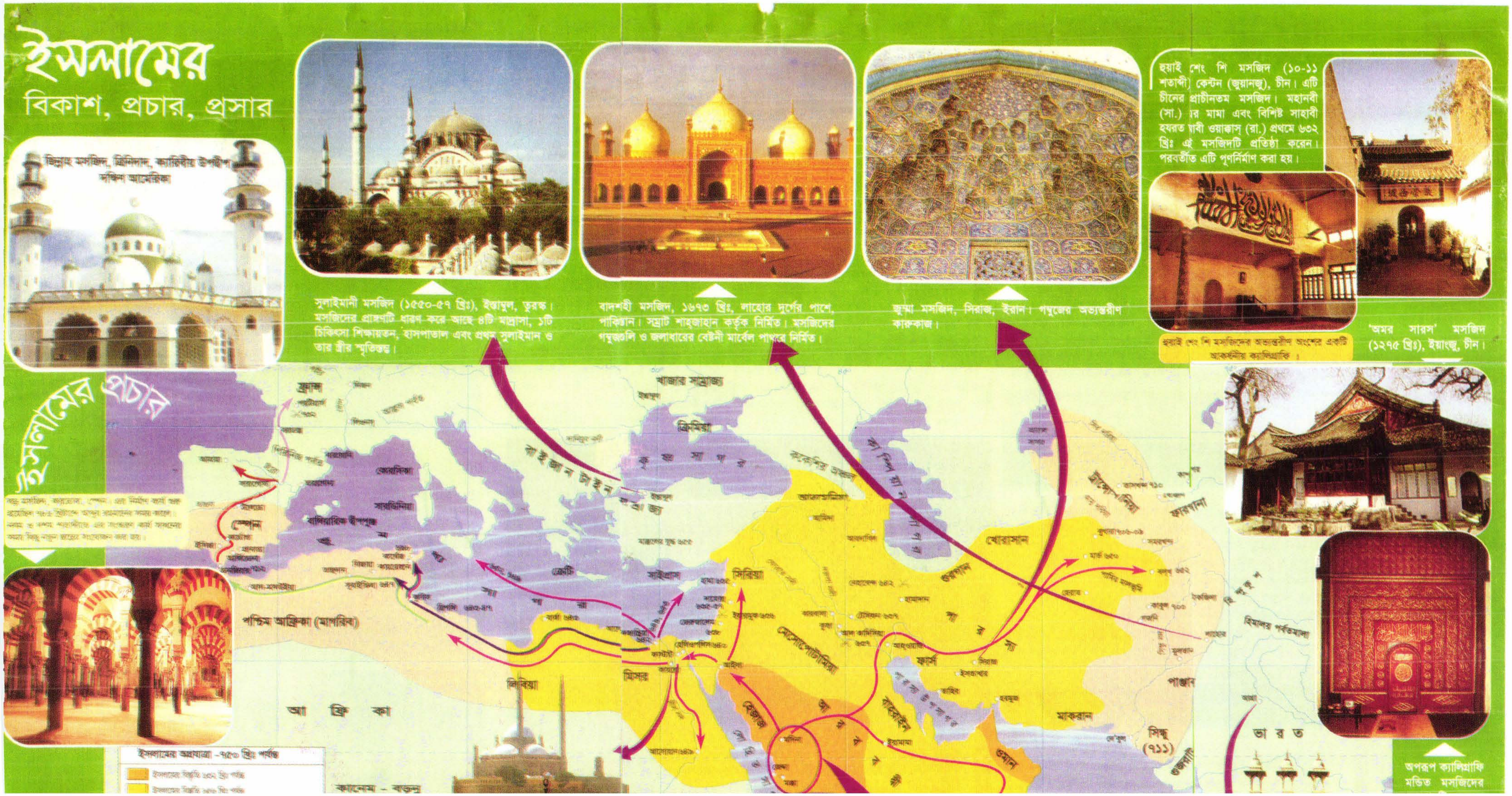

www.pathagar.org

ইসলামের বিকাশ

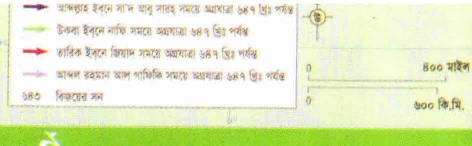

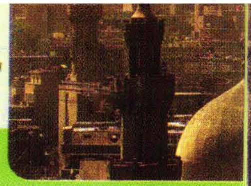

মুহম্মদ আলী মসজিদ (১৮৩০-৪৮ খ্রিঃ), কায়রো, মিশর। তুর্কি স্থাপত্যকলা এবং আরবীয় স্থাপত্যকলার মিশ্রিত নির্মাণ শৈলী।

মতি মসজিদ (১৬৪৬-৫৩ খ্রিঃ), আগ্রার লালকেল্লা, ভারত। মোগল সম্রাট শাহজাহানের সম্মানে এ মসজিদ নির্মিত হয়।

মহাদেশ	২০০৩ সালের জনসংখ্যা	২০০৩ সালের মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার
আফ্রিকা	৮৬১.২	৪১৪.২৬	৪৮.১
এশিয়া	৩৮৩০.১	১০১০.৬৫	২৬.৩৯
ইউরোপ	৭২৭.৪	৫১.১৯	৭.০৪
উত্তর আমেরিকা	৩২৩.১	৬.৬২	২.০৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৫৩৯.৭৫	১.৬৪	০.৩
অস্ট্রেলীয় এলাকা	৩২.২৩	০.৩৫	১.০৯
বিশ্ব জনসংখ্যা	৬৩১৩.৭৮	১৪৮৪.৭১	২৩.৫২

বিশ্বে মহাদেশভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার (২০০৩ খৃঃ)

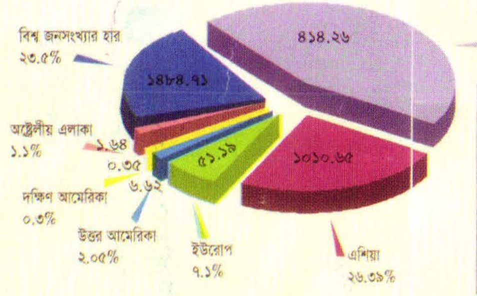

তথ্য উৎস : Islamic Population web site

ইসলামের বিজয়

ইসলামের প্রসার

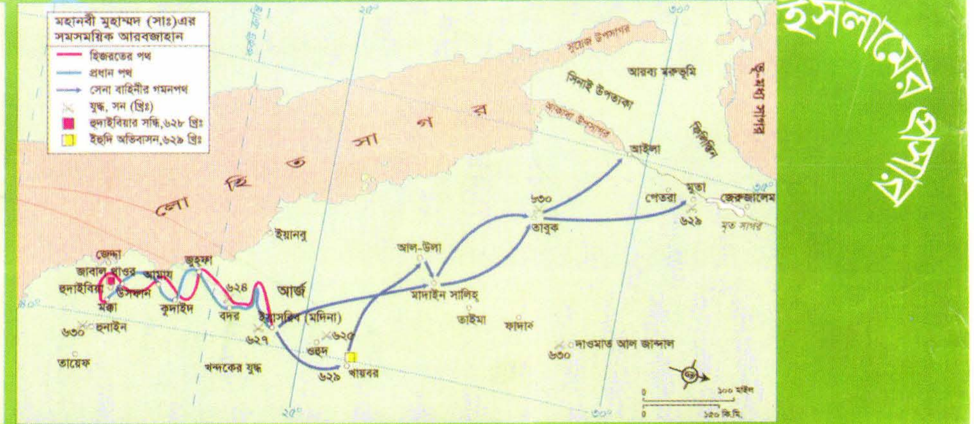

ইসলাম 'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আরবী ধাতু ' سلم ' থেকে (سَلَّمَ - অর্থ আপোষ, সন্ধি, মাথানত করা, সমর্পণ করা; سِلْم - অর্থ শান্তি, আনুগত্য); যার অর্থ হচ্ছে - আল্লাহ'র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা। এটা মূল ইহুদী এবং মূল খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মৌলিক বিশ্বাস 'একত্ববাদ' এবং 'ওহী' (ঐশীবাণী) প্রবর্তন বিশ্বাসের ধারাবাহিকতার পূর্ণাঙ্গ ক্রমধারা মাত্র। ইব্রাহীম (আঃ) কে কুরআন শরীফে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে আখ্যা দেয়ায় 'তৌরাত' (Old Testament) এবং 'ইঞ্জিল' (New Testament)এর মূল সুরের একটি অনুরণন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং এটা হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবহিতৈষী সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা।

মহানবী এবং শেষনবী মহানবী ও শেষনবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-(৫৭০-৬৩২ খ্রিঃ) ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মানবীয় গুণে গুণান্বিত। ওহী নাজিলের ক্রমধারায় তাঁর উপর সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন' এর প্রথম ওহী নাজিল হয় ৬১০ খ্রিঃ। অক্ষর জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বশক্তিমান কর্তৃক প্রেরিত ওহী মস্তিষ্কে ধারণ করে, পরে তা তাঁর অনুসারীদের(সাহাবী) নিকট প্রচার করতে থাকেন। জীবদ্দশায় তিনি প্রথমে মদিনা এবং পরে মক্কা ও তার আশেপাশে কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত আরব ইতিহাস বিশারদ, Prof. Philip K. Hitti তাঁর History of the Arabs গ্রন্থে প্রায় ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন মহানবীর আগমন-পূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর- যাকে 'আইয়্যামে জাহেলীয়্যা' বা অন্ধকারের যুগবলা হয়। তাঁর উপসংহারের শেষ তিনটি পংক্তি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিধায় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়- 'দক্ষিণ আরবের দীর্ঘদিনের সুসংগঠিত জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের ক্রমধারা ভঙ্গুর কিংবা বিনাশের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বল্গাহীনতার জন্য প্রচণ্ড নৈরাজ্য ও অরাজকতা বিরাজ করতে থাকে'। তাঁর সর্বশেষ পংক্তিটি হচ্ছে- **"The stage was set, the moment was psychological, for the rise of a great religious and national leader."** মোদ্দাকথা মুহাম্মদ (সাঃ)এর উত্থান শুধু ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্যই নয় বরং একটি জাতীয় প্রয়োজনের জন্যও আবশ্যকীয় ছিল। তাঁর ইন্তেকাল (৬৩২ খ্রিঃ)-এর অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম পূর্বদিকে সুদূর মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিমে এশিয়া, আফ্রিকা হয়ে উত্তরে ইউরোপের স্পেন এবং উত্তর-পূর্বে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বর্তমান বিশ্বের মানচিত্রে মুসলমান ও ইসলামী সংস্কৃতির পদচিহ্নের বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচীন আফ্রো-ইউরেশিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চল থেকে শুরু করে বর্তমানে ইসলামের বিস্তৃতি আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছে। ২০০৩ খৃষ্টাব্দের হিসেবে দেখা যায়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মানুষ এই ধর্মের অনুসারী যা সমগ্র বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর এক পঞ্চমাংশের বেশী (২৩.৫%)। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা OIC-ভুক্ত দেশের সংখ্যা মোট ৫৭ টি, পর্যবেক্ষক আছে ৩টি রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘসহ ৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। পরিসংখ্যান মতে (২০০১) সেখানে বসবাসকারী মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০০ মিলিয়ন। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১২৭ মিলিয়ন ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১২১ মিলিয়ন। চীনে প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মুসলিম বসবাস করে যদিও কাগজে-কলমে এই সংখ্যা প্রায় ১৭ মিলিয়নের কাছাকাছি।

ইসলামের বিকাশ, প্রচার, প্রসার ও বিজয়ের একটি সার-সংক্ষেপ গতানুগতিক সার্বজনীন ধারার ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনগ্রাহ্য একটি গতিশীল, বহুমুখী ও বহুমাত্রিক জীবনাচার হিসেবে বিশ্বজনীনতার গৌরবে ভাস্বর হয়ে আছে। তাই আজও এই ধর্মের জয়যাত্রা দেদীপ্যমন আলোক শিখার মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূলতঃ ধর্মীয় প্রচারাভিযাত্রী এবং বণিক সম্প্রদায়ের চারিত্রিক মাধুর্য, সততা, ন্যায়পরায়নতা ও সহমর্মিতামূলক আচরণে আকৃষ্ট হয়ে অনারব বিশ্বে ইসলাম ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। পরবর্তীতে মুসলিম বিজয়ী বীরেরা একের পর এক রাজ্য জয় করে ইসলামকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোভুক্ত করেন বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

মুসলিম সেনা প্রধান এবং বিজয়ীরা বিজিত এলাকার সামাজিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে অক্ষত রেখেই স্থানীয় মুসলিম গভর্নর নিয়োগ করে, তাঁদের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। যদিও ক্রমেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, স্থানীয় জনগণকে কখনো বাধ্য করে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়নি। বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, ইসলামকে সাদরে বরণ করার কারণসমূহের অন্যতম ছিল প্রশাসকদের বাৎসল্য, গণমুখীতা, মুক্তমন, মানবিকতা, সহমর্মিতামূলক আনুকূল্য, নাগরিক সুবিধা প্রদান, অন্য কৃষ্টি-সভ্যতা ও ধর্ম পালনকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিজিত এলাকায় প্রশাসক, সুফী ও ধর্মীয় ইমামগণ সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার হস্ত প্রসারিত রেখেছিলেন এবং যারাই 'জিজিয়া' প্রদান করতো তাদেরক পূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হতো। ফলে দেখা যায়, ইসলামের বিজিত কোন এলাকাতে কখনো গণ-বিক্ষোভ, গণ-অসন্তোষ কিংবা গণ-বিদ্রোহ কোনটাই হয়নি।

www.pathagar.org

Calender 2005

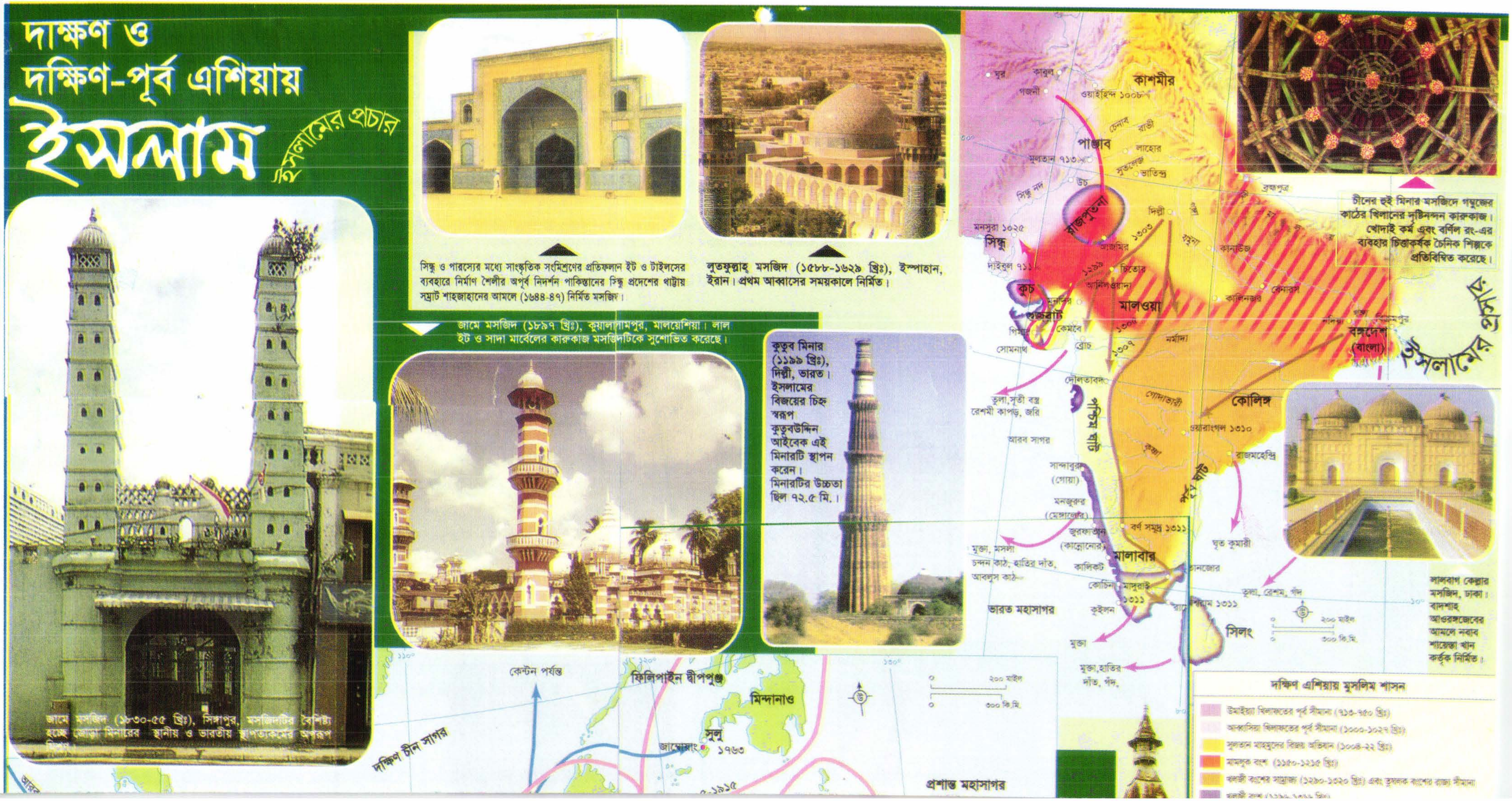

www.pathagar.org

ইসলামের বিকাশ

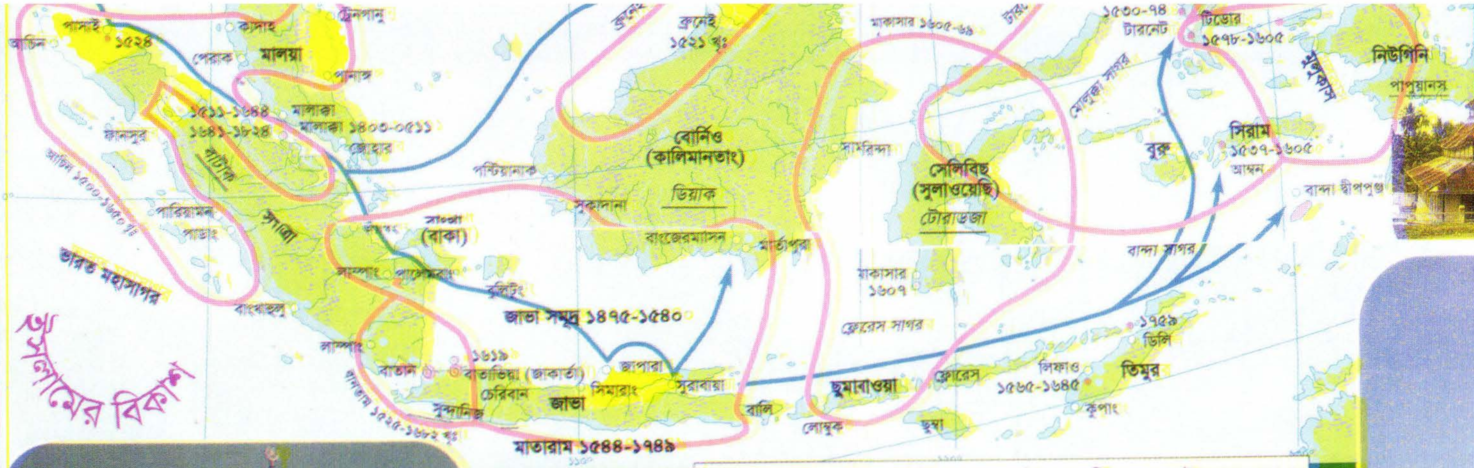

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চতুস্পার্শ্বে মহাসাগরীয় এলাকায় ইসলামের অবস্থা

সিমারাং	প্রাথমিক মুসলিম জনপদ	বাটাক	অমুসলিম বসতি
সিমারাং	মুসলিম সুলতানি আমল	১৭৬৩	স্পেনিশ উপনিবেশের সময়কাল
	ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলিম সুলতানি আমলের সম্ভাব্য সীমারেখা	১৫২৫	পর্তুগীজ উপনিবেশের সময়কাল
	বাণিজ্যিক পথ	১৬১৯	ডাচ্ উপনিবেশের সময়কাল

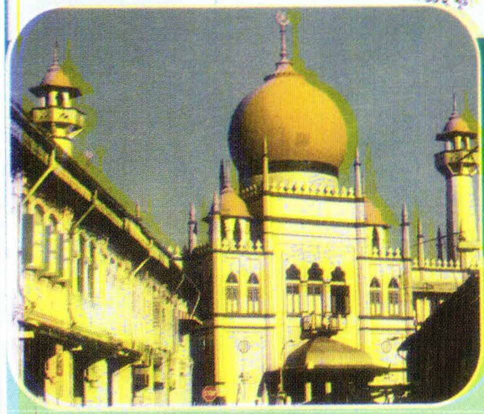

সিঙ্গাপুরের সুলতান মসজিদ। মসজিদটি প্রথমে ১৮২৫ খ্রিঃ নির্মিত এবং পরবর্তীতে ১৯২৪-২৮ খ্রিঃ পুনর্নির্মিত হয় মোঘল স্থাপত্য কলায়।

জুম্মা মসজিদ, সিংকারাক, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া (১৯ শতক)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ... ঐতিহ্যের নিদর্শন।

রাজকী (Royal) মসজিদ আগুং-এর অভ্যন্তরণ অংশ বিশেষ

রাজকীয় (Royal) মসজিদ আগুং (১৫৬৫ খ্রিঃ), বানতেং, পশ্চিম জাভা, ইন্দোনেশিয়া। বাতিঘর সদৃশ্য মিনারের জন্য মসজিদটি বিখ্যাত। এর স্থাপত্য কলায় ডাচ প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী যার সংখ্যা প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন। এ অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দু'টি প্রধান বিষয় ছিল - ব্যবসায়ীদের ভূমিকা এবং ধর্ম প্রচারক সুফী সম্প্রদায়ের মানবীয় কার্যকলাপ। যদিও আরবের উষর মরুভূমিতে ৭ম শতাব্দীতে ইসলাম উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিপূর্ব এশিয়ায় তা আবির্ভূত হয়েছিল ইরান, আফগানিস্থান এবং মধ্য এশিয়া থেকে বিস্তৃতির মাধ্যমে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড আরবীয়দের দ্বারা (৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দী) পর্যন্ত শুধু নিয়ন্ত্রিতই ছিল না বরং এক্ষেত্রে তাঁরা একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে স্থানীয় শাসকবৃন্দ এবং সম্ভ্রান্ত জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেন এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র অঞ্চল ইসলাম প্রধান হয়ে উঠে। তথ্য-প্রমাণাদিতে দেখা যায়, উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় প্রধানতঃ দু'টি মূল ধারায় অর্জিত হয়। প্রথমত মুসলিম সামরিক শক্তি এই উপমহাদেশে আগমনের পূর্বে ধর্মপ্রচারক ও আরবীয় বণিকগণের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম পথে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উত্তর দিক থেকে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটে সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমান হওয়া প্রথম রাজা হচ্ছেন চের রাজ্য (মালাবার/কেরালা)এর রাজা 'চেরুমান পেরুমাল'। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বর্ণনা থেকে জানা যায়, ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে মিনায় অবস্থানরত যে সন্ধ্যায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবিশ্বাসীদের ব্যাপক দাবীর চাপে চাঁদকে অঙ্গুলী নির্দেশে দ্বিখণ্ডিত করে পুনরায় একত্রিত করেন- রাজা চেরুমান ঐ সময় কয়েকজন সহচরসহ আশ্চর্যান্বিত হয়ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর তিনি রাজকীয় জ্যোতিষীকে এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করার নির্দেশ দেন। জ্যোতিষী গণনান্তে রাজাকে জানালেন যে, আরবে একজন মহামানব ঐশী বাণী নিয়ে এসেছেন-তিনিই এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। এরপর বিস্মিত রাজা চেরুমান নৌ-পথে আরবের মক্কায় গিয়ে একদল অনুচরসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ রাজা চেরুমান পেরুমাল নামেরই আরবীকরণ হচ্ছে ইতিহাস উদ্ধৃত রাজা 'চেরামল মালিক'- রাসূল (সাঃ) মক্কী জীবনে যার ইসলাম গ্রহণ আরবে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজার মৃত্যু সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায় - (১) রাজা মক্কা থেকে ফেরার পথে 'সফর' কিংবা 'শহর নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন-কিন্তু এর পরপরই চেররাজ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং ঐ রাজ্যের রাজধানী 'কর্ণক্লোর' বা 'ক্রাঙ্গানূর' এ প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। (২) রাজা নিজে ফিরে এসে প্রথম মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং তাঁর ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তবে সমসাময়িককালেই রাজ্যে পর পর ১০টি মসজিদ নির্মিত হয় - এ বিষয়ে উভয়েই একমত।

ভারতীয় উপমহাদেশে রাজা দাহিরের রাজত্বকালে (৭১২ খ্রিঃ) মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের তদানীন্তন শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণ ও জয় করেন। এসময়ে ইসলাম জাহানের খলিফা ছিলেন উমাইয়া বংশের আল ওয়ালি। পরবর্তীতে প্রায় তিন শতাব্দী পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলহ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে (১০০০-১০২৭ খ্রিঃ পর্যন্ত) মোট সতের বা ভারতবর্ষে আক্রমণ চালান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবকে গজনীর অন্তর্ভূক্ত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে (১১৯২ খ্রিঃ) মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লী ও আজমীর দখল করেন। এবং তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেককে দিল্লীর শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। ১ শতাব্দীতে কুতুবুদ্দিন আইবেকের দিল্লী সিংহাসনে আরোহনের পরেই ইসলামের অবস্থান ভারতে দৃঢ় হয়। তার সময়কালেই সেনাপতি ইখ্তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদবখ্তিয়ার খলজী বিহার ও বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন (১২০৪-০৫ খ্রিঃ)। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের প্রচার অবারিত ধারায় প্রসারিত হতে থাকে।

www.pathagar.org

2005

আফ্রিকা ও ইউরোপে ইসলাম

জিন্নে মসজিদ, (১৯৩৫ খ্রিঃ- পুনর্নির্মিত), মপটি, আফ্রিকা। স্থানীয় ঐতিহ্যগত শিল্পকলার অনুকরণে নির্মিত।

বড় মসজিদ (১৯০৯ খ্রিঃ), জিন্নি, মালি, আফ্রিকা। ফরাসীদের তত্ত্বাবধানে এই মসজিদটি গড়ে উঠে।

মাড়িং শিল্প কলায় নির্মিত গ্রামীণ মসজিদ (১৮ শতাব্দী), চেসা নগরী, উত্তর ঘানা।

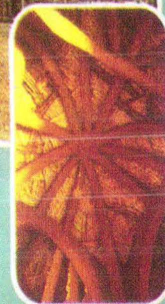

বড় মসজিদ (১৮৩৯-৮৩ খ্রিঃ), ডিঙ্গরাইয়া, গিনি। ধর্মীয় নেতা আলহাজ্জ ওমর এ মসজিদ স্থাপন করেন। এর গম্বুজ মাডালা নামক পবিত্র সৃষ্টিকাঠামোতে তৈরী।

ইসলামের প্রচার

ইসলামের প্রসার

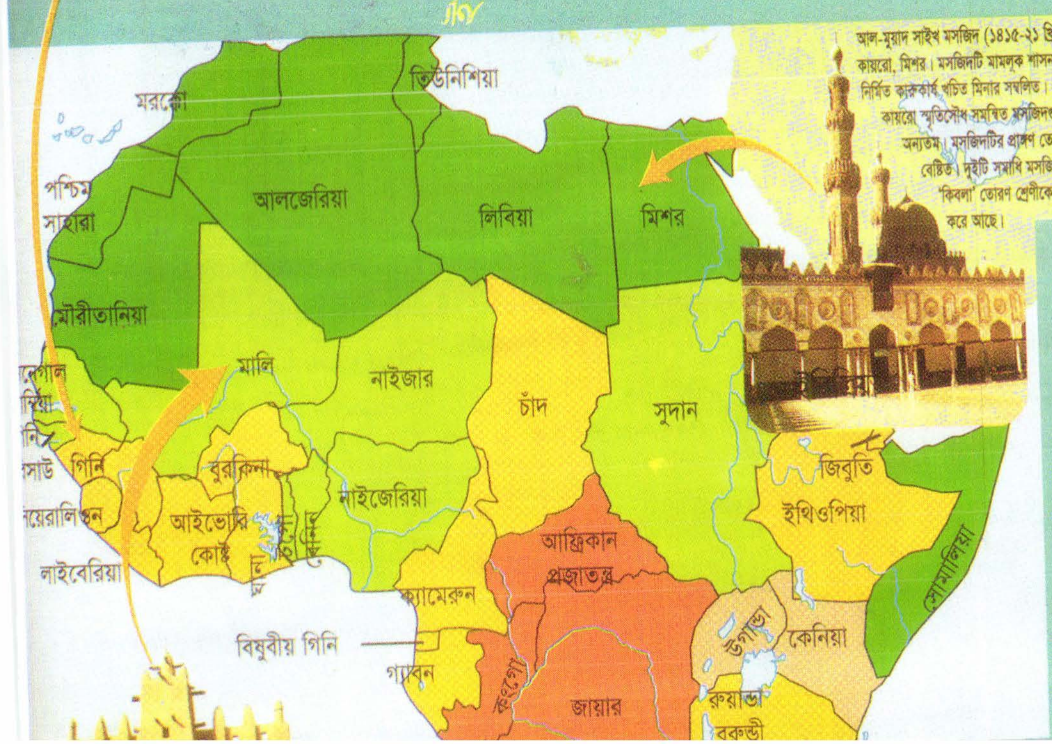

আল-মুয়াদ সাইখ মসজিদ (১৪১৫-২১ খ্রিঃ), কায়রো, মিশর। মসজিদটি মামলুক শাসনামলে নির্মিত কারুকার্য খচিত মিনার সম্বলিত। এটি কায়রো স্মৃতিসৌধ সমন্বিত মসজিদগুলোর অন্যতম। মসজিদটির প্রাঙ্গণ তোরণ বেষ্টিত। দুইটি সমাধি মসজিদটির 'কিবলা' তোরণ শ্রেণীকে বেষ্টন করে আছে।

মলিন্দি মসজিদ (১৮ শতাব্দী), জানযিবার।

ইসলামের প্রসার

ইসলামের বিকাশ

ইসলামের বিজয়

www.pathagar.org

গ্রামীণ মসজিদ (১৯৬০ খ্রিঃ-পুনর্নিমিত), সিগো, মালী, আফ্রিকা। এই মসজিদটি স্থানীয় স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত।

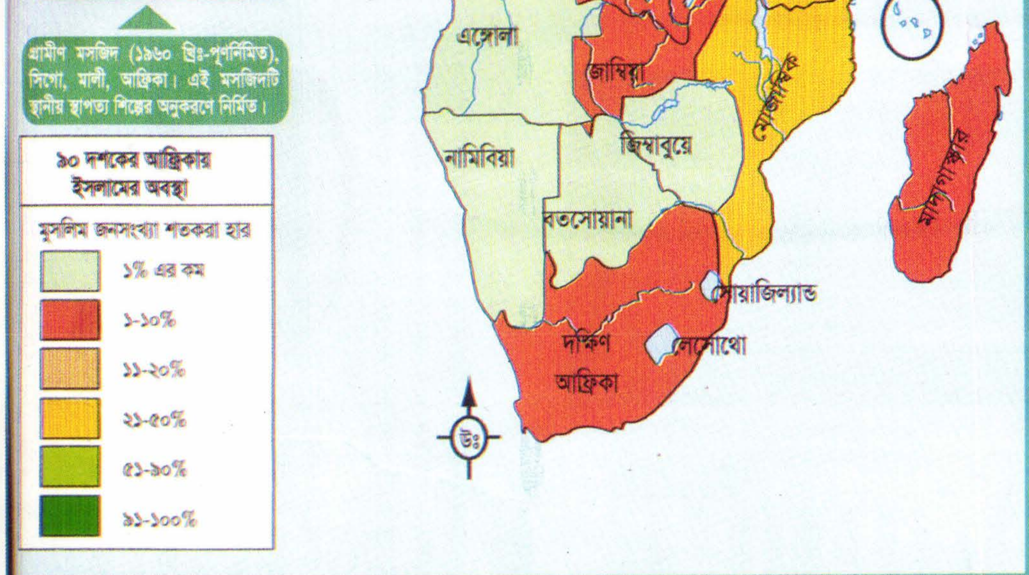

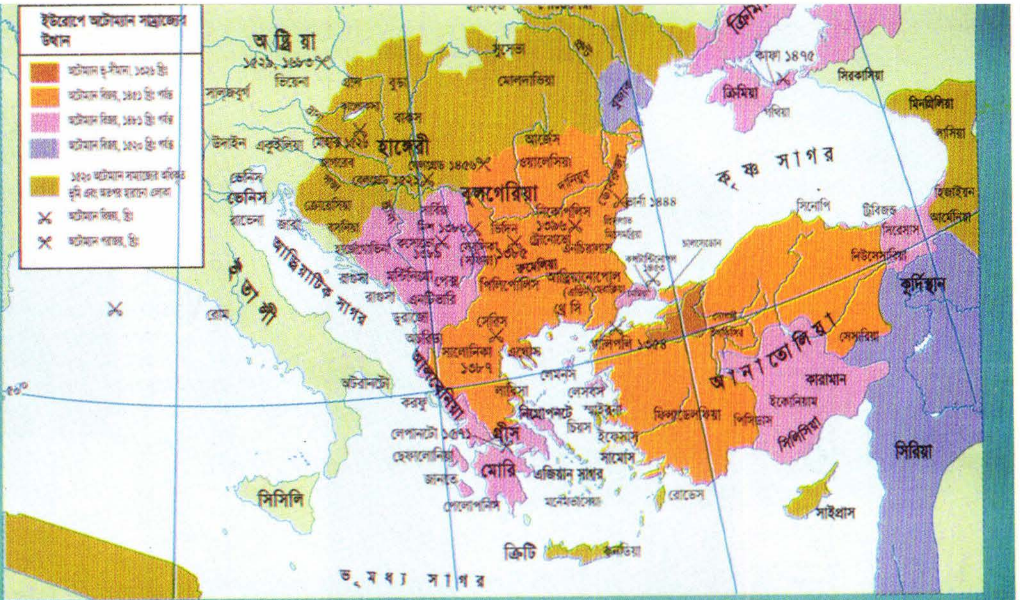

ব উপদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন আফ্রো-ইউরোপ এলাকায় ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনাবসান (৮ জুন, ৬৩২ খ্রিঃ) হলে মুসলিম জাতি নহীন না হয়ে তাঁর নির্দেশিত 'শুরা' বা পরামর্শভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কভাবে নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে মহানবী (সাঃ) সফল হয়েছিলেন চারজন সুনিয়ন্ত্রিত খলিফা-খোলাফায়ে রাশেদীনসহ আরও অনেক আনুগত্যশীল, নিবেদিত ও একনিষ্ঠ অনুসারী (সাহাবা)দের দ্বারা। আরব জাহানের বাইরে রাজ্য বিজয় শুরু হয় এই খলিফাদের শাসনামলেই (৬৩২-৫৬ খ্রিঃ)– প্রাথমিকভাবে মূলতঃ উপজাতীয় অভিবাসন এর মাধ্যমে।

বিশেষ করে ২য় খলিফা উমর ইবনে-আল-খাত্তাব (৬৩৪-৪৪ খ্রিঃ) এর আমলে বিভিন্ন বিজিত এলাকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেতৃত্ব কিছুটা নুক্রমিক হয়ে উঠে এবং উমাইয়া বংশ (৬৬১-৭৫০ খ্রিঃ) আবির্ভূত হয় কুরাইশ বংশের আভিজাত্য থেকে। 'খোলাফায়ে রাশেদীন' মক্কা এবং মদিনায় স্থায়ী হয়ে ছিলেন কিন্তু উমাইয়া বংশ তাদের শাসনকেন্দ্র দামেস্কে সরিয়ে নেন। তাঁদের পরবর্তী আব্বাসীয় শাসকগণ-যারা অপেক্ষাকৃত কম আরব কেন্দ্রীক ছিলেন, বাগদাদে একটি নতুন রাজধানী গড়ে তুলেন। দজলা (Tigris), ফোরাত (Euphrates) বিধৌত বাগদাদ ছিল ইরাক, ইরান এবং সিরিয়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রধান কেন্দ্র।

যদিও ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সম্ভবতঃ কোন সু-সংগঠিত মুসলিম সৈন্যদলের (Regimented Cantonment Type) আবির্ভাব হয়নি, কিন্তু সংগঠিত হওয়ার পরপরই এই সৈন্যদল সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং খালিদ-ইবনে-আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে পূর্বদিকে সাসানিয়ান সাম্রাজ্য এবং উত্তর দিকে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় অভিযান শুরু করেন। ৬৩৫ খ্রিঃ কাদেসিয়ার যুদ্ধে দুর্দান্ত পারসিকদের এবং ৬৩৬ খ্রিঃ 'ইয়ারমুক'-এর যুদ্ধে প্রতাপশালী 'বাইজানটাইন' বাহিনীকে পরাজিত করে ৬৪০-৪১ খ্রিঃ মিশর জয় করেন। ৬৪৬ খ্রিঃ 'হেলিও পলিস' এবং 'আলেকজান্দ্রিয়া' বিজিত হয়। উমাইয়াদের দ্বারা মিশরের ফস্তাত নগরী গড়ে উঠেছিল ৬৪৩ খ্রিঃ এবং এরপর তাঁরা উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা করতলগত করেন। সমসাময়িক কালে সাইপ্রাস এবং সিসিলির বিরুদ্ধে নৌ অভিযান শুরু হয়েছিল এবং এসময় মুসলিমরা একটি বৃহৎ নৌ শক্তিতে পরিণত হয়। ৮ম শতাব্দীতে উমাইয়া খলীফা আল ওয়ালিদের আমলে ইসলাম আরো ব্যাপকতা লাভ করেছিল ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা থেকে স্পেন এবং ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃতির মাধ্যমে।

কা মহাদেশ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও বিকাশ ঐতিহ্যগতভাবে ব্যাপক দাওয়াতী কর্মকাণ্ড, অভিবাসন (হিজরত), সামরিক বিজয় বাণিজ্য দ্বারা সংগঠিত হয় মূলতঃ চারটি ধাপে।

র্যায়টি (৭-৮ শতাব্দী) সংগঠিত হয় উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা এবং মিশরে সামরিক বিজয়ের দ্বারা। ক্রমে এই বাণিজ্য পথ ভূ-সাগরের তীরবর্তী বন্দরসমূহ থেকে শুরু করে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত চারণভূমি (Grass Land) এবং বৃষ্টিবিধৌত বনভূমি in Forest) অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১০ম শতাব্দীতে সমগ্র দক্ষিণের স্বর্ণ ব্যবসা, উত্তরের লবণ ব্যবসা এবং কৃতদাস, শীতবস্ত্র ও বিলাস সামগ্রীর যাবতীয় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী ঘানা সাম্রাজ্য মুসলিমদের করদভুক্ত হয়। অত্র এলাকায় বসবাসকারী প্রায় সকলেই এই নীদের প্রভাবে ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে পড়ে।

র্যায়ে (১১-১৪ শতাব্দী) ইসলাম সাহারার মধ্যদিয়ে পশ্চিম আফ্রিকায় ও নীলনদ দিয়ে সুদানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে পাড়ি দিতে হয়েছিল বিস্তৃত বাণিজ্যিক পথ, যা পশ্চিম এবং উত্তর আফ্রিকাকে সংযুক্ত করেছিল।

৩য় পর্যায়ে (১৬-১৮ শতাব্দী) রাজ্য গঠনে মুসলিম বণিকসহ মুসলিম পণ্ডিত এবং সুফীদের প্রভাব ছিল মূল চালিকা শক্তি স্বরূপ। একথার সাক্ষ্য প্রমাণ করে 'ফাঙ্গ' (Funj) এর মুসলিম সুলতান প্রতিষ্ঠিত 'কানেম-বরনু' (Kanem-Borno) সাম্রাজ্য, যা মূলতঃ 'উলামা'দের দ্বারা পরিচালিত হতো।

আফ্রিকায় ইসলাম প্রসারের ৪র্থ ধাপ শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং বিশেষায়িত হয়েছিল সুফীদের দ্বারা, বিশেষ করে কাদেরিয়া এবং তিজানীয়াহ্এর প্রভাবে। একইসাথে ক্রমে সমৃদ্ধশালী হচ্ছিল ব্যাপক ইসলামী কর্মকাণ্ড এবং পুনরুত্থান - যা একটি সংঘবদ্ধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে। ফলতঃ ১৮০৪ সালে 'হাউজাল্যান্ড' (Hausaland)এর 'সোকোতো' (Sokoto) রাজ্যের ওসমান-ডান-ফোডিও কর্তৃক ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব সুদানে (১৮৮২-৯৬ খ্রিঃ) স্থায়ী 'মাহদীবাদী' রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে উপনিবেশবাদী শক্তিকে পরাভূত করা হয়।

www.pathagar.org

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

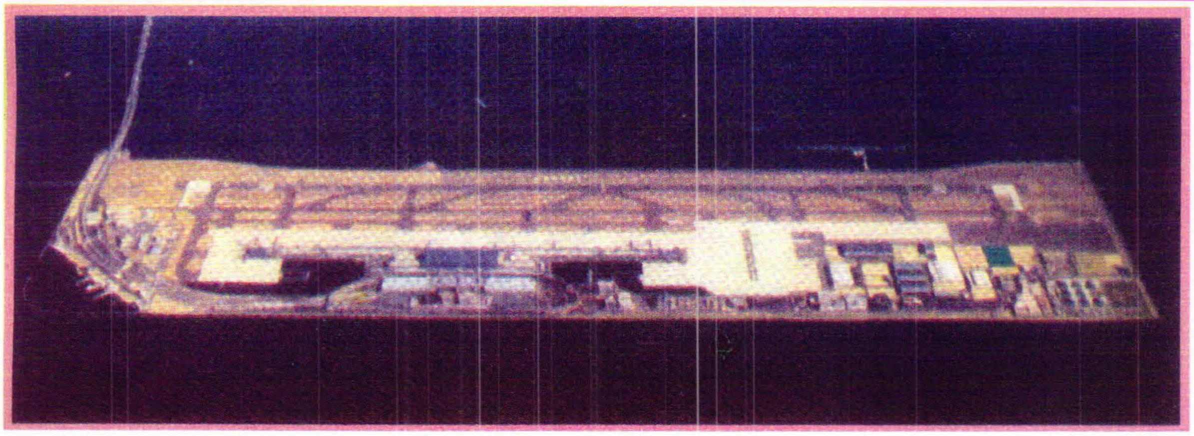

দ্বীপের ওপর বিমানবন্দর

৪.৫ কিলোমিটার (২.৮ মাইল) দীর্ঘ এবং ২.৫ কিলোমিটার (১.৫ মাইল) প্রশস্ত একটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করা হয়েছে ওসাকা উপসাগরের ওপর। জাপানের কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপন করাই ছিল দ্বীপটির মূল উদ্দেশ্য। জনবহুল মূল ভূখন্ডের সাথে ছয় ভাগে বিভক্ত মহাসড়ক ও একটি রেলপথের দ্বারা বিমানবন্দরটি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভূমিকম্প ও টাইফুন প্রতিরোধ করার জন্য স্টিল ও কাচ দ্বারা এর টার্মিনাল ডিজাইন করা হয়েছে।

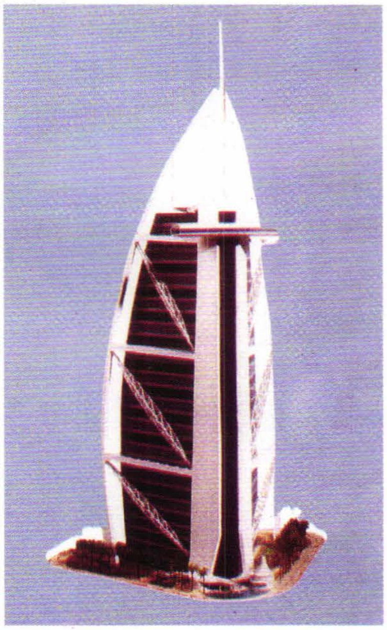

প্রাচ্যের প্রতিশ্রুতি

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী রাষ্ট্র মালয়েশিয়া গর্বের সাথে তাদের আধিপত্যের ঘোষণা দিয়েছে ৪৫১ মিটার (১৪৮০ ফুট) উঁচু 'পেট্রোনাস টাওয়ার' নির্মাণের মাধ্যমে। কম মূল্যের রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

অ্যারোডাইনামিক হোটেল

আরব শেখগণের রাজ্য দুবাই-এ তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ হোটেল ভবন। মূলত এটি একটি সমুদ্র তীরবর্তী রিসর্ট-এর কেন্দ্রীয় স্থাপনা, যাতে প্রমোদতরী, জল উদ্যান, ক্রীড়া উদ্যান ও কনফারেন্স সেন্টার সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ৩২১ মিটার (১০৫৩ ফুট) উঁচু হোটেলটিতে ৫৬টি তলা রয়েছে এবং সমুদ্র তলদেশের নীচে রয়েছে তিনটি বেসমেন্ট। অ্যারোডাইনামিক তথা বায়ুগতিবিদ্যা অনুসরণ করে জাহাজের পালের আকৃতিতে হোটেলটি নির্মিত হয়েছে এবং এটি স্থাপিত হয়েছে শহরের প্রকৃত ভূমির সাথে সড়ক সেতু দ্বারা সংযুক্ত হোটেলের নিজস্ব দ্বীপে।

দম দেয়া রেডিও

ব্রিটিশ উদ্ভাবক ট্রেভর বেইলিস ঘড়ির ন্যায় কলকব্জা বিশিষ্ট রেডিও আবিষ্কারের মাধ্যমে পুরাতন এক সমস্যার সহজ সমাধান দান করেছেন। এই রেডিওটি ব্যাটারী সংযোগ কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াই চলতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনো পৌঁছাইনি, সেসব জায়গায় যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এই রেডিও আদর্শ।

www.pathagar.org

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী এবং তাঁদের উদ্ভাবন সমূহ

১৯০০-১৯০৯

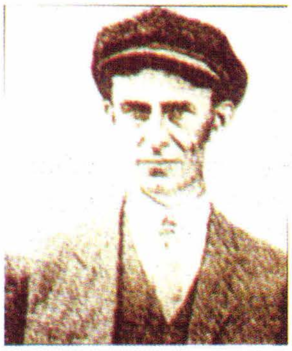

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ঃ দুই মার্কিন ভাই অরভিল এবং উইলবার রাইট ১৯০৩ সালে সর্বপ্রথম সফল বিমান আবিষ্কার করেন। তারা ছিলেন স্বশিক্ষিত বৈমানিক। বিমান চালনায় তারা ব্যবহার করেছিলেন হালকা ওজনের পেট্রোল ইঞ্জিন। তারা প্রায় ৮০০ মিটার (২৬২৫ ফুট) উচুঁতে উড্ডয়ন করেছিলেন।

জর্জ ইস্টম্যানঃ হালকা ওজনের রোল-ফিল্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ফটোগ্রাফির কাজটিকে নিমিষেই সহজ করে তোলেন বিজ্ঞানী ইস্টম্যান। তার আবিষ্কারটি 'ব্রাউনি ক্যামেরা' নামে পরিচিত।

গুগলিএলমো মার্কনিঃ ১৮৯৫ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনী উদ্ভাবন করেন বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর ৬ বছর পর আটলান্টিকের ওপর দিয়ে সর্বপ্রথম রেডিও সিগনাল পাঠাতে সক্ষম হন তিনি।

লিও ব্যাকল্যান্ডঃ ১৯০৯ সালে বেলজিয়ান রসায়নবিদ ব্যাকল্যান্ড প্রথম সিনথেটিক প্লাস্টিক উদ্ভাবন করেন। জগ ও রেডিও সেট থেকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'ব্যাকেলাইট' নামক এই প্লাস্টিক ব্যবহৃত হত।

লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ঃ প্রথম বাস্তব ফিল্ম প্রজেক্টের আবিষ্কার করেন লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯০৪ সালে তারা বাজারজাত করেন কালার ট্রান্সপারেন্সি উৎপাদনে সক্ষম কালার প্লেট।

১৯১০-১৯১৯

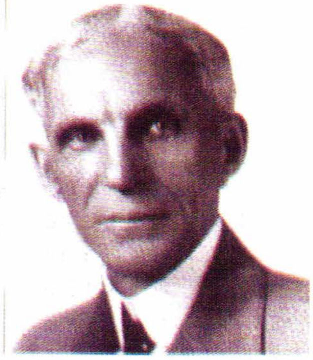

হেনরি ফোর্ডঃ মার্কিন গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'ফোর্ড' এর বাণিজ্য বাজার প্রশস্ত হয় বিজ্ঞানী হেনরি ফোর্ডের 'চলমান সংযোজন প্রক্রম' উদ্ভাবনের মাধ্যমে।

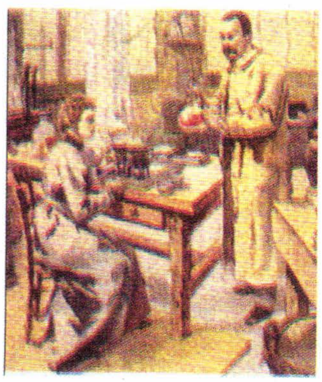

মেরি কুরীঃ পোলোনিয়াম ও রেডিয়ামের মত মৌল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরী অর্জন করেছেন তেজস্ক্রিয় ভিত্তিক গবেষণার পথিকৃতের খেতাব।

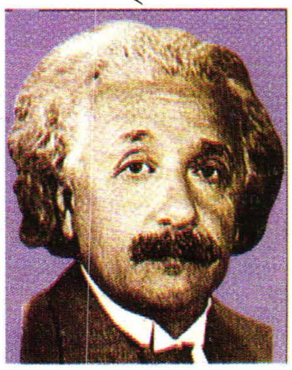

আলবার্ট আইনস্টাইনঃ ১৯১৬ সালে আপেক্ষিকতার সাধারণ ও বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে আইনস্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র সমূহের মধ্যে বিপ্লব সাধন করেন।

১৯২০-১৯২৯

হ্যারি ব্রেরলিঃ ক্রোমিয়াম ও টিনের মিশ্রণের মাধ্যমে বিজ্ঞানী ব্রেরলি তৈরি করেন একপ্রকার সংকর, যাতে মরিচা ধরে না। ফলশ্রুতিতে উদ্ভাবিত হয় স্টেইনলেস স্টিল।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিংঃ ১৯২৮ সালে প্রায় দুর্ঘটনা বশতঃ ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন পেনিসিলিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাহত সৈনিকদের ওপর জীবাণু নাশক তথা অ্যান্টিবায়োটিক-এর প্রয়োগ করা হয়।

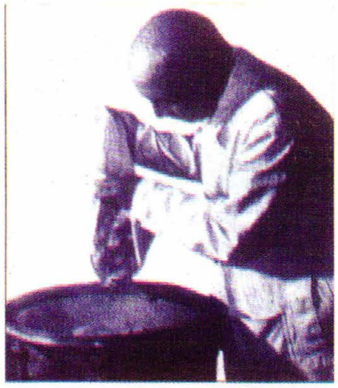

ক্ল্যারেন্স বার্ডসীঃ ১৯২৫ সালে বার্ডসীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে উদ্ভাবিত 'কুইক-ফ্রিজিং' বা দ্রুত-শীতলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য শিল্পে বিপ্লব ঘটান।

বালযার ভন প্লাটেন এবং কার্ল মুনটারসঃ ১৯২২ সালে ভন প্লাটেন এবং মুনটারস সুইডেনে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর উদ্ভাবন করেন। তারা এর নাম দেন 'D FRIDGE' এবং ইলেকট্রোলাক্স হিসেবে এটি বাজারজাত করেন।

রবার্ট গডার্ডঃ ১৯২৬ সালে গডার্ড প্রথম তরল জ্বালানী চারিত রকেট উৎক্ষেপণ করেন। যদিও প্রথম অবস্থায় এটি কেবল ৫৬ মিটার (১৮৪ ফুট) উচ্চতা অতিক্রম করেছিল, তথাপি পরবর্তী মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে।

www.pathagar.org

তথ্য কনিকা

১৯৩০-১৯৩৯

চেস্টার কার্লসনঃ ১৯৩৮ সালে মার্কিন আইনজীবী চেস্টার কার্লসন আবিষ্কার করেন ফটোকপি মেশিন। ১৯৬০ সালে অফিস কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে এইরুপ মেশিন প্রথম ব্যবহৃত হয়।

অটো হান এবং লিজ মেইটনারঃ পদার্থবিদ হান এবং মেইটনার তেজস্ক্রিয়তার ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে নিউক্লিয়ার ফিশান আবিস্কৃত হয়।

জন লজি বাইর্ডঃ টেলিভিশনের প্রথম প্রদর্শন করেন বাইর্ড, ১৯২৮ সালে। এর ৮ বছর পর তিনি আবিষ্কার করেন রঙিন সম্প্রচারক্ষম উচ্চ-রূপরেখা সম্বলিত টেলিভিশন।

পার্সি শঃ সড়ক প্রতিফলক 'ক্যাটস আইস' উদ্ভাবনের মাধ্যমে ১৯৩৪ সালে পার্সি শ' সড়ক নিরাপত্তার ভুবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। আজ অবধি এই আবিষ্কারের দ্বারা অগণিত প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

১৯৪০-১৯৪৯

উইলিয়াম শক্‌লিঃ ১৯৪৭ সালে শক্‌লি এবং তার সহযোগী বিজ্ঞানীদল ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন। এই ভাবে সম্প্রসারিত হয় মাইক্রোচিপস ও কম্প্যাক্ট ইলেকট্রনিক মেশিন উদ্ভাবনের পথ।

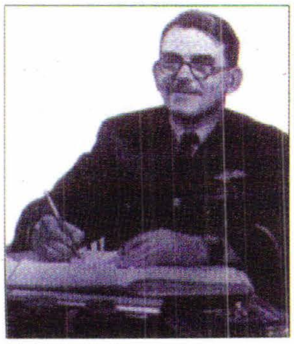

ফ্রাঙ্ক হুইটলঃ ১৯৩৭ সালে হুইটল আবিষ্কার করেন আদি প্রকৃতির একটি জেট ইঞ্জিন, যা ১৯৪১ সালে প্রথম এয়ার ক্র্যাফট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

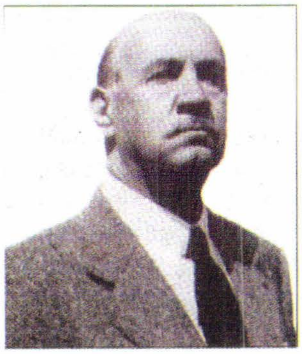

ইগর সিকরস্কিঃ প্রথম বাস্তব হেলিকপ্টারের উদ্ভাবন করেন সিকরস্কি। তিনি এই হেলিকপ্টারে উড্ডয়ন ক্ষমতার জন্য একটি মাত্র রোটর ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক যুগের অনেক হেলিকপ্টারেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

এনরিকো ফারমিঃ স্ব-নিয়ন্ত্রিত উচ্চ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নিউক্লিয়ার ফিশান বিষয়ে গবেষনা করার সময় ফারমি উদ্ভাবন করেন প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর তথা পারমাণবিক চুল্লী।

রোজালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিনঃ মার্কিন রসায়নবিদ ফ্রাঙ্কলিন ডি.এন.এ. (ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড)-এর ওপর এক্স-রে ইনভেস্টিগেশনের দ্বারা ১৯৫৩ সালে ডি.এন.এ.-র গঠন আবিষ্কার করেন।

১৯৫০-১৯৫৯

এডওয়ার্ড জোনাস সল্কঃ শিশুদের পোলিও রোগ নিরামক প্রথম ওরাল ভ্যাক্সিন বা মুখে খাওয়ার টীকা আবিষ্কার করেন মার্কিন চিকিৎসক সল্ক।

ফ্রান্সিস টি. বেকনঃ ১৯৩২-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বেকন তার সহযোগী বিজ্ঞানীদের একটি দল নিয়ে গবেষণা করেন এবং উদ্ভাবন করেন প্রথম হাইড্রোজেন-অক্সিজেন জ্বালানী কোষ।

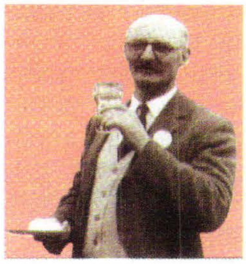

ক্রিস্টোফার ককেরেলঃ ১৯৫৫ সালে ককেরেল উদ্ভাবন করেন হোভারক্র্যাফট বা প্লবযান। এই আবিষ্কারের দ্বারা যুক্তরাজ্যের সরকার এতোটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, হোভারক্র্যাফটকে তারা উচ্চ গোপনীয় লিস্টের অন্তর্ভূক্ত করেন।

১৯৬০-১৯৬৯

রয় জাকুযিঃ ১৯৬৮ সালে জাকুযি আবিষ্কার করেন গোসলের উপযোগী জলঘূর্ণি বা (Whirlpool)।

জেন গুডঅলঃ বহু বছর ধরে নানা ধরনের গবেষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী গুডঅল শিম্পাঞ্জী ও মানুষের মধ্যকার অত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেন।

www.pathagar.org

থিওডোর মেইমেনঃ প্রথম কার্যকর লেজার রশ্মির উদ্ভাবক মেইমেন। বর্তমান বিশ্বের বার কোড রিডিং থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এখন লেজার রশ্মির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ডঃ দক্ষিণ আফ্রিকার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড সর্বপ্রথম একজন রোগীর ওপর হৃৎপিন্ড প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন।

১৯৭০-১৯৭৯

গডফ্রে হাউন্সফিল্ডঃ ১৯৭২ সালে হাউন্সফিল্ড উদ্ভাবন করেন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত টমোগ্রাফী স্ক্যানার বা উক SCANNER ডায়াগনস্টিক প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে এই যন্ত্রে অল্প ঘনত্বের এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

ক্লাইভ সিনক্লেয়ারঃ বিজ্ঞানী সিনক্লেয়ার প্রথম পকেট ক্যালকুলেটর সহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৯৭৫ সালে ৫ নামক বিশ্বের প্রথম বিদ্যুৎচালিত গাড়ি তারই উদ্ভাবন।

জেমস্ ই. লাভলকঃ গাইআ তত্ত্ব অনুযায়ী লাভলক দাবী করেন যে, পৃথিবী এবং এখানে বসবাসরত সকল প্রাণী একে অন্যের সাথে এমনভাবে জড়িত যেন এরা সবাই একসাথে একটি জীবিত অস্তিত্ব।

আবদুস সালামঃ ইলেকট্রোউইক শক্তির তত্ত্ব (Theory of the electroweak force) আবিষ্কারের জন্য আবদুস সালাম প্রথম পাকিস্তানী বিজ্ঞানী হিসাবে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

১৯৮০-১৯৮৯

জন ওয়ারনক এবং পল ব্রেইনার্ডঃ ওয়ারনক এবং ব্রেইনার্ড উদ্ভাবন করেন ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার সিস্টেম। এর মাধ্যমে বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদকগণ কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পান।

অ্যালেক জেফরিসঃ ব্যক্তি সনাক্তকরণের কাজে যে DNA ব্যবহার করা যায়, এই তথ্য উন্মোচন করেন জেফরিস। এই উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের জন্য অপরাধীকে সনাক্ত করা অনেক সহজতর

এরনো রুবিকঃ হাঙ্গেরীয় অধ্যাপক রুবিক ১৯৮০ সালে মস্তিস্ককে বিভ্রান্ত করে দেয়ার মত খেলা রুবিক ঘনক (Cube) আবিষ্কার করেন। খেলাটি প্রথম দর্শনে সহজ মনে হলেও সঠিক সন্নিবেশ দ্বারা এর সমাধান করা খুবই কঠিন।

রোল্যান্ড মরেনোঃ ১৯৮১ সালে মরেনো আবিষ্কার করেন নিজস্ব স্মৃতিক্ষমতা বিশিষ্ট এবং একটি কম্পিউটার চিপ সমন্বিত ক্রেডিট কার্ড।

জন সানফোর্ডঃ ১৯৮৭ সালে সানফোর্ড আবিষ্কার করেন বা জীন বন্দুক। জীন তত্ত্ববিশারদগণ কোষের কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন জেনেটিক বিষয়াদি সংযোজনের ক্ষেত্রে Gene Gun ব্যবহার করেন।

১৯৮০-১৯৮৯

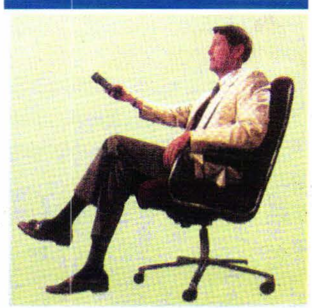

ডঃ রবার্ট উইলিয়ামসঃ নাসা-র হাবল স্পেস টেলিস্কোপে কর্মরত অবস্থায় স্পেস টেলিস্কোপে সায়েন্স ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ডঃ রবার্ট উইলিয়ামস কৃষ্ণগহ্বর তথা ব্ল্যাক হোল এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

ট্রেভর বিইলিসঃ নিজস্ব শক্তি উৎপাদনে সক্ষম ঘড়ির কলকব্জা বিশিষ্ট রেডিও উদ্ভাবন করেন বেইলিস। মূলত আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না, সেসব জায়গায় ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে এই রেডিওটি তৈরি করা হয়েছিল।

ডঃ অ্যালান রবার্টসঃ ১৯৯৪ সালে বায়ো-ম্যাটেরিয়ালস রিসার্চ ইউনিটের ডঃ রবার্টস এক শক্তিশালী সুপারগ্লু আবিষ্কার করেন। ভয়াবহ ক্ষতস্থানগুলোতে কোন প্রকার প্রদাহ ছাড়াই এই সুপারগ্লুর মাধ্যমে জোড়া লাগানো সম্ভব।

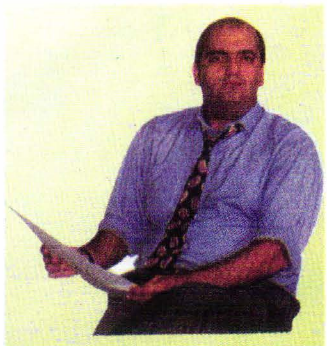

ড্যানিয়েল কোহেনঃ
বংশগতিবদ্যায় পারদর্শী অধ্যাপক কোহেন ১৯৯৩ সালে একটি গবেষক দলের নেতৃত্ব দান করেন, যারা ২৪টি মানব ক্রোমোসোম তথা জিনোমের প্রথম বাস্তব সম্মত ম্যাপ তৈরি করেন।

www.pathagar.org